বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

অক্টোবর, ১৯৯৯

বর্ণ সংযোজনা ঃ
শ্রী অমিতাভ ঘোষ
২০৬, পশ্চিম ঘোষপাড়া রোড
শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়

করতলযুগলেষু

সূচি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রিলজি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২.৯.১৮৯৪-১.৯.১৯৫০) 'পথের পাঁচালী' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ মহালয়া, সেপ্টেম্বর ১৯২৯, রঞ্জন প্রকাশনালয় থেকে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক প্রকাশিত), 'অপরাজিত' (প্রথম সংস্করণ দুই ভাগে প্রকাশিত, প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৩৮, দ্বিতীয় ভাগ ফাল্গুন ১৩৩৮, ১৯৩২ খ্রিঃ। প্রকাশক ও মুদ্রক সজনীকান্ত দাস, পরিবেশক প্রখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা মেসার্স পি. সি. সরকার। পরে দুখণ্ড প্রকাশিত হলে একত্রে বাঁধাই করে 'অপরাজিত' এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়)। পথের পাঁচালী নিয়মিত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে ২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। খেলাত ঘোষ এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে যান, 'বড়বাসা'য় থাকেন। কার্যব্যপদেশে ভাগলপুর জেলার জঙ্গলমহলে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজ ছিল জঙ্গলমহল লীজ দেওয়া। এ সময়েই 'পথের পাঁচালী' লেখা আরম্ভ করেন। প্রথমে সে কাহিনিতে দুর্গার চরিত্র ছিল না। ভাগলপুরে একদিন অপরাহ্নে একটি দেহাতী গ্রাম্য কিশোরী মেয়েকে দেখে দেখে তাঁর মনে আশ্চর্য মায়ার সঞ্চার হয়। মেয়েটির তেলহীন রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছিল। তাকে দেখেই তিনি দুর্গার চরিত্র কল্পনা করেন। তার ফলে তাঁকে পুনরায় নতুন করে পথের পাঁচালী লিখতে হয়। ভাগলপুরের 'বড়বাসা'তেই ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে পথের পাঁচালী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। সেখানেই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়। তখনি তা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়।

পরবর্তীকালে অপুর ছেলে 'কাজল'কে নিয়ে উপন্যাস লেখার বাসনাও তাঁর ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৩৫৭ সনে আশ্বিন সংখ্যা 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় 'কাজল কেন লিখব' শীর্ষক একটি রচনাও তিনি লিখেছিলেন। কথা ছিল ১৩৫৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'কথাসাহিত্যে' 'কাজল' লেখা শুরু করবেন। সে সুযোগ তিনি পান নি। [মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'বিভূতি-রচনাবলী'র ১ম ও ২য় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়]

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-র পর 'কাজল' উপন্যাস অনেক বছর পরে বিভূতিভূষণের একমাত্র সন্তান তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন (আষাঢ় ১৩৭৭)।

বিভূতিভূষণের স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাকনাম কল্যাণী) 'বিভূতিভূষণ ও কাজলের পশ্চাৎপট' নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লেখেন। সেটি তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কাজল' উপন্যাসের মুখপাতে মুদ্রিত হয়।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার করি—

"১৯৪০ সনের ৩রা ডিসেম্বর আমার বিয়ে হয়।... ঘাটশীলার যে ঘরে আমি শুতাম তার পায়ের দিকের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ভারি সুন্দর একটি শিশুর ছবি। অপূর্ব ছবিটি। খয়েরী রংয়ের সঙ্গে সাদা মেশানো বিলিতি ছবি। নিচে ইংরেজিতে ছবিটির নাম লেখা ছিল—'বাবল্‌স্'। ছেলেটির কোলের উপর একটি বাটিতে কিছু সাবানগোলা ছিল। একটি কাঠিতে ফুঁ দিয়ে ছেলেটি বুদ্‌বুদ্ তৈরি করছে।

তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, কোনও বিলাতী কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ক্যালেন্ডার ওটা। উনি ছবিটি আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন ঐ ছবি দেখেই নাকি উনি কাজলের চরিত্র কল্পনা করেছিলেন। অমনি নিষ্পাপ, দেবদুর্লভ রূপবান, কোমল, সুন্দর ছেলেটি—কাজল নাকি ওঁর কল্পনায় ঐ রূপেই ছিল।

উনি নিজে আমাকে বহুদিন বলেছেন, এক সময়ে নাকি উনি সন্তান সন্তান করে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বহু লোকের কাছে শুনেছি, অনেককে উনি নাকি বলতেন—আমাকে 'বাবা' ডাকবি? ডাক না।

আরও শুনেছি, এই পিতৃ-সম্বোধন শুনবার জন্য নানাপ্রকার ঘুষও দিতেন কাউকে কাউকে।...

কাজল সম্বন্ধে উনি কী লিখবেন, তার কিছু কিছু আভাস অপরাজিত বইতে পাওয়া যায়। ওতেই বীজাকারে কাজল সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় বলা আছে। তারপর যে তাঁর কল্পনার কাজলকে বাস্তবে রূপ দেবে, প্রতিমার কাঠামোর ওপর খড়-বিচালি বেঁধে মাটি ধরিয়ে রং-তুলির স্পর্শে সেই প্রতিমাকে সঞ্জীবিত করবে, সে দায়িত্ব তার।...

কাজল উপন্যাস সম্পর্কে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে আকাশের নব নব ছায়ারূপ দেখতে দেখতে, সন্ধ্যাবেলায় বিলবিলের ধারে ঠেসদেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে করতে আলোচনা করেছেন।......ওঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য এবং এই উনিশ-কুড়ি বছরের ব্যবধানে বিশেষ কিছু (কাগজপত্র) রক্ষা করতে পারি নি।...

দীর্ঘদিন বাবলুর (বিভূতিভূষণের পুত্র) সঙ্গে ওঁর স্মৃতি তর্পণ করতে করতে 'কাজল' উপন্যাস সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছি।...

বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট অসমাপ্ত 'কাদম্বরী' শেষ করেছিলেন। বাবলুর হাতে বিভূতিভূষণ পরিকল্পিত 'কাজল' প্রাণময় হয়ে উঠুক, এই আমার মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা।"

'বেঙ্গল পাবলিশার্স' পার্টিশনের পর মনোজ বসু ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুটি দুটি চারটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মনোজ বসু 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' 'গ্রন্থপ্রকাশ' নামে দুটি প্রকাশন শুরু করেন, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রকাশভবন' ও 'বাকসাহিত্য' প্রকাশন শুরু করেন। 'গ্রন্থপ্রকাশ' থেকে মনোজ বসুর পুত্র ময়ূখ বসু 'অপু' নামে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'কাজল'—তিনটি উপন্যাস একত্রে প্রকাশ করেন। এটির প্রকাশ-তারিখ দেওয়া আছে—নতুন মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। অপরদিকে বিভূতিভূষণ রচনাবলীর প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্থা প্রকাশ করেন—'কাজল', আষাঢ় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে। এখন তার তৃতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

এই নিবন্ধে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত বিভূতিভূষণ রচনাবলী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এবং 'কাজল' (মিত্র-ঘোষ সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯) থেকে যাবতীয় উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

দুই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) যখন বাংলা উপন্যাসের আসরে দেখা দিলেন (পথের পাঁচালী, ১৯২৯), তখন দেশ কাল সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। তিরিশের যুগ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সমাজ, দুয়ের পক্ষেই সংকটকাল। প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষে চাকুরি-নির্ভর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সত্যযুগের অবসান ঘটেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘন ঘন আন্দোলন, তার উত্তাল তরঙ্গ ও নিষ্ফল আলোড়ন সামাজিক ও আর্থিক শক্তিকে বিঘ্নিত করেছে। সোভিয়েত বিপ্লব-উত্তর পাশ্চাত্ত্য জগতে বিপ্লবের সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার অর্গলমুক্ত হয়েছে। একদিকে এঙ্গেলস্-মার্ক্‌স-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ সাফল্য। অপরদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন-লোকের নবতন আবিষ্কার মানুষের বহির্লোক ও অন্তর্লোকের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। সবুজপত্র-কল্লোল-কালিকলম-পরিচয়-ভারতী-প্রবাসী-বিচিত্রা মারফত তার বার্তা আমাদের মনোভূমির তটদেশে উপনীত হয়েছে। জীবনের জটিল দুশ্ছেদ্যগ্রন্থি মোচনের ও দ্বন্দ্বমথিত বাস্তবকে ব্যাখ্যার দায়িত্ব ঔপন্যাসিকে বর্তে ছিল। কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাকারবৃন্দ এই সাহিত্য-দায় ও দায়িত্ব-পালনে যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তদনুযায়ী সাফল্য অর্জন করেননি। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই সত্যের ইঙ্গিতবহ। কল্লোল-গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতার ফলেই স্মর্তব্য শরৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধতা। 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে শরৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধতার উল্লেখ পাই। তিরিশের যুগে বাংলা উপন্যাসে সেই দায়িত্ব নিতে এসেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ।

এই সংকটলগ্নে এসেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাতে অস্ত্র কী ছিল? সরলতা আর বিশ্ববোধ, প্রকৃতিপ্রেম আর ঈশ্বরবিশ্বাস, দরিদ্র জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর মমতা সম্বল করেই তিনি এসেছিলেন। আধুনিক মানুষের জীবনের মতোই সাহিত্য হবে জটিল, দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিজালে আবদ্ধ, বুদ্ধি আর যুক্তির অসংখ্য পাকের আবর্তে দিশেহারা—এই ধারণার প্রবল বলিষ্ঠ প্রতিবাদ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রমাণ করে দিলেন, সাহিত্যে বিষয়ের কোনো সীমা নেই, বাধা নেই, সমস্ত জানা জিনিসই চিরকালের অজানা।

রবীন্দ্র-শরৎ-শাসিত বাংলা কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে নিজেকে প্রথম আবির্ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পথের পাঁচালী (১৯২৯) ও অপরাজিত (১৯৩২) রচনা ও প্রকাশকালে বিভূতিভূষণের যে-সব সমসাময়িক উপন্যাসলেখক ছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মণীন্দ্রলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁরা কেউ-ই বিভূতিভূষণের সহমর্মী ছিলেন না। পথের পাঁচালী যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯২৮-২৯) তখনি ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (১৯২৭-২৮)। কিছু আগে-পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্করের 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৯২৮) ও 'রাইকমল' (১৯৩৫), মানিকের 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'জীবনের জটিলতা' (১৯৩৬)। পথের পাঁচালী-অপরাজিত উপন্যাসের সঙ্গে তাদের কোনো আত্মীয়-সম্পর্ক ছিল না।

একথা স্বীকার্য, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বক্তব্যে বিভূতিভূষণের কোনো আগ্রহ ছিল না। আসলে তাঁর বিচরণক্ষেত্রটাই ছিল ভিন্নতর। ঈশ্বরসন্ধান ও প্রকৃতিসম্ভোগ তাঁর স্বদেশভূমি, অন্য সব কিছু তাঁর কাছে বিদেশ। তাঁর সরল সততা ও গভীর প্রকৃতিপ্রেমের অন্তরালে ছিল গরিব ও নিম্নবিত্তদের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু তা কখনো শোষণের বিরুদ্ধে গরিবকে লড়াই দিতে প্ররোচিত করেনি। তাঁর উপন্যাসে যে জীবনপ্রেম তার মূলে আছে ঈশ্বরবিশ্বাস, প্রকৃতিপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা। প্রবল গভীর জ্বলন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস বিভূতিভূষণকে ফিরিয়েছে দরিদ্রের সংসারের প্রতি, দুঃখলাঞ্ছিত জীবনের প্রতি।

দিনলিপিতে রয়েছে তার স্বাক্ষর : 'তাই এইমাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলাম, ভগবান আমি তোমার অন্য স্বর্গ চাই না—তোমার দেবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্রজগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের জন্য রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস। এই ফুল-ফল, এই সুখ-দুঃখের স্মৃতি। এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বারবার যেন আসাযাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়।' (স্মৃতির রেখা)

এই দিনলিপি ভাগলপুরে বাসকালে লেখা। তখনি বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী লিখছিলেন। ভাগলপুরের 'বড়বাসা'য় এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির সূচনা—১৯২৫ এপ্রিল-এ, সমাপ্তি—২৬ এপ্রিল ১৯২৮-এ। 'স্মৃতির রেখা'য় বিভূতিভূষণ স্মৃতির সরণি বেয়ে বারবার চলে গিয়েছেন শৈশবের স্বর্গলোকে, প্রকৃতির আনন্দলোকে। শৈশব আর প্রকৃতি দুয়ে মিলেই পথের পাঁচালী।

বিভূতিভূষণ আর অপু, দুই নয়, এক। তাই 'স্মৃতির রেখা' আর 'পথের পাঁচালী' একই মনের দুই প্রকাশ।

অপুরা নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশী চলে যাবে। গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়িতে অপুর মা সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। যাবার আগে মানত শোধ দেওয়া প্রয়োজন। কে যায়? অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাকেই পাঠাতে হল। জীবনে এই প্রথম অপু একা পথে বেরিয়েছে—পথ তিন-চার ক্রোশ। সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরে পথ—নতিডাঙ্গার বাওড়, হরিশপুর গ্রাম পেরিয়ে গঙ্গানন্দপুর (পরিচ্ছেদ ২৭, পথের পাঁচালী)। এই যাত্রাপথের বর্ণনায় পথের পাঁচালীর মর্মসত্য ব্যক্ত। আসল উপন্যাসটাই তো মুগ্ধ মনের যাত্রাপথের কাহিনি। 'স্মৃতির রেখা'-র উপরিধৃত অংশের সঙ্গে পথের পাঁচালীর নিম্নধৃত অংশের সাদৃশ্য অনায়াসলক্ষ।

"যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদেপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখি, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফল ফুলের থোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারী মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে—খোকা তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এইরকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে। মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনে কঞ্চির ডালে ডালে শর্ শর্ শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রং-বেরঙের পাখির গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে—গাছপালায়, আকাশে, বাতাসে, পাখির কাকলিতে তাহার বার্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায় তাহা সে ভালো করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালোবাসে। ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপর রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমটের অবসানে, সারা দিকচক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গভীর সুন্দর রূপ, অস্ত-বেলায় সোনাডাঙার মাঠের উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ ফুলে ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদিনীরাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপ্‌রিকাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপিচুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়া ছিল।—অপু কখনো এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।" (পথের পাঁচালী, পরিচ্ছেদ ২৭)

পথের পাঁচালীর ও অপুর মর্মসত্য এখানে নিঃশেষে ব্যক্ত হয়েছে। বলা যেতে পারে, অপুর স্রষ্টা বিভূতিভূষণের জীবনসত্যও এখানে ব্যক্ত।

পথের পাঁচালী আপাতদৃষ্টিতে কলাগুণবর্জিত। তিন খণ্ডে বিভক্ত—বল্লালী-বালাই (পরিচ্ছেদ ১-৬), আম আঁটির ভেঁপু (৭-২৮), অক্রুর সংবাদ (২৯-৩৪)। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি সেকালের প্রতিনিধি ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুতে। দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে অপুদের কাশী যাত্রায়। তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তি কাশীর লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার অবসান-সূচনায়। কেউ প্রথম খণ্ডকে, কেউ তৃতীয় খণ্ডকে অনাবশ্যক বাহুল্য মনে করেছেন। আমার তা মনে হয় না।

পুরো উপন্যাসটাই জীবন-মৃত্যুর ফ্রেমে বাঁধা। অপুর পিতা হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষ বীরু রায়ের ব্যবসা ছিল ডাকাতি, তার অধীনে ছিল ঠ্যাঙাড়ের দল। নিরীহ পথিকের প্রাণনাশ ও সর্বস্ব লুণ্ঠনই তার ব্যবসা। দরিদ্র কপর্দকহীন ব্রাহ্মণ ও তার একমাত্র পুত্রকে

হত্যা করে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি-পুকুরে পুঁতে দেবার ঠিক এক বছরের মাথায় ইছামতীর নির্জন চরে সন্ধ্যারাতে কুমীরে বীরু রায়ের একমাত্র শিশু-পুত্রকে জলে টেনে নিয়ে গেল।

"গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি-পুকুরের মাঠে প্রায় সেই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২)

তারপর বীরু রায় আর বেশিদিন বাঁচেন নি। সেদিন থেকে তাদের বংশে জ্যেষ্ঠ সন্তান বাঁচত না। হরিহরই প্রথম অধস্তন পুরুষ যে ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। হরিহর স্বপ্নবিলাসী, বাস্তববিমুখ, সংসার-উদাসীন, ভ্রাম্যমাণ কথক। বাস্তবকে সে কখনই মেনে নিতে চায়নি, ফলে দারিদ্র তার নিত্যসঙ্গী। অপু তারই পুত্র। দুর্গা আর অপু, দুই চাঁদের কণা দেখে সর্বজয়ার আনন্দের শেষ নেই; ইন্দির ঠাকরুনও দুর্গাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছেন। সহায়-সম্বলহীনা ইন্দির ঠাকরুনকে সর্বজয়া বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। পথের ধারে বুড়ি মারা যায়। (তদেব পরিচ্ছেদ ৬)। সর্বজয়া-চরিত্রের এই নির্মমতা লেখক কেন দেখালেন? ওই একই সূত্র : অদৃশ্য বিচারকের হাতে মানুষের বিচার কখনো ফাঁক যায় না। হরিহরের মৃত্যুর পর সর্বজয়া কাশী ছেড়ে গিয়ে যে বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করত, সে বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে এক বৃদ্ধা রানীমাকে দেখে সর্বজয়ার অনেক বছর বাদে মনে পড়ে গেল আর এক বৃদ্ধাকে।

"এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এই রকম চেহারার ও এই রকম বয়সের—সেই তাদের বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরুন, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়ে পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায় সেই বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দিন মৃত্যু......

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বারবার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ৩২)

নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশী চলে যাবার মুহূর্তে 'পথের পাঁচালী' শেষ হতে পারে না। 'আম আঁটির ভেঁপু'-র 'অক্রূর সংবাদ'-এর শিল্প প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য। অপুরা যখন কাশী যাত্রা করে তখন অপু ছেড়ে যাচ্ছে দুর্গাকে, নিসর্গকে, তার শৈশবকে, নিশ্চিন্দিপুরকে। ঋতু-পর্যায় ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ভাণ্ডার—"ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৭)। কাশীতে ও পরবর্তী পরাশ্রিত জীবনে না পৌঁছলে অপুর উপলব্ধি হতো না প্রকৃতি-বিযুক্ত জীবন কতো ভয়ঙ্কর, কতো দীন, কতো কষ্টকর।

পথের পাঁচালী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে অপু কেবল তার দিদি দুর্গাকে ছেড়ে যায়নি, সেই সঙ্গে তার শৈশবের স্বপ্নলোককেও ছেড়ে এসেছে।

"ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ

দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।...

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়। তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে....আতুরী ডাইনি... নদীর ঘাট... তাহাদের কোঠাবাড়িটা... চাল্‌তে-তলার পথ.... রাণুদি... কত বৈকাল, কত দুপুর... কতদিনের কত হাসিখেলা... পটু... দিদির মুখ... দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যে অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বারবার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে—" (তদেব্, পরিচ্ছেদ ২৮)

চোখের জলে অপুর জীবনে দীক্ষা হল।

দিদি দুর্গা অপুর ফেলে যাওয়া শৈশব-সারল্য আর প্রকৃতি-মুগ্ধতার প্রতিনিধি। রায়চৌধুরি বাড়িতে পরাশ্রিত লাঞ্ছিত জীবনে অপুর (ও সর্বজয়ার) মনে পড়ে নিশ্চিন্দিপুরের জীবন :

"আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই—তি-ন বৎসর। কতোকাল! সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারী পুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়া ভিটার মিষ্টি লেবুফুলের গন্ধে সজনেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ির ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখির ডাক? (তদেব, পরিচ্ছেদ ৩৪)

নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি অপুকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে। এই intense passion, intense desire-এ উপন্যাসের সমাপ্তি। অপুর পথচলা শেষ হয়নি, তার জীবনদেবতা তাকে পথে ছেড়ে দিয়েছেন—সে পথের বিচিত্র আনন্দযাত্রার অদৃশ্য তিলক অপুর ললাটে এঁকে দিয়েছে—পথের আহ্বানে অপু এগিয়ে চলবে—এই আশ্বাসে পথের পাঁচালীর সমাপ্তি।

শৈশব, স্মৃতি ও অলৌকিক আনন্দ-অনুভূতির উপাদানে নির্মিত হয়েছে পথের পাঁচালী উপন্যাস।

বিভূতিভূষণ কতো নিপুণ নির্মম শিল্পী তার প্রমাণ জীবন-মৃত্যুর ফ্রেমে বাঁধা এই উপন্যাস। ইন্দির ঠাকরুন, দুর্গা ও হরিহরের মৃত্যু। পরপর এই তিনটি মৃত্যু এ উপন্যাসে সমৃদ্ধ করেছে জীবনকে।

দুর্গাকে লেখক প্রকৃতির সারল্য, মুক্তি ও আনন্দের প্রতিমারূপে উপস্থিত করেছেন।

এই প্রতিমা বাস্তব সংসারে মানায় না। তাই অল্প বয়সেই দুর্গাকে চলে যেতে হয়। এই চরিত্র নির্মাণে ও তার বিসর্জনে লেখকের সংযম বিশেষ লক্ষণীয়। মৃত্যুর জন্য লেখক দুর্গাকে ও সেইসঙ্গে পাঠককে ধীরে ধীরে তৈরি করে নিয়েছেন।

দশ-এগারো বছরের মেয়ে। পাতলা গড়ন, চাপা রং। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়ছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, চোখ দুটি ডাগর। (তদেব, পরিচ্ছেদ ৮)। কিশোরী দুর্গার এই ছবিটি অবিস্মরণীয়। সে একা একাই চৈত্র-দুপুরে ঘুরে বেড়ায়, পথে ঘাটে জঙ্গলে কুড়িয়ে বেড়ায় আম, ওড়কলমী ফুল, মাকাল ফল, বেনেবৌ, খাপ্‌রা, কামরাঙা, রড়াফুলের বীচি। আপন মনেই সে খেলা করে। "পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলিগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ৮)

দুর্গাকে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য লেখক আমাদের প্রস্তুত করে তুলেছেন।

"দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতিপরিচিত গ্রামের অন্ধি-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন বিষাদে এই কতো প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনা খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!....

কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে নাই। দিনরাতে, খেলা-ধুলার, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহার প্রায়ই মনে হয়—ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয় তাহা আসিতেছে... আসিতেছে... শীঘ্রই আসিতেছে...।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২০)

কিছুদিন পরে দুর্যোগের শেষে এক প্রসন্ন শারদ প্রভাতে যখন সমস্ত পৃথিবী সূর্যালোকে উজ্জ্বল, তখন ম্যালেরিয়া জ্বরের শেষ পর্যায়ে খুব জ্বরের বিরামে দুর্গার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছে—'ও দুগ্‌গা চা দিকি—ও দুগ্‌গা'—দুর্গা আর চাহিল না।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৫)

দুর্গার মৃত্যুবর্ণনার যে কঠিন সংযম তা আমাদের বিস্মিত করে। এখানেই প্রমাণ হয়, বিভূতিভূষণ কতো বড়ো শিল্পী। মৃত্যুর দুদিন পূর্বে অপুর কাছে দুর্গার শেষ অনুরোধ—'আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?' (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৫)

নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার সময় ট্রেনে উঠে অপুর মনে পড়েছে দুর্গার শেষ অনুরোধ। উত্তরজীবনে অপু যখন ভ্রাম্যমাণ, তখন বারবার তার মনে পড়ত।

"এক ঘনবর্ষার রাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগেঁয়ে গরীব ঘরের মেয়ের কথা—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৮)

সেই সংযম প্রকাশিত হয়েছে যখন প্রবাসী হরিহর পুজোর সময় বাড়ি ফিরে প্রত্যাশাব্যাকুল কণ্ঠে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছে—'কৈ, অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—'

"সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—'ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে গো—এতদিন কোথায় ছিলে?'" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৬)

এখানেই বিভূতিভূষণ দাঁড়ি টেনে দিয়েছেন। আর কোনো উচ্ছ্বাস নেই, ক্রন্দনের বর্ণনা নেই। একেবারে দুর্গা পূজার বর্ণনা। পরের অনুচ্ছেদেই গাঙ্গুলি বাড়ির পূজার বর্ণনা। দুর্গা নেই, তাই বলে শারদ-প্রকৃতির অম্লান সৌন্দর্য মলিন হয়ে যায়নি, দীনু শানাইদারের রসুনচৌকী বন্ধ হয়নি। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দসুর বেজে ওঠে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেখি হরিহর ছেলেকে নিয়ে গাঙ্গুলিবাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে চলেছে। স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কেবল পরোক্ষ ইঙ্গিত—"একখানি অগোছালো চুলে ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা—"। আর অপু? গাঙ্গুলি বাড়ির প্রাঙ্গণে সমবেত পরিচিত-অপরিচিত ছেলেমেয়েদের সাজগোজ দেখে অবাক হতে থাকে। দুর্গার উল্লেখ আর নেই। অনুল্লেখের দ্বারাই দুর্গার উপস্থিতিকে বিভূতিভূষণ মেনেছেন। বড়ো শিল্পীর সংযম ও নির্মম নৈপুণ্য তাঁর ছিল।

বিভূতিভূষণ কতো বড়ো আর্টিস্ট তার পরিচয় পাই নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে অপু কর্তৃক তার দিদি দুর্গা-অপহৃত সোনার কৌটা আবিষ্কার। ঘরের উঁচু তাকের মাটির কলসি থেকে বেরুল সোনার কৌটা। এটির জন্যে মুখুয্যে বাড়ির সেজঠাকরুন দুর্গাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়, তবু দুর্গা চুরি স্বীকার করেনি। (তদেব, পরিচ্ছেদ ২১)

"সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা সেজঠাকরুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল। দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্‌শন্‌ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসিটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল।

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়কি দোরের কাছে দাঁড়াইল....একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।... মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই। এমনকি মাকেও না।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৮)

এই পরিচ্ছেদেরই শেষে দেখি ধাবমান ট্রেনের জানলায় চোখের জলে-ভাসা অপুকে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দুর্গার কাতর অনুনয়—অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

জীবনকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকার করেই বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালীর বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে স্থাপিত করেছেন অপুকে।

"এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৮)

পথের পাঁচালীর দ্বিতীয় খণ্ডে রাণুদিকে, তৃতীয় খণ্ডে লীলাকে পেয়েছে অপু। তার উত্তরজীবনে এই দুই নারীর ভূমিকা কম নয়। একজনের স্নেহ, অন্যজনের ভালোবাসা অপুকে গড়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বজয়ার মাতৃস্নেহ। আসলে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামপ্রকৃতির প্রতিনিধিরূপেই অপুর জীবনে সর্বজয়ার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছে। একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে জীবনের অঙ্গীকার, দুয়ে মিলে পথের পাঁচালী।

অপুর গড়ে ওঠার যে অন্তরগত ইতিহাস বিভূতিভূষণ ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, পথের পাঁচালী থেকে তার সামান্য পরিচয় আমরা নিতে পারি।

দুপুরবেলা ছোট্ট অপু হাতের লেখা ক-খ লিখতে লিখতে একমনে মায়ের মুখে মহাভারত পড়া শুনত। অপুর মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন।

"জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া-ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভালো লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—এক হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র অসহায় বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। মায়ের মুখে এটির অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাঁধ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার (কাশীদাসী মহাভারতের) ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ৯)

পলে পলে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি অপুর মনটাকে গড়ে তুলছিল। লেখক পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। একটার পর একটা উদাহরণ তুলে এনে তিনি দেখিয়েছেন অপু ও দুর্গার মন কীভাবে গড়ে উঠছে।

"এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল! জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত। প্রতি পলের প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে

তাহাদের পিপাসু হৃদয় কতো বিচিত্র, কতো অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষা সতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ, ফুলের হলুদ রং-এর শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়লা কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালির লঘুগতি আসা-যাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখি বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখি গান গায়, ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।" (তদেব, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

অপুর উপর আর-একটি প্রভাব—বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজি।

"অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা। নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় তার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতোই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন, ওই রকম ভাবমাখানো চোখ ছিল তাঁরও।... সহজ সামান্য অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে! তাহার কাছে তাজা মাটি, পাখি, গাছপালার সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল! ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। সেগুলি সে বিছানায় রাখিয়া দেয়।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১৯)

অপুর উপরে আর একটু প্রভাব পুস্তকের, সেই সঙ্গে রাণুদির প্রভাব।—ভুবন মুখুয্যের বাড়ির আলমারিতে একগাদা পুরোনো বই আছে। রাণুদি আর সতুকে বলে' দুপুরে তাদের মাঠের পুকুরে মাছ-চুরি ঠেকাবার জন্য পাহারা দেবার অঙ্গীকারে বই নিয়ে এসে পড়ে।—

"অপু জানে, এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রাণুদির মতো কোন মেয়ে নয়। দিদির পরেই যদি সে কাহাকেও ভালোবাসে সে রাণুদি।... প্রতিদিন দুপুরবেলা [রাণু-সতুদের বাড়ির] আলমারি হইতে বাছিয়া একখানি করিয়া বই সতুর নিকট চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো সেওড়া গাছের কাঁচা ডাল পাড়িয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া একমনে

পড়ে। বই অনেক আছে।....এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ্ টিপ্ করে, পুকুরধারে নির্জনে বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন্‌দিক দিয়া বেলা গেল।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৬)

সর্বোপরি প্রকৃতির সাহচর্য অপুকে গড়ে তুলেছিল, তা পূর্বেই লিখেছি। "অপুর শৈশব কাটিতেছিল্ এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে—গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখির কাকলিতে তাহার বার্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে-ফুলে-ফলে কি পরিবর্তন ঘটায়, তাহা সে ভালো করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালোবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমটের অবসানে সারা দিকচক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল-মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলার সোনাডাঙার মাঠের উপরকার আকাশে কতো বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশফুলে ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদনি রাতে জ্যোৎস্না-জালের খুপ্‌রিকাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল। অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরদিন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার যে ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।" (তদেব, অনুচ্ছেদ ২৭)

এটাই বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর মূলকথা।

তিন

'অপরাজিত' উপন্যাসের সূচনায় এই একই বক্তব্য ফিরে এসেছে। অপু তার মাকে ছেড়ে বড়ো ইস্কুলে পড়তে যাবে। অপু পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে—হেডমাস্টার ফণীবাবুর কাছে শুনেছে এই সংবাদ—এবার সেই দূরবর্তী দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলে পড়তে যাবে। সেদিন অপু না খেয়ে ইস্কুলে গিয়েছিল—কুলুইচণ্ডীর ফলার খেয়েছিল বাড়ি ফিরে এসে। সেইদিনটি অপুর জীবনে চিরস্মরণীয় হয়েছিল—মাকে ছেড়ে দূরবর্তী হাইস্কুলে পড়তে যাওয়া—এর তীব্র আকর্ষণে অপু মায়ের স্নেহবন্ধন ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল।

পথের পাঁচালীর বিস্তার 'অপরাজিত' (দুই খণ্ড)। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আসার পরে পথের পাঁচালীর তৃতীয় খণ্ডে (অক্রূর-সংবাদ) অপু উপলব্ধি করেছে প্রকৃতি-বিযুক্ত জীবন কতো ভয়ংকর, নির্মম ও শ্রীহীন। আসলে কাশীতে ও রায়চৌধুরী-বাড়িতে অপুর যে কষ্ট তা মানসিক। দারিদ্র আছে, তা নিশ্চিন্দিপুরেও ছিল, পরেও আছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাকে কখনো প্রাধান্য দেননি। মানসিক দারিদ্রের পীড়নে যে কষ্ট তাই অপুকে জর্জরিত

করেছে। তার মনের কোণে একথা সবসময় জেগে থাকত, এসবের শেষে যেন তাদের গ্রাম অপেক্ষা করে আছে। নিশ্চিন্দিপুর তার পথের শেষ, তার প্রাণের আরাম, তার স্বপ্নের স্বর্গ।

'অপরাজিত' উপন্যাসের সূচনায় অপুর মনকে প্রভাবিত করেছে দুই ধরনের স্বপ্ন: মনসাপোতা-যাত্রা আর মাইনর স্কুল ছেড়ে বড় স্কুলে পড়ার জন্য দেওয়ানগঞ্জ-যাত্রা।

'অপরাজিত'-য় রায়চৌধুরি-বাড়ির লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বজয়া আর অপু চলেছে সর্বজয়ার দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তীর বাড়িতে—মনসাপোতায়। উলা গ্রাম হয়ে মনসাপোতায় আসার পথে অপু ফিরে পেয়েছে তার হারানো সম্পদ—

"অনেক দিন পরে এইসব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র ; মিন্‌মিনে ধরনের নয়, পান্‌সে পান্‌সে জোলো ধরনের নয়।" ('অপরাজিত', পরিচ্ছেদ ১)

আড়বোয়াল মাইনর স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেয়েছে—ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফণীবাবুর কাছে অপু প্রথম একথা শোনে এবং প্রধান শিক্ষক তাকে বলেন, এবার তোমাকে দেওয়ানগঞ্জের হাইস্কুলে পড়তে হবে। তারপর অপুর মনোভাব—

"সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার মনে পড়িতে লাগিল। পথের ধারে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া, ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার। কতো—কতোদিন পরে আবার এই শ্যামচ্ছায়াভরা বীথি, বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ ঘুঘুর ডাক, মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া পড়া, বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়াছিল।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১)

'পথের পাঁচালী'র জীবন ছিল সরল একমুখী। 'অপরাজিত'র জীবন জটিল বহুমুখী। গ্রাম্য কিশোর অপু আর কৈশোরোত্তীর্ণ অপু এক নয়। আড়বোয়াল মাইনর স্কুল, দেওয়ানপুর মডেল ইনস্টিটিউশন অপুর চোখের সামনে এক নতুন জগতের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে। সর্বজয়া চাইলেও অপুকে ফেরাতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। মনসাপোতার মতো ছোট্ট চাষাগাঁয়ে চিরকালই কি ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করে অপু দিন কাটাবে? না, এই সংকীর্ণ গণ্ডিতে সে বাঁধা থাকবে না। তাই মায়ের চোখের জলের নিষেধ না মেনে অপু চলেছে বৃহত্তর অভিজ্ঞতার জগতে, সেখানে সর্বজয়ার কোনো ভূমিকা নেই। অপুর বন্ধন মোচনের পালা শুরু হয়েছে তার হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ায়। পালা মধ্যবিন্দুতে পৌঁছেছে সর্বজয়ার মৃত্যুতে। আশ্চর্য বিভূতিভূষণের শিল্পকৌশল। আশ্চর্যতর, তাঁর নির্মম নৈপুণ্য। সর্বজয়ার মৃত্যুর সময় অপু—তার প্রাণকাড়া-ধন—কাছে নেই। সে তখন কলকাতায় কলেজে পড়ে। মনসাপোতা গ্রামের অন্ধকার রাতে অপুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে সর্বজয়ার মৃত্যু হয়েছে। সারাজীবন শুধু দুঃখ আর অপমান—কতো চুরি, কতো পাপ, কতো

মিথ্যাচারণ—আজ এই রাতে এত ভয় কেন—তবে কি মৃত্যু আসছে—ভয় দূর হয়ে আনন্দ এলো—দূরে কে দাঁড়িয়ে—যুবক অপু নয়—ছোট্ট অপু—এতটুকু অপু নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে চৈত্র-জ্যোৎস্নারাতে আলোকিত অপু—বুঝি মৃত্যু এসেছে—কিন্তু সে ভয়ংকর, সে সুন্দর—তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করে আগ বাড়িয়ে নিতে এসেছে—এতই সুন্দর—কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!

পরদিন সকালে তেলিবাড়ির বড় বউ এলো। সর্বজয়ার সাড়া নেই, যেন ঘুমোচ্ছে। সাড়া দেয় না, নড়ে না। "বড়-বৌ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভালো করিয়া দেখিল। পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১)

মায়ের মৃত্যুসংবাদে অপুর মনোভাব মিশ্রিত—প্রথমে মুক্তির আনন্দ, পরমুহূর্তে নিজের মনোভাবে আতঙ্ক।

"সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দমিশ্রিত—এমন-কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস...একটা বাঁধন-ছেড়ার উল্লাস... অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি? সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—। তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালোবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই?.... আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে! বাড়ি পৌঁছিল বিকালে।... ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা।... পোড়া খড়গুলাতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা... মা নাই! মা নাই!" (তদেব, পরিচ্ছেদ ৯)

শ্রাদ্ধান্তে কলকাতায় ফিরে আসে অপু—এ জগতে সে একাকী—সত্যসত্যই—একাকী—"এই ভয়ানক নির্জনতার ভার এক এক সময়ে অপুর বুকে পাথরের মতো চাপিয়া বসে।" এই অবস্থায় পথে লীলার সঙ্গে দেখা। কিন্তু লীলার ভালোবাসার আমন্ত্রণে অপু ধরা দিল না।

অপু রিপন কলেজে আই. এ. পড়ে। সহপাঠীদের মধ্যে একজনের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তার নাম প্রণব।

উদ্দেশ্যহীন জীবনে অপু বন্ধন স্বীকার করল যখন আকস্মিকভাবে বন্ধু প্রণবের মামাতো বোন অপর্ণার সঙ্গে অপুর বিবাহ হয়ে গেল। কোথায় কলকাতা আর কোথায় খুলনায় প্রণবের মামাবাড়ি।

আর-এক বৈশাখের জ্যোৎস্না-রাত। দুদিন পূর্বে অপু ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী। আজ তার জীবনে একাকিত্ব নেই, অপরিচিতা এসে দাঁড়িয়েছে অপুর পাশে। এমন দিনে তার মা কোথায়?

"মায়ের যে বড় সাধ ছিল, মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কতো রাত্রে সে-সব কতো সাধ কতো আশার গল্প...মায়ের সোনার দেহ কোদলা তীরের শ্মশানে চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল.... মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন উৎসব ... অপুর আকুল চোখের জলে চারিদিক ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১১)

এখানেই 'অপরাজিত' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

এই বেদনাতেই ইঙ্গিত আছে অপু তার মায়ের পরিবর্তে অপর্ণাকে পেয়েছে। দুর্গা নেই, বাবা নেই, মা-ই অপুর সব—একাধারে বন্ধু, খেলার সাথী, পরামর্শদাতা। অপর্ণার মধ্যে অপু তাকেই পেতে চলেছে। অপুর কাছে মা আর নিশ্চিন্দিপুর সমার্থক, তাই সে মাকে এত ভালোবাসত। অপর্ণা আর নিশ্চিন্দিপুর এক নয়, অপর্ণার প্রতি অপুর টান আছে, প্রকৃত ভালোবাসা নেই—এ সত্য অপর্ণা অনুধাবন করতে পারেনি। মনসাপোতায় বা কলকাতায় অপু অপর্ণাকে নিয়ে সংসার পেতেছে, তার কাহিনি 'অপরাজিত' (দ্বিতীয় খণ্ড)। অপর্ণার মধ্য দিয়ে অপু সর্বজয়াকে, নিশ্চিন্দিপুরকে ফিরে পেতে চেয়েছে। অপর্ণাও চিনেছে তার স্বামীকে, তার শিশুস্বভাব কল্পনাপ্রবণ মনকে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের তেরো টাকা ভাড়ার অন্ধকার ভাড়াটে বাড়িতে বাস আর শীলবাবুদের সেরেস্তায় দশটা-সাতটা কলমপেষা—অপুর স্বপ্নভঙ্গের ছবি। তবু অপু স্বপ্ন দেখে।

"বাড়িতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তালের কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অপর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে খুব ভালো করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এইসব ছেলেমানুষিতে সেও সোৎসাহে যোগ দিয়ে বলে, শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি থাকবে, জানলার জাফরিতে কি উঠিয়ে দেবে বলো তো?" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১৪)

এই স্বপ্নবিলাসী বন্ধন-অসহিষ্ণু অপুর জীবনে অপর্ণা স্থায়ী অধ্যায় হতে পারে না।

"প্রথম জীবনের সে-সব মাধুরীভরা মুহূর্তগুলি যৌবনের কল-কোলাহলে কোথায় মিলাইয়া গেল? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি?... জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—সে স্বপ্ন তাহাকে এতদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিতেছে, তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মতো বৈচিত্রহীন, কর্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১৪)

এই বদ্ধ জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে অপর্ণা। এখানেই অপুর জীবনে অপর্ণার সার্থকতা। আপিস থেকে ফিরে অপু পড়ে ভ্রমণকাহিনি—অজানা দূরদেশে ভ্রমণের সুখ অনুভব করে। অপুর এই মানস ভ্রমণে অপর্ণা তার সঙ্গিনী নয়—সে একাই যাত্রা করে অজানা দেশে—টাহিটি! এল্ পাপ্লো! ওয়াকিকি! ওয়ালোয়া! সুনীল সমুদ্র! বল্‌গা হরিণ! ভালুক! পাহাড়ী ছাগল! গম্ভীর নিনাদী জলপ্রপাত!

শুধুই স্বপ্ন, সত্য শীলেদের সেরেস্তা আর শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের অন্ধকার ঘর। এই আপিস-জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মতো, দুর্বলের মতো মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার মনে অনবরত একটা লড়াই চলছে।

অপর্ণার সঙ্গে অপুর সম্পর্কটা কীরকম? স্পষ্ট করে লেখক জানিয়েছেন,

"অপুর উপর তাহার (অপর্ণার) একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মতো। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসার-অনভিজ্ঞতা, হাসিখুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১৪)

বিয়ের পর দুবছর বাদে এই প্রথম অপু সন্তানসম্ভবা অপর্ণাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গেল। অপর্ণাকে রেখে ফিরে এলো কলকাতার একঘেয়ে জীবনে। তিনমাস বাদে খবর এলো প্রসব হতে গিয়ে অপর্ণা মারা গেছে। অপুর জীবনে আর-একটি বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল।

অপর্ণার মৃত্যুতে অপুকে গ্রাস করল বিরাট শূন্যতা, অনুভব করল এমন ক্ষতি যা অপূরণীয়। 'ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব' অপুকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। সর্বজয়াকে হারিয়ে সে পেয়েছিল অপর্ণাকে। তার মধ্য দিয়ে অপু ফিরে পেতে চেয়েছিল তার শৈশবকে, নিশ্চিন্দিপুরকে। তাও গেল।

তিন বছর লক্ষ্যহীন জীবন যাপনের পর অপু বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈরি করে। তার আগে দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়িতে গেল। তার পুত্র মাতৃহীন শিশু কাজলকে দেখে অপু যেন নতুন বাঁধনে ধরা দিল। ফিরে আসার সময় তার মনে হল—

"এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কতদূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতোই দূরের—অনেক দূরের।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ১৬)

বাইরের পৃথিবী অপুকে বারবার টানে। একদিকে নিশ্চিন্দিপুরের আকর্ষণ, অপরদিকে বহির্বিশ্বের আকর্ষণ : অপুর জীবনে দুই-ই সত্য। এবার সে বাইরের হাতছানিতে সাড়া দিল। গয়া, দিল্লি, এলাহাবাদ, কাটনী। সেখান থেকে নাগপুরের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টে উমেরিয়া—সেখান থেকে আরো কতো গভীর অরণ্যে—পাহাড়ের পর পাহাড়—নির্জন গম্ভীর অরণ্য। অপূর্বর রহস্যপিপাসু প্রকৃতি-ব্যাকুল মনের সঙ্গে এই পাহাড়-অরণ্য চমৎকার খাপ খেয়ে গেল। অমরকণ্টকের পথে অপুর মনে হয় এই পথে কোনো সুন্দরী চারুনেত্রা রাজবধূ পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরবিসর্পিত চক্রবাল রেখায় দুই পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকা, অজস্র পুষ্পশোভিত সানুদেশ, পাহাড়ী নদী—সবকিছুর মধ্যে অপু জীবনের রহস্যময় সৌন্দর্যকে উপভোগ করে।

পাঁচবছর পরে অপু ফিরে এলো কলকাতায়। জীবনে আর-এক আঘাত—তার স্বপ্ন-সহচরী লীলার সঙ্গ ও আত্মহত্যা—অপুকে অভিজ্ঞতার পথে আরো কিছুটা ঠেলে দিল। অন্যদিকে নতুন বন্ধন—তার আট বছরের ছেলে কাজলকে নিয়ে এল শ্বশুরবাড়ি থেকে। কাজল অপুর প্রতিরূপ, তার দ্বিতীয় সত্তা। কাজলের মধ্যে সে খুঁজে পায় তার হারানো

শৈশবকে, তার সমস্ত মোহ-মাধুর্যকে। কাজলকে নিয়ে অপু ফিরে গেল তার শৈশবের স্বপ্নলোক নিশ্চিন্দিপুরে। শৈশবের সেই সুখস্মৃতি কি আর আছে! কালের প্রবাহে তা মুছে গেছে। না, মুছে যায়নি, তা প্রমাণ হল নিশ্চিন্দিপুরে। রাণুদির দৃষ্টিতে কাজল ছোটবেলার অপু হয়ে দেখা দিয়েছে। চব্বিশ বছর আগের দিনটি যেন ফিরে এসেছে। চব্বিশ বছর পূর্বে চড়কের মেলার পরদিনই অপুরা গ্রাম ছেড়ে কাশী চলে যায়। আজ আবার সেই চড়কের দিন এলো। সেদিন যারা মেলা দেখে বাঁশি হাতে হাসিমুখে ফিরে আসত আজ তারা কর্মক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে, কেউ-বা মারা গেছে, আজ তাদের ছেলেমেয়েরা মেলা দেখে বাঁশি হাতে ফিরছে।

অপু তার পুত্র কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরে তার ছেলেবেলার সাথী রাণুদির কাছে রেখে বিশ্বভ্রমণে বের হল। নিশ্চিন্দিপুরে রইল অপুর দ্বিতীয় সত্তা কাজল। বাহিরবিশ্বে বন্ধনমুক্ত জীবনপথিক অপু চলল অজানা দেশের পথে। জীবনের চলমানতা, প্রবহমানতা, অবিচ্ছিন্নতার প্রতিনিধি কাজল।

"রাণুর মনে হইল অপু এমনি দুষ্ট মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি। যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আত্মপ্রকাশ করে। খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল। চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।" (তদেব, পরিচ্ছেদ ২৬)

চার

এই নিবন্ধের প্রথমাংশে বিভূতি-জায়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, 'কাজল' উপন্যাস রচনার বাসনা বিভূতিভূষণের ছিল। এবং সেইমতো 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। তারপরই বিভূতিভূষণের আকস্মিক মৃত্যু। সেই কাজ করলেন বিভূতি-পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা 'কাজল' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে।

উপন্যাস-সূচনায় কিশোর কাজলকেই আমরা দেখি। কাজলের মধুঝরা হাসি দেখে রাণুদির কতো পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়। কাজলেরও তার বাবার কথা খুব মনে পড়ে। হঠাৎই একদিন আফ্রিকা থেকে অপুর চিঠি আসে—ফিজি আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ঘুরে এসে রাণুদি ও কাজল, দুজনকেই অপু লিখেছে। অপুর রেখে যাওয়া ডায়েরিটা কাজল রোজই পড়ে, বাবাকে রোজই মনে পড়ে।

তারপরই অপুর প্রত্যাবর্তন ও কাজলের সঙ্গে পুনর্মিলন। ('কাজল', পরিচ্ছেদ ২)।

'কাজল' উপন্যাসের লেখক তারাদাস চমৎকার ভাবে পথের পাঁচালী অপরাজিত উপন্যাস-লেখকের ভাবাভাবনা প্রকাশভঙ্গি ও গদ্যশৈলী আয়ত্ত করেছেন এবং অপুর বোহেমিয়ান চরিত্রটাকে ধরেছেন। রাণুদিকে কাঁদিয়ে অপু তার ছেলেকে নিয়ে গেল মালতীনগরে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কাজলের লেখাপড়া। এই শহরের এক প্রান্তে একটু ফাঁকা জায়গায় অপু একটা বাসা ভাড়া নিল। মালতীনগর স্কুলে কাজল ভর্তি হল। এবার

অপু তার পূর্বেকার জীবনে ফিরে গেল—গল্প উপন্যাস লেখা শুরু করল। কালক্রমে কলকাতার পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হল। সেখানে তার কিছু অর্থাগম শুরু হল। মালতীনগরেই আলাপ হল হৈমন্তী ও তার পরিবারের সঙ্গে। হৈমন্তীও গল্প লেখে। তাদের বাড়িতে গিয়ে অপুর মনে হল বাড়িময় সাহিত্যের আবহাওয়া। অপু আর কাজলের সঙ্গে হৈমন্তীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাজলও হৈমন্তীকে পছন্দ করেছে। হৈমন্তী গল্প লেখে, গান করে। অপুর মনে হল সে একা জীবন কাটাতে পারবে না। তাই সে হৈমন্তীকে বিয়ে করতে চাইল এবং হৈমন্তীর পরিবার সে প্রস্তাব গ্রহণ করল। (পরিচ্ছেদ ৩)। কাজল ও হৈমন্তী—পরস্পরকে পছন্দ করে। তাই বিয়েটা হয়েই গেল। অপুর মনের মণিকোঠায় আছে অপর্ণা, আর বাস্তবজীবনে তার সঙ্গিনী হল হৈমন্তী।

অপু এর মধ্যে একদিন নিশ্চিন্দিপুর গেল এবং হৈমন্তী আর কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরেই বাসা বাঁধল। (পরিচ্ছেদ ৪)। সুখের বিষয়, তাতে হৈমন্তীর আপত্তি হল না। অপুর মনে হল আর একবার সে তার স্বপ্নলোক শৈশবলোক আনন্দ-স্বর্গে ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, রাণুদি খুব খুশি হল। অপু আর হৈমন্তী পুরী বেড়াতে গেল। কাজল রইল রাণুদির কাছে। পুরী কোনারক হৈমন্তীর ভালো লাগল, কিন্তু অপুকে বলল—ফিরে চলো, খোকাকে (কাজল) ছেড়ে থাকতে পারছি না। (পরিচ্ছেদ ৫)

অপু চির ভ্রাম্যমাণ। নিশ্চিন্দিপুর আর কলকাতা যাওয়া-আসা করে। প্রকাশকসম্পাদকরা অর্থসাহায্য করে। অপু সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মৌপাহাড়ীতে একটা নতুন আস্তানা করেছে। মাঝে মাঝেই সেখানে চলে যায়। কাজল ক্রমশ বড় হতে থাকে। তার পিতার মতো সেও সাহিত্যপ্রেমী হয়ে ওঠে। অপু তাকে অনেক বই এনে দিয়েছে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যরাজ্যে সে মানস-পরিভ্রমণ করে। মৌপাহাড়ীতেই অপুর শরীর খারাপ হতে শুরু করে। বুকে একটা বেদনা হয়। স্থানীয় ডাক্তার তাকে কোরামিন দেন। ডাক্তার বলেন—বিশ্রাম নিন, কাজ থেকে ছুটি নিন। অপু তা জানে, কিন্তু তার মন সেকথা মানে না। কাজল আর হৈমন্তী একদিকে, সাহিত্যসৃজন আর একদিকে—এ নিয়েই অপু জীবনে পূর্ণতা বোধ করে। (পরিচ্ছেদ ৬)। অপু আবার বুকে বেদনা বোধ করে। সুবর্ণরেখার ধারে একটা পাথরে গা এলিয়ে দিয়ে বসে অপু। খুব ক্লান্ত, তার ঘুম পায়। ঘুমে ডুবে যাবার পূর্বে মনে হয় তার মা তাকে বলছেন, খোকা, তুই ঘুমো। আহা রে, বড্ড খাটুনি গেছে তোর। (পরিচ্ছেদ ৬)। বুধন সর্দার তাকে ওই অবস্থায় প্রথম দেখে। অপু চিরঘুমের দেশে চলে গেল কাজল আর হৈমন্তীকে ফেলে। (পরিচ্ছেদ ৬-৭)। অনেকদিন বাদে অপুর বন্ধু প্রণব এলো। দেখল, অপুর ছেলে কাজলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়—হৈমন্তী আর তার বাবা সুরপতিবাবু। বিদায় নেবার পূর্বে প্রণব হৈমন্তীকে বলে গেল—'সান্ত্বনা দেব না। অপুর চলে যাওয়ায় আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। শোক সহ্য করুন, কাজলকে মানুষ করুন, ওর দুচোখে ওর বাবার আগুন আছে।' (তদেব, পরিচ্ছেদ ৮)

মালতীনগরে মা ছেলে, হৈমন্তী কাজলের জীবন কাটে। কাজল বাবার ডায়েরি পড়ে, মুদ্রিত গল্প উপন্যাস পড়ে। অপুর মতোই সে স্বপ্ন দেখে—দেশবিদেশের মহাবিশ্বের।

বিশাল আকাশ আর গ্রহগুলি দেখে কাজল মুগ্ধ, বিস্মিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বসমর শুরু হয়ে গেল। কাজল এখন বি. এ. পড়ে। কলকাতা আর ভালো লাগে না। তার মা হৈমন্তীর সঙ্গ ভালো লাগে। হৈমন্তী তাকে নিজের শৈশব, অপুর শৈশব ও কাজলের শৈশবের নানা গল্প করে। অপুর মতোই সে তার মা হৈমন্তীকে বলে—বি. এ-টা দিয়ে চাকরি নিয়ে চলে যাব কোনো নির্জন জায়গায়। সর্বজয়ার মতোই হৈমন্তী বলে কাজলকে—বুড়ো, তোকে ছেড়ে আমি কোথায় থাকব। তুই তো আমার সব। (তদেব, পরিচ্ছেদ ১৫)। অপুর মতোই কাজল মনে মনে বাউল বৈরাগী হয়ে ওঠে। সে-ও বাবার মতো ডায়েরি লেখে। অনেকদিন বাদে নিশ্চিন্দিপুর যেতে ইচ্ছে করে, আবার অনেক দূরে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে।

এখানেই 'কাজল' উপন্যাসের সমাপ্তি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ট্রিলজি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৫-১০-১৮৯৪—৫-১২-১৯৬১/২০ আশ্বিন ১৩০১—১১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, মননশীল, বুদ্ধিজীবী লেখক। তাঁর বেশির ভাগ রচনা ইংরেজি ভাষায়। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে সাধারণ্যে অস্পষ্ট ধারণা আছে। আবার তিনি যে গল্প উপন্যাসলেখক সে সম্পর্কেও আবছা ধারণা আছে। অথচ সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আরো বেশি হতে পারত। না হওয়ার প্রধান কারণটি রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তাঁকে জানিয়েছিলেন :

"আমের ভিতরে আছে একটি অনবচ্ছিন্ন শাঁস, আর তার মাঝখানটিতে একটিমাত্র আঁটি। দালিমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা, এবং প্রত্যেক দানার মধ্যে একটি করে বীজ। তোমার অন্তঃশীলা সেই দালিম জাতীয় বই। বীজ-বাণীতে ঠাসা। তুমি এত বেশি পড়েছ এবং এত চিন্তা করেছ যে তোমার ব্যাখ্যান তোমার আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করে বিস্ফূরিত হতে থাকে। আমার বোধ হচ্ছিল তোমার এই গল্পটি তোমারি চরিতকথা, গল্পের দিক থেকে নয়, আচরণের দিক থেকে। ... তোমার গল্পের পাত্রগুলি জীবনযাত্রায় একটু ঠোকর খেলেই তাদের মাথা থেকে ভাবনা ছিটকে পড়তে থাকে। তারা কী ভাবে সেইটেই সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। ... হয়তো আমিও আমার গল্পে নিজেকে প্রকাশ করে থাকি। আমার প্রকাশ যুক্তিতে নয়, চিন্তায় নয়, কল্পনায় ছবিতে...। ... আমার পাত্ররা আমারই মতো কল্পনাশীল, তোমার পাত্ররা তোমারই মতো চিন্তাশীল ; তোমার দলে লোক বেশি নেই, একথা মনে রেখো—ভাবতে বললে মানুষ চটে ওঠে, অথচ এই বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বলেচ, ভেবে দেখো। এর ফল তুমি পাবে আমার চেয়েও সকাল সকাল, এ আমি তোমাকে বলে রাখচি।" (১৩ জুলাই ১৯৩৫)। রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যবাণী মিথ্যা হয়নি। গল্প-উপন্যাসলেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বহুদিন বিস্মৃত। তাঁর গল্পগ্রন্থ উপন্যাসের একাধিক সংস্করণ বিশেষ ঘটেনি। 'ভাবতে বললে মানুষ চটে ওঠে।' ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর গল্প উপন্যাসে পাঠককে ভাবতে বলেছিলেন, তা'ই পাঠক তাঁর সাহিত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (বিশদ পরিচয়ের জন্য পশ্য শ্রী অলোক রায়ের 'ধূর্জটিপ্রসাদ জীবনী ও তথ্যপঞ্জী,' ১৯৭০)

এহেন সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলি দু-খণ্ডে প্রথম বেরোয় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে 'অন্তঃশীলা' প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পরে (দে'জ পাবলিশিং)। সতের বছর পরে (২০০২) রচনাবলির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে (দে'জ পাবলিশিং)। এতে কথাসাহিত্যের পাঠক হিসেবে আমাদের গর্ব করার কিছু নেই, বরং লজ্জিত হবার কারণ আছে। যেখানে গুটিকতক পাঠক ও উৎসাহী প্রকাশকের নিজস্ব তাগিদে ক্ষুরধারবুদ্ধি মননশীল

কথাসাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হয় সেখানে পাঠক হিসেবে গর্বিত হবার কারণ নেই।

মনে আছে ছোটবেলায় মা-মাসিদের মামাদের কাছে তাঁদের পরিবারের শাখা-প্রশাখার অনেক গল্প শুনেছি। তার মধ্যে ধুকুদা, বেলাদার নাম শুনেছি। একটু বয়স হলে বুঝলাম ধুকুদা হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেলাদা হলেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাজেই সম্পর্ক সূত্রে তাঁরা আমার ধুকুমামা বেলামামা। বেলামামাকে অনেকদিন ধরে দেখেছি, কারণ তিনি কলকাতায় থাকতেন। ধুকুমামাকে অনেক পরে দেখেছি, কারণ তিনি থাকতেন লখনউয়ে। ধুকুমামাকে বেশি করে দেখেছি, তাঁর জীবনের সায়াহ্নে। তাঁর পুত্র কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে তাঁকে দেখি। আলাপ করি। গলার ক্যান্সারে জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত ধুকুমামাকে দেখে আমি বেদনাদীর্ণ। তখন কিছু খেতে ও কথা বলতে তাঁর কষ্ট হত। যত বলি, আপনি আর কথা বলবেন না, ততই তিনি ধীরে ধীরে কথা চালিয়ে যেতেন। তখন তাঁর চেহারার উজ্জ্বল দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তবু তাঁর মধ্যে থেকেই এক মননশীল মানুষ বারবার দেখা দিত।

সে সময়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী পড়েছি। উপন্যাস পড়েছি পরে। মনে পড়ে, বেলামামার কাছে শুনেছি, ধুকুমামা তাঁর আলাপচারিতা বা স্বগতোক্তিপুঞ্জ লিখে পাঠিয়ে দিতেন বেলামামাকে। তিনি তা ঠিকঠাক করে পাঠাতেন সাগরময় ঘোষকে। তা 'দেশ'-এ প্রতি সপ্তাহে বেরুত 'মনে এলো' (১৯৫৬) নামে।

'মনে এলো' পড়েই ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যিক তথা সদাজাগ্রত মননশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম।

"তাঁর জীবিতকালে কেবল 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের আর সংলাপের আকারে 'আমরা ও তাঁহারা' প্রবন্ধগুচ্ছের একটি করে নতুন সংস্করণ বেরিয়েছিল। কিন্তু 'আবর্ত' ও 'মোহানা' বাকি দুই খণ্ড উপন্যাসের ও একমাত্র গল্পসংকলন 'রিয়ালিষ্ট'-এর এবং তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের বইগুলির আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি। তার কারণ, বইগুলির কপি সুলভ ছিল না এবং প্রকাশক মহলেও উৎসাহ ছিল না। .... সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠক যাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যিক কৃতিত্বের কথাই শুনেছেন অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে তাঁর এক দিকনির্দেশক মৌলিক অবদানের কথা শুনেছেন, তাঁদের চাহিদাই ছিল বেশি। কারণ, তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিচয় এযাবৎ অবহেলিত ও প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছে।" (বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'নিবেদন' ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, (২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২)।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সে-সব বই এখনও সহজলভ্য নয়। খুঁজে পেতে পড়তে হয় এসব বই। কথাসাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানী ধূর্জটিপ্রসাদের দু ধরনের বই ইংরেজি ও বাংলায় পাশাপাশি বেরিয়েছে। অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭), মোহানা (১৯৪৩)—ত্রিলেখ উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ 'রিয়ালিষ্ট' (১৯৩৩), 'আমরা ও তাঁহারা' (১৯৩১), 'চিন্তয়সি' (১৯৩৩), 'কথা ও সুর' (১৯৩৮), 'মনে এলো' (১৯৫৬), 'বক্তব্য' (১৯৫৭), 'Diversities : Essays in Economics, Sociology and Other Social Problems' (1958), 'Basic Concepts of Sociology' (1932), 'Tagore–A Study' (1943), 'Indian Music : An Introduction' (1945), 'Views and Counterviews'

(1946), 'Problems of Indian Youth' (1946), 'Personality and the Social Sciences' (1924), 'Modern Indian Culture, A Sociological Study' (1942)।

তিন খণ্ডের উপন্যাসে সমগ্রতার চেহারা পাই। লেখক জীবনের সমগ্রতাকেই দেখতে চেয়েছেন। তাই কেবল প্রথম খণ্ড পড়লে ত্রিলেখ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা খগেনবাবু রমলাদেবীকে সম্পূর্ণরূপে চেনা যাবে না। লেখক রিয়ালিস্ট, না মেটিরিয়ালিস্ট, না তীব্রবিরোধী রোমান্টিক : এইভাবে প্রশ্ন করলে উপন্যাসলেখক ধূর্জটিপ্রসাদের পরিচয় এক কথায় দেওয়া যাবে না। নায়ক খগেনবাবুর ক্ষেত্রে লেখকের আত্মপরিচয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, একথা স্বীকার করেও মেনে নিতে হয় এটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস নয়।

গোড়াতেই স্বীকার্য, এই ত্রিলেখ উপন্যাসের পাঠ সহজপাঠ নয়। ইহা কাহিনিসর্বস্ব ঘটনাপ্রধান রোমান্স-মিশ্রিত উপন্যাস নয়। ত্রিলেখ উপন্যাস পড়তে গিয়ে পাঠককে শিরদাঁড়া সিধা করে বসতে হয়।

"শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী ; এবং জনশ্রুতি সত্য হলেও আশ্চর্যজনক নয়। ... এতে সন্দেহ নেই যে নভেল আমাদের অবসর বিনোদনের সাথী এবং সেইজন্যে তার অবস্থা বাংলাকাব্যের চেয়েও শোচনীয়, প্রায় বাংলা প্রবন্ধের মতোই সঙ্গীন।" ('বিচিত্রা' আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যায় 'ধূর্জটিপ্রসাদ ও অধিকারভেদ' নিবন্ধ। পরে 'স্বগত', ১৩৪৫, এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' ১৩৬৪, গ্রন্থদুটিতে 'অন্তঃশীলা' নামে অন্তর্ভুক্ত)। ('ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', নভেম্বর ২০০২, দে'জ পৃ. ৪২৫)।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের এই শোচনীয়তা ঘোচাতে অগ্রণী উপন্যাসলেখকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচনা করেন।

ধূর্জটিপ্রসাদকে সুধীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী, মানবপ্রেমিক বলে মনে করেন। 'অন্তঃশীলা'র লেখক সম্পর্কে এই নিবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য—

"আসলে ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিমান হলেও, বুদ্ধিসর্বস্ব নন ; তিনি হৃদয়বান ও আশুসচেতন ; এবং তাই তাঁর সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু শেষ পর্যন্ত আর অগাধ পাণ্ডিত্যে তুষ্ট রইলেন না, প্রজ্ঞাপারমিত সমর্পণেই আত্মদর্শনের ছেদ টানলেন। কিন্তু সমাপ্তি যদি ভাবপ্রধান, তবু 'অন্তঃশীলা'য় ভাবালুতার নামগন্ধ নেই।....

চৈতন্য যেহেতু চিরদিন ব্যক্তিপ্রভাব এবং অনুভূতি সর্বত্র সোহংবাদী, তাই আপাতত খগেনবাবুই যদিও গল্পের নায়ক, তবু প্রকৃতপক্ষে পুস্তকখানির মুখপাত্র স্বয়ং গ্রন্থকর্তা। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্মস্পর্শী যে এই আত্মচরিতও আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে। খগেনবাবু ও তাঁর পার্শ্বচরিত্রগুলি আমাদের সকলেরই প্রতিভূ ; তাঁদের মতো আজকের মানুষ বিশেষ ও সামান্য, মস্তক ও হৃদয়, প্রেম ও প্রভুত্ব ইত্যাদি উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন, এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে আমরা অনেকে তাঁদের বিপরীতগামী বটে। তথাচ নির্দ্বন্দ্ব তাঁদের ন্যায় আমাদেরও কাম্য। সেইজন্য কথাসাহিত্য হিসাবে বইখানার একাধিক স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্ত্বেও 'অন্তঃশীলা'কে আমি স্মরণীয় মনে করি। চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধে

মত প্রকাশের সময়ে যে স্বকীয়তার আতিশয্যে ধূর্জটিপ্রসাদ পাঠকের সমর্থন হারান, এখানে সেই ঐকান্তিক রীতিই পুস্তকটির মূল্য বাড়িয়েছে। কারণ যে সত্য সার্বজনীন নয়, তা যেমন অগ্রাহ্য, তেমনই সার্থক অভিজ্ঞতা মাত্রেই প্রামাণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; তার বিরুদ্ধে নাস্তিকের প্রতর্ক খাটে না; তাকে সবিনয়ে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।" (তদেব, পৃ. ৪২৮)

সুধীন্দ্রনাথ অতঃপর 'অন্তঃশীলা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে বিশদ করতে গিয়ে আরো কয়েকটি দামি কথা বলেছেন। এ উপন্যাস যে শিশুপাঠ্য উপন্যাস নয়, এটি ভাবুকের জন্য লিখিত ও ভাবুকের দ্বারা লিখিত—তা বলেছেন।

সত্তর বছর পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ 'অন্তঃশীলা' সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা আজও পাঠককে পথের দিশা দেখায়।

'অন্তঃশীলা'র আখ্যানভাগ চমৎকার। সাধারণ কথক যেখানে এসে থামেন সেইখানে লেখকের প্রস্তাবনা। এই মত প্রকাশের পর সুধীন্দ্রনাথ কাহিনিসার সংকলন করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, খগেনবাবু, রমলা, সুজন—তিনজনে 'এই যন্ত্রঘর্ঘরিত বিংশ শতাব্দীতেই ফিরে ফিরতি বোঝেন যে বিদেহ মিলন কেবল মরমীদের অসার স্বপ্ন নয়, দেহাত্মবাদী সাম্প্রতিক মানুষও সে-অঘটন সংঘটনে সমর্থ।' এমন অভিমত প্রকাশের পরে সুধীন্দ্রনাথ কবুল করেন তাঁর এই কাহিনী-সারসংগ্রহে বইখানিকে 'রূপকের মতো দেখাচ্ছে'। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লেখেন, 'এ উপন্যাসের দার্শনিক ভূমিকা যাই হোক না কেন, গল্পটি উপাদেয় ও চরিত্রগুলি জীবন্ত। তবে উপাখ্যানের সম্পূর্ণ রস পাবেন তাঁরাই, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্য যাঁদের নখদর্পণে।' (তদেব, পৃ. ৪২৯)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেষোক্ত মন্তব্যটি ধূর্জটিপ্রসাদের এই ত্রিলেখ উপন্যাস পাঠে স্মরণ রাখা পাঠকের অবশ্যকর্তব্য। ত্রিলেখ উপন্যাসপাঠে আমাদের মনে রাখতে হয়, লেখক-খগেনবাবু মারফত পাঠককে জানিয়ে দেন প্রুস্ত, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত।

ত্রিলেখ-উপন্যাস পড়তে গিয়ে প্রথম বিশ্বসমরকালীন ফরাসি ও ইংরেজি উপন্যাসের নব আন্দোলনের প্রাথমিক পরিচয় আমাদের রাখতেই হয়। চেতন, অবচেতন, চেতনাপ্রবাহ, ব্যক্তিত্বের অন্তর্বিশ্লেষণ ও অন্তর্মুখিতা, অন্তঃসংলাপ সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন থাকতে হয়।'

এ প্রসঙ্গে 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে (১ম সং ১৯৭৪, ২য় সং ১৯৯১, ৩য় সং ১৯৯৯) যে-কথা লিখেছিলাম, তা প্রাসঙ্গিক বলে' এখানে উদ্ধার করি;

"রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক উপন্যাসটি (চতুরঙ্গ, ১৯১৬) লিখতে যে তিনটি আধুনিক উপায় অবলম্বন করেছেন, তার ব্যবহারও বাংলা উপন্যাসে প্রথম। অবচেতন, প্রতীক ও সংলাপকে তিনি চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ঘটাতে ব্যবহার করেছেন। ... ইন্দ্রিয়নির্ভর জগৎ থেকে অবচেতনের অনুভূতিতে শচীশের বারবার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, নির্বিশেষকে সে বিশেষরূপে পেতে চেয়েছে, বিশেষকে অতিক্রম করেই নির্বিশেষে যেতে চেয়েছে।.... সংলাপ এখানে হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ, সে কারণেই

চতুরঙ্গ-এ সংলাপের উপর এত জোর পড়েছে।... নিপুণতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গ-এ (একটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ : শচীশ ১০) এই একবার interior monologue (অন্তঃসংলাপ) ব্যবহার করেছেন। চেতনাপ্রবাহের (sream of consciousness) শিল্পরূপই হ'ল interior monologue। উপন্যাসের এই আধুনিক রীতি কল্লোল-কালিকলম-বিচিত্রার লেখকরা ব্যবহার করেননি। সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনের ও জীবনের জটিলতাকে দেখিয়েছেন। চতুরঙ্গ-এর শিল্পসিদ্ধি সেদিন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের উদ্দীপ্ত করেনি। ব্যতিক্রম—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তার বহুল ব্যবহার হল শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতা প্রকাশের রূপসন্ধানের দিকে সমকালীন লেখকদের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।" ("কালের প্রতিমা', ৩য় সং, ১৯৯৯, মার্চ ১৪০৫, পৃ. ১৩-১৫, দে'জ)।

এই প্রসঙ্গে স্বীকার্য, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে এই নবধারার চতুরঙ্গ-পরবর্তী প্রথম সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় 'লাল মেঘ' এবং পরবর্তীকালে 'তিথিডোর' উপন্যাসে।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই ত্রিলেখ উপন্যাস সম্পর্কে এযাবৎকাল যে সব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তা সর্ববাদীসম্মত নয়। যে কারণে ত্রিলেখ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য দেখা দরকার। তারপরেই আমরা তিনটি উপন্যাসের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 'অন্তঃশীলা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে এবং 'আবর্ত' ও 'মোহনা' প্রকাশকালে লেখকের যে বক্তব্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, তা দে'জ পাবলিশিং-প্রকাশিত 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী' প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে (২য় সং, দে'জ, নভেম্বর, ২০০২) সংকলিত। '' থেকে লেখকের তৎকালীন মানসিকতা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। (পশ্য শ্রী অলোক রায়ের 'ধূর্জটিপ্রসাদ জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী', ১৯৭০)।

দুই

অন্তঃশীলা উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকাটি এখানে উদ্ধার করে অন্তঃশীলা-র পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

"অন্তঃশীলার উৎস তার প্রথম অধ্যায়। সেটি 'এই জীবন' নামে গল্পের আকারে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি বন্ধুরা গল্পটির সম্ভাব্যতা লক্ষ্য করে তাকে পূর্ণায়তন নভেলের আকার দিতে আমাকে প্রবুদ্ধ করেন। একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হ'ল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া, কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞানে খগেনবাবুর রমলা দেবীর প্রতি আকর্ষণ হ'ল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এইখানেই শেষ হয়নি। আবর্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলেছে।

বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নূতনত্ব আমার রচনাভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য। কিন্তু অন্তঃশীলার রচনাকালে দেখলাম

বীরবলী ভাষা এতই সচেতন যে তার সাহায্যে খগেনবাবুর মনের নিম্ন-চেতন অংশের খবর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। অন্য ধারে এও বুঝেছিলাম যে 'চেতনাস্রোতে' গা ভাসিয়ে দিলে স্বপ্নরাজ্যের কিংবা বাতুলতার আঘাটায় হাজির হব। অতএব দুটিকেই কিছু অদলবদল করতে বাধ্য হই। অন্তঃশীলার ভাষাকে বীরবলী ও তার ভঙ্গীকে প্রুস্তীয়ান বলা ঠিক চলে না। মনের যদি অন্ততঃপক্ষে দুটি স্তর থাকে—একটিতে শিক্ষার্জিত ধ্যানধারণা প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়, আর অন্যটিকে জৈব প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব যদি বেশী হয়, এবং যদি একই মানুষের পক্ষে দুটি স্তরকে পৃথক রাখা অসম্ভব হয়, তবে ভাষা ও ভঙ্গী কিছু ভিন্ন হবেই। সেইসঙ্গে ইনটেলেকচুয়ালিজমের অসার্থকতা, অবাস্তবতা সব কিছুই প্রকাশিত হয়ে যায়।

অর্থাৎ অন্তঃশীলা আমি ভাবের বশে লিখিনি। এর মধ্যে না আছে আত্মকথা, না আছে ভাবগত প্রেরণা। অথচ খুঁটিনাটি ঘটনার পিছনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। সেসব অভিজ্ঞতা চিন্তার ভেতর দিয়েই চালু হয়ে এসেছে। এবং মন যখন প্রধানত লেখকের তখন লেখকের মনোভঙ্গী ও ভাষা কিছু পরিমাণে তার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে মিলে যাবে।

আমার মন খগেনবাবুকে ধার দিয়েছি এই মাত্র। এই লেনদেন সব লেখকই করে থাকেন, কেউ বেশী আর কেউ কম, কারুর হার উঁচু কারুর নীচু। ব্যাপারটা মোটেই গুহ্য নয়।" (১লা মে ১৯৫৬, কলকাতা)

অন্তঃশীলার এই ভূমিকা থেকে লেখকের মন, অনুসন্ধিৎসার কিছুটা ধারণা করা যায়। এখন উপন্যাসপাঠের মাধ্যমে এই ধারণাকে স্পষ্ট করা যায়। (এই নিবন্ধের সর্বত্র পাঠ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা দে'জ পাবলিশিং-প্রকাশিত ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০০২ থেকে গৃহীত।)

ত্রিলেখ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড অন্তঃশীলা। এর পটভূমি বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শহর কলকাতা। সেই কলকাতার চেহারা ও চারিত্র আজকের পাঠকের ধারণার বহির্ভূত। কেবল প্রবীণ পাঠকরা সেই কলকাতাকে শনাক্ত করতে পারবেন।

স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যার পর করোনার কোর্টের রায় বেরুবার পর-মুহূর্ত থেকে উপন্যাসের সূচনা। বিপন্ন খগেনবাবুর আত্মচিন্তা, আত্মনিমজ্জন, নিষ্ক্রিয়তা সূচনায় লক্ষ করা যায়। সেই বিপন্ন মুহূর্তে রক্ষাকর্ত্রী রূপে এগিয়ে এলেন রমলাদেবী, যাঁকে স্ত্রীর সূত্রে খগেনবাবু চেনেন। খগেনবাবুর মনকে তিনি কীভাবে অধিকার করে নিলেন তার ইতিহাস এই উপন্যাস। এটি বাহ্যজগতের ঘটনামালার বিবরণ নয়, ঠাসবুনট কাহিনি নয়, অন্তর্জগতের নানা তরঙ্গভঙ্গের পরিচায়ক।

আত্মঘাতিনী স্ত্রীর শেষ সৎকার-ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু। গোড়া থেকেই খগেনবাবু আত্মমগ্ন। তাঁর অন্তর্মুখীনতা, অন্তঃকথন, আত্মনিমজ্জন অর্থবহ ভাষাশব্দবাক্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে লেখক পৌঁছে দিয়েছেন। যুবক সুজন তৎপর হয়ে সব কাজ করে দিল আর জীবনাসক্ত রমলাদেবী নিষ্ক্রিয় খগেনবাবুকে ঠেলে নিয়ে চললেন। সেই রাতে খগেনবাবুর ভালো ঘুম হল না। বিঘ্নিত দাম্পত্য সম্পর্ক ও পত্নী সাবিত্রীর নানা ঘটনা তাঁর মনে ভিড় করে এল ও গেল।

মাত্র একদিনের মধ্যেই যে ছিল সাবিত্রীর পরিচিতা, সে হয়ে উঠল খগেনবাবুর চালিকা। রমলাদেবী ধীরে অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে খগেনবাবুকে অধিকার করে নিলেন। ভাঙা দাম্পত্য সম্পর্কের পটভূমে এই অধিকার স্থাপনের কাহিনি অন্তঃশীলা।

খগেনবাবু চিন্তাস্রোতে ভেসে যান। সুজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তিনি অন্তর্কথনে আত্মনিযুক্ত।—

"পরিচয়ের আবার ক্রমিক ইতিহাস কি? দুজনে চিরদিন একত্র বসবাস করলেও পরিচয় হয় না, আবার এক মুহূর্তেই ব্যবধান অপসৃত হয়, সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, হঠাৎ যেন চোখ খোলে, ছানি খসে যায়। ... পরিচয়ের জন্য ধীর, শান্ত ও মৌন প্রতীক্ষার প্রয়োজন, চারপাশের ভিড় সরান দরকার, গোধূলির নীরব অবসরে একটি তারা ফোটার মতন। সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঝড়ের মধ্যে—ভাবপ্রবণতার আবর্তে, তাই আলাপ জমল না। রমলাদেবীর সঙ্গে পরিচয় শুরু ঝড়ের পরে। ভাব যখন নিঃশেষিত হয়েছে তখনও ঝড়ের স্মৃতিরেশ টানছে।" (পৃ. ৮৯)।

সুজনের সঙ্গে যে খগেনবাবু তর্কবিতর্ক করেন তিনি বহির্জগৎ-সচেতন। আর যে খগেনবাবু সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যসম্পর্কের ভাঙচুর নিয়ে মনে মনে ভাবেন, তিনি অন্তশ্চেতনা-পথবাহী। তারপরই রমলাদেবীর সঙ্গে কথালাপ। কথার পর কথা, তারপর আবার কথা। এ উপন্যাস কথালাপনির্ভর। সংলাপনির্ভর। এই সংলাপের দর্পণে চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়ে। যেমন পড়েছে চতুরঙ্গ উপন্যাসে। রমলাদেবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই খগেনবাবু মনের মধ্যে দুই নারীর পার্থক্য বিচার করতে থাকেন। কলেজ স্কোয়ার, হ্যারিসন রোড, সকালের কলকাতা—এই পটভূমিতে খগেনবাবু তাঁর চিন্তাপ্রবাহে ডুব দেন। 'আদর্শ মানা না গেলেও values মানতে হয়' (পৃ. ৯৮)—'এটাই যদি সত্যি হয় তবে মানুষ কোন পথে এগোবে?—নিষ্কাম ধর্মপথে, না, সকাম কর্মজগতে? দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বীজে না, স্বভাবের বৈচিত্রে? সমাজ স্বাতন্ত্র ঘুচিয়ে দিতে চায় কেন? এ তো সামাজিক জুলুম।' (পৃ. ৯৯)

রমলাদেবীর বাড়িতে খগেনবাবুর শোক অপনোদনের প্রয়াস করেছিলেন রমলাদেবী। অল্প পরেই বুঝতে পারলেন তার কোনো প্রয়োজন নেই ; খগেনবাবু সাবিত্রী থেকে অনেক পূর্বেই মন তুলে নিয়েছেন। কথার পর কথা, সংলাপের পর সংলাপ। সদ্যবিপত্নীক খগেনবাবু আর স্বামীসম্পর্কবিচ্যুতা রমলাদেবীর কথালাপে ধীরে ধীরে এ সত্যই পরিস্ফুট হতে লাগল তাঁরা পরস্পর সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী এবং অচিরে বোঝা গেল তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। খগেনবাবু জানালেন তিনি কাশী চলে যাচ্ছেন। এই সংবাদে রমলাদেবী তাঁর প্রতি আরো মনোযোগ দিতে চাইলেন।

তাঁদের কথালাপের ভিড় ঠেলে অগ্রসর হলে পাঠক অনুধাবন করে তাঁরা পরস্পরকে বুঝতে চাইছেন। খগেনবাবু জোর দিলেন মানবিক সম্বন্ধের উপরে।

সামনে উপবিষ্টা মহিলার বর্ণনা দিলে বা তাঁর ছবি আঁকলেই তাকে চেনা যায় না। খগেনবাবু শুধান—ছবি থেকে 'আপনি আমার কথা শুনছেন, আমি কথা কইছি—এই মানবিক সম্বন্ধটি (ছবির) বর্ণনা থেকে বাদ পড়ল। এইটেই কিন্তু আদর্শ, এই সম্পর্কেই

আপনি আপনি, আমি আমি। কোনো সাহিত্যিক এই চলিষ্ণু গতিশীল, এই অশরীরী অথচ বাস্তব সম্বন্ধরূপী সত্তাকে রূপ দিতে পারেন কখনও?' (তদেব)

খগেনবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে রমলাদেবী একটু হেসে বলেন—"সম্বন্ধের অস্তিত্ব মানেন দেখছি।" (তদেব)

খগেনবাবুর প্রতিপাদ্য—"আর্টের মূলধন স্মৃতি, প্রেমেরও তাই, সেইজন্য আর্ট ও প্রেমে অত মিল। বন্ধুত্ব হয় আছে, না হয় নেই। নতুন কিছুতে পরিণত হয় না—ভারি মজার ব্যাপার। বড় খাঁটি জিনিষ, দেহটা যেন। এসব নিয়ে আলোচনা করা যায় না, অতএব সাহিত্যেও করা যায় না।" (পৃ. ৭২)।

পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে রচিত 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে দুই প্রাপ্তবয়স্কের এই সংলাপ কি আজকের পাঠকের কাছে নিরেশ বলে মনে হয়?

এইসব আলাপের মধ্য দিয়েই খগেনবাবু রমলাদেবী পরস্পরের কাছাকাছি আসতে থাকেন। খগেনবাবু সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব ততই অনুভব করতে থাকেন।

খগেনবাবু যে কতো পড়ুয়া, জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে যে তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা তা অনুধাবন করা যায় কলেজ স্ট্রিটে তাঁর পরিচিত বইয়ের দোকানে যখন তিনি গেলেন। সেখান থেকে তিনি কি কি বই নিলেন বা সন্ধান করলেন?—স্কট মনক্রিফ (প্রুস্তের অনুবাদক), একটি বেল্লির জীবনী, বেরেনসন (কাব্যসমালোচক), মর্গান লিউইস, পাউইস, প্যাসকালের পেনসীজ, গ্যাসেটের 'জনসাধারণের উপদ্রব', মার্কাস অরেলিয়াসের নতুন এডিশন, রাশিয়ান ফিল্মের বই, এপিকটেটাস, সেনেকা, মনটেন (মঁতেন), গ্যেটে—কতো লেখক, কতো বই।

খগেনবাবু সবই দেখেন, বেশির ভাগই কেনেন। বই সম্পর্কে তাঁর ধারণা বুদ্ধদেব বসুর ধারণার সঙ্গে খুব মেলে। বইয়ের চেহারা সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ ও বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহের কথা মনে পড়ে। খগেনবাবুর সামনে স্তূপাকার বই, তাঁর মনে হল, "মরোক্কো চামড়ার চমৎকার বাঁধন, মোড়া যায়। বই-এর পাতার ও চামড়ার গন্ধ ও স্পর্শ খগেনবাবুকে অভিভূত করে। ছোটখাট বই, রং-বেরঙের বাঁধাই, পকেটের মধ্যে আপত্তি না জানিয়ে চলে যায়, গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছা করে, ছুঁলে গা শির-শির করে ওঠে, কাঁটা দেয়।" (তদেব)

খগেনবাবুর মানসিকতা, তাঁর ধ্যানধারণা, তাঁর রুচি—সবকিছু সম্পর্কেই একটা ধারণা পাঠক এখানে করে নিতে পারে। বইয়ের প্যাকেট বাড়ি এনে খগেনবাবু একে একে বইগুলি দেখতে লাগলেন। এই বর্ণনা থেকে আমরা খগেনবাবুকে আরো ভালো করে চিনে নিতে পারি।

খগেনবাবু কাশী যাবেন, তাই এলেন বইয়ের দোকানে। "বেনারস যেতে হবে। সেখানে প্যাঁড়া পাওয়া যায়, বই পাওয়া যায় না।" এই বিবরণ থেকে আমরা তাঁকে চিনে নিই। আর এই প্রসঙ্গেই খগেনবাবুর মনে উদয় হয় তুলনা—"সাবিত্রী ছিল উৎসবমূর্তি, মন্দিরাভ্যন্তরে যে মূর্তি বিরাজ করত সেটি রমলাদেবীর।" (তদেব)

রমলাদেবীর সঙ্গে কথার মধ্যে পাঠক পেয়ে যায় 'অন্তঃশীলা' শব্দের প্রথম ব্যবহার

(তদেব)। রমলার অনুযোগ—'আপনি বড় বেশি তলিয়ে দেখেন'—এর উত্তরে খগেনবাবু—'প্রবাহ অন্তঃশীলা, ওপরে বুদ্বুদ, তারই নাম ভাষা, হাসি, চাউনি।"

সুজনদের বাড়ি গিয়ে খগেনবাবু সুজনের বইয়ের সঞ্চয় দেখতে লাগলেন। নানা বিষয়ের বই। মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধনিরূপণ সংক্রান্ত বই। এ প্রসঙ্গে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে খগেনবাবু Outline of Art বইয়ের ছবি দেখতে লাগলেন, মানুষের স্বাতন্ত্র ও কল্যাণসাধন সম্পর্ক আলোচনা করলেন। (তদেব)

খগেনবাবু ও রমলাদেবীর চরিত্র-উদ্‌ঘাটনে লেখক যে পদ্ধতি নিয়েছেন তা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। সমাজ ও ব্যক্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনায় তাদের মন-মানসিকতা, রুচি, সংস্কার, বৈদগ্ধ্যের পরিচয় লেখক নিয়েছেন।

তারপর খগেনবাবুর কাশীযাত্রা। পরস্পরকে চিঠি লেখার সংকল্প নিয়ে খগেনবাবু কাশী গেলেন।

সুজন-প্রদত্ত খগেনবাবুর ডায়েরি রমলাদেবী পড়েছেন। বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী (অধ্যায় ৮) বিবরণে উদ্ধৃত হয়েছে খগেনবাবুর ডায়েরি আর ডায়েরি-পাঠিকা রমলাদেবীর প্রতিক্রিয়া। এই ডায়েরিতে ধরা দিয়েছেন খগেনবাবু, ধরা পড়েছেন ডায়েরি-পাঠিকা রমলাদেবী। স্বীকার্য, লেখক নৈপুণ্যের সঙ্গে ডায়েরি-লেখকের মন-মানসিকতা উন্মোচন করেছেন এবং তা পড়তে গিয়ে উন্মোচিত হয়েছে বমলাদেবীর মন-মানসিকতা।

খগেনবাবু কী? রমলাদেবীর মনে হয়েছে—খগেনবাবুর জীবনে অনেক বাধা পড়েছে, তা ঠেলেই তিনি এগিয়েছেন। আর সে কারণেই তিনি অনর্গল কথা বলেন। (তদেব) তবে সেই কথার ঝর্ণা হল পাগলা ঝোরা। বাধা তাঁর অন্তরে।-এ কথা ভেবেই রমলাদেবী ডায়েরি পড়া শুরু করেন।

এই ডায়েরির মধ্যে অনেকগুলি স্বপ্ন-পরম্পরা (Dream sequencc) আছে। সাবিত্রী আর রমলা! পাশাপাশি দুই নারীর তুলনা করেছেন খগেনবাবু। একেবারে অর্গলমুক্ত মনের চমৎকার উন্মোচন : "সাবিত্রী এখন আর নেই, অতএব তার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি নই। এবার যাকে ভালোবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব।"—ডায়েরি-লেখকের এই সংকল্প (তদেব) তাড়া দেয় ডায়েরি-পাঠিকাকে। রমলাদেবী সম্পর্কে খগেনবাবু তাঁর মনের কথা, অভীপ্সা, এষণা, সংকল্প লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই লেখা পড়ে রমলাদেবী আলোড়িত, বিপর্যস্ত, মথিত।

জগৎ ও জীবন নিয়ে খগেনবাবু ডায়েরিতে অনেক কথাই লিখেছেন। তা রমলাদেবী এবং পাঠককে ঝাঁকুনি দেয়। খগেনবাবু স্বপ্নে দেখলেন তাঁর সামনে অশ্রুময়ী রমলা। খগেনবাবুর হাতে প্রুস্তের বই। খগেনবাবুর স্বীকৃতি—"কালের পারম্পর্য ভেঙে নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য উপায় খুঁজে পেলাম স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে।" (তদেব)

তিন

'অন্তঃশীলা'র পরবর্তী খণ্ড 'আবর্ত'। এই উপন্যাসের সূচনায় খগেনবাবু কাশী ছেড়ে চললেন হরিদ্বার। পথে লখনউ-এ রইলেন একবেলা। তারপরই হরিদ্বার। হরিদ্বারে আশ্রমের ছোটখাট ঘটনা (আশ্রমকর্তা সাধুর উপদেশ, গৃহত্যাগিনী নিস্তারিণীর সংসারে প্রত্যাবর্তন, নিস্তারিণী ওরফে ভগিনী চন্দ্রাবলীর প্রতি ব্রহ্মচারীর আকর্ষণ) খগেনবাবুকে সামান্য ধাক্কা দিয়েছে, বিশেষ নাড়া দিতে পারেনি।

কাশীযাত্রা খগেনবাবুর আত্মানুসন্ধানে যাত্রা, সেখান থেকে হরিদ্বারে : আত্মানুসন্ধানের গভীরতর পর্বে অভিযাত্রা।

এই উপন্যাসের সূচনাংশে পর পর তিনটি অংশে নায়ককে পাঠকের দৃষ্টির সামনে লেখক তুলে ধরেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস মূলত মনোলোকের উপন্যাস, বহির্জগতের ঘটনাবলীর বিবরণ নয়। তাই ধূর্জটি-পাঠককে চরিত্রের অন্তরে যেতে হয়। সেখানে প্রবেশাধিকারের পথ দেখিয়েছেন লেখক। পাঠককে সে পথেই যেতে হবে। চরিত্রের অন্তর্কথন তার চিন্তাপ্রবাহ থেকেই আসে। 'অন্তঃশীলা'তে যা ছিল প্রবাহ মাত্র, 'আবর্ত'-এ তা হয়ে পড়ল আলোড়িত উৎসাহিত দ্রুতগামী জলরাশি, আবর্ত।

প্রথম উদ্ধৃতি খগেনবাবুর মনোলোকে উচ্চারিত। নিজের মন সম্পর্কে তাঁর ধারণা :

"তাঁর নিজের মন হরিদ্বারের পরবর্তী জাহ্নবীর মতন, ঢালু জমিতে তার বহতা। গোড়া পর্যন্ত প্রায় নৌবাহ—ভরা নৌকা, বিদ্যার সংস্কারের ধর্মবুদ্ধির সাধনার চিত্তশুদ্ধির বোঝাই করা গাধাবোট। গুণ টেনে ওপরে ওঠান হয়েছে, এবার স্রোতের টানে ভেসে আসছে, গুণ গেল ছিঁড়ে, হালে পানি পায় না, সর্বনাশ!... এই স্রোতস্বিনীতে জোয়ার আনে সমুদ্র যখন দম্ভের সহিত আপন রাজ্য বিস্তার করে। রমা কি জোয়ার আনবে? কবে?" (অধ্যায় ১)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি খগেনবাবুর একান্ত নিভৃত মনোগহনের চিন্তাঃ "সাবিত্রী কেনই বা আত্মঘাতী হল? নিশ্চয়ই মনে বুঝেছিল যে রমলাই তার জিনিস কেড়ে নেবে.... কিংবা বুঝেছিল যে তার স্বামী মনে মনে অন্যকে, রমলাকেই চায়.... বুঝেছিল ভাষার পিছনকার রক্ত দিয়ে। যখন বিষ খাচ্ছে তখনও কি একবার চুপিচুপি বলে ওঠেনি যে না, পারেনি, নিশ্চয়ই পারেনি, বেচারির গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল....রমলাদেবী, না, স্বীকার করা যাক, রমা, রমার মধ্যে পুরুষালি ভাব আছে, সে যা অনুভব করেছে তা মনের কাছে গোপন করেনি, মুখ ফুটে অন্তত নিজের কাছে বলেছে, ডেকেছে বিছানায় শুয়ে 'ওগো এস'—তাই সে সৎ, আচারে সতী, তাই সমাজ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য, নতুন সমাজ, এই মান-তোলা বাজারের দুগ্ধপোষ্য সমাজ নয়। রমলা স্বীকার করেছে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে, জেনেছে নিজের ধর্মকে, তাই তার ব্যবহার রাজকীয়, ক্লিওপ্যাট্রার মতন 'রয়্যাল'।"

হরিদ্বারের আশ্রমে খগেনবাবু জ্বরে পড়েন। আশ্রমের সাধু মহারাজের 'দাওয়াই'-এ তাঁর আস্থা নেই, শেষ পর্যন্ত অ্যালোপ্যাথ ডেকে ওষুধ খেলে তাঁর জ্বরমুক্তি। তাঁর মতে,

দল বেঁধে পূজা হয়, উপাসনা হয়, কিন্তু প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন না, ব্রোমাইড না খেলে জ্বরমুক্তি হয় না বলে তাঁর বিশ্বাস। খগেনবাবু বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিসর্বস্ব নন ; যুক্তিবাদী, যুক্তিসর্বস্ব নন। এভাবেই তিনি নিজেকে দেখতে চান।

ঈষৎপূর্বে লিখেছি, আবর্ত উপন্যাসে খগেনবাবুর গভীরতর সন্ধান—আত্মানুসন্ধান। সেই অন্বেষণের পথে চলতে গিয়ে তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন হিমালয়ের প্রতি। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে তারই সমর্থন :

"নমস্কার এই হিমালয়কে, তার গাছপালাকে, তার লতাগুল্মকে, তার শীতল নিস্তব্ধতাকে, বুদ্ধিজীবীর দাম্ভিক আধিপত্যের বাইরে থাকার, তার আত্মরমণের উপাদানে পরিণত না হওয়ার কঠিন শান্ত অপরাজেয় সাহসকে। গঙ্গার কলধ্বনি কানে আসে। গঙ্গা মানুষের অধীন। ঐ দেখা যায় লক্‌গেট। অনেকটা গঙ্গা নিচে নামল।... ভারতের সব গেছে, বাকি আছে হিমালয়, আর তার আকাশ বিশেষ করে, রাতের আকাশ, দুয়ে মিলে হিমালয় হালকা হাওয়াই তার প্রাণ, উজ্জ্বল তারাগুলোই তার চোখ, তার পাখিগুলো দেশী সুর, বাউল ভাটিয়াল কাজরীরই টান দেয়, তার রাতের মৌনতার তানপুরোর জুড়ীর আর মৃদঙ্গের আওয়াজ শোনা যায়।" (তদেব)

এই তিনটি উক্তিতে খগেনবাবু-চরিত্রকে পাঠকের সামনে লেখক উন্মোচিত করে দেন।

তৃতীয় উক্তিটি খগেনবাবু সম্পর্কে পাঠককে এক নতুন ভাবনা-স্তরে উন্নীত করে দেয়।

ত্রিলেখ উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু সম্পর্কে যত কথাই পাঠক শোনে বা পড়ে তার সঙ্গে মেলানো যায় না এই উক্তিকে। আসলে প্রত্যেক পাঠকই নিজের মতো করে চরিত্রকে আবিষ্কার করে। পাঠকের এই আবিষ্কার কোনো দুরূহ সমালোচনাকর্মের চেয়ে কম নয় : আমরা যদি এই প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি তবে মানতে হবে লেখক আমাদের সামনে পাহাড়ের অপ্রত্যাশিত বাঁক বা ঝোরার মতো, নীল আকাশে অপ্রত্যাশিত রোদ বা বৃষ্টির মতো, সবুজ উপত্যকার অপ্রত্যাশিত ফগ্-এর মতো আচ্ছাদন কখনো উপস্থাপিত করেন বা কখনো সরিয়ে দেন, আর তখনই পথিকের সামনে দেখা দেয় এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্যদৃশ্য।

আবর্ত উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলি সেইভাবে মোড় নিয়েছে। খগেনবাবু হরিদ্বারে। কাশীতে এসে পৌঁছন রমলাদেবী। সঙ্গী হয়ে এসেছেন সুজন। রমলাদেবীর জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। সুজনের সঙ্গে তিনি কাশীর ঘাটে বেড়াতে যান—এই পর্যন্ত। খগেনহীন কাশী কি রমলার মন ভরাতে পারে? কাশীর ঘাটে বসে রমলাদেবী শোনেন সানাই। প্রথমে মোটা সুর, একটানা, তারপর সুর পঞ্চম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে, সেখান থেকে সপ্তকে। খগেনবাবুর সন্ধানে রমলাদেবী। সঙ্গে সুজন। কোথায় তারা পাবে খগেনবাবুকে। সুজনের কাছে রমলাদেবীর স্বীকৃতি : 'প্রাণ আমার নেই, বড় ফাঁকা মনে হচ্ছে। সন্ধ্যায় সানাই-এর সুর বলাকা হয়ে উড়ে গেল, আধখানা চাঁদের মতন নদীর ওপারে, কাশবন ছড়িয়ে এপারের লোক কি তাকে ধরে রাখতে পারলে? ....আমার শূন্যতা জমাট বাঁধল

না. রূপ নিলে না, আমার স্মৃতি আশ্রয়হীনের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল মর্ত থেকে দেবলোকে যাবার গোলোকধাঁধায়। কিন্তু আমি প্রেতাত্মার মতন ঘুরে বেড়াতে নারাজ। আমি জন্মাতে চাই, এই দেহেই।" (অধ্যায় ২)

খগেনকে পাওয়ার জন্য রমার কামনা স্পষ্ট। ঈষৎপূর্বে রমলাদেবী সূত্রাকারে বলেছিলেন্, 'দেখা হলে, আমি তাকে নিজের করব, মানব না।' (সদ্য-ধৃত উক্তিতে (তদেব) তারই সুস্পষ্ট বিস্তার।

রমলাদেবী সুজনকে তার ভালবাসার স্পর্শমাত্র দেন। তার বেশি কিছু নয়, তাঁর সমস্ত বুকটা মুচড়ে যায় খগেনবাবুর জন্য।

প্রত্যাখ্যাত সুজন আর খগেন-উন্মুখ রমলাদেবীর রাত পোহায় কাশীর বাড়িতে। ভোর এলো। তার বর্ণনাটি কেবল চরিত্রের দিশানির্ণায়ক নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। বিশাল প্রকৃতির কাছে মানুষের লোভ ঈর্ষা আসক্তি কতো নগণ্য হয়ে যায় তার ইঙ্গিতও এখানে পাই। মুহূর্তের মধ্যে কবিপ্রকৃতি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা এখানে আবিষ্কার করি। পাঠকের কাছে এটি সানন্দ বিস্ময় ও প্রাপ্তি।

"ভোর ভৈ—সানাই বেজে ওঠে, অতি কোমল রেখাব, শুদ্ধ গান্ধারে স্থায়ী হয় না, একেবারে মধ্যমে আশ্রয় নেয় তারপর মধ্যম থেকে মীড় টেনে অতিকোমল রেখাবে অবরোহণ করে...সুরে স্থিত হতে প্রাণ চায় না, ওঠে পঞ্চমে, আবার মীড় দিয়ে অতিকোমল রেখাব...মধ্যকার গান্ধারের প্রয়োজন নেই, অথচ আছে, মধ্যম ও রেখাবের সম্বন্ধের জন্য যতটুকু। কত পরে কোমল ধৈবত, কী মধুর! যেন অতি কোমল রেখাবের দোসর...লাগল বুঝি কোমল নিখাদ.... নয়, নয়, লাগেনি, ফিরে এল মধ্যমে। ভোর ভৈ—সব ক্লান্তি অপসৃত হয় ঐ নীড়ে, স্বরের পৃথক অস্তিত্ব নেই, তার সত্তা ভৈঁরোর আশ্রয়ে। সমগ্রের কৃপায়। প্রাণ উর্ধ্বমুখী হয় পঞ্চমের পর থেকে, কোমল ধৈবতেই, তীরের মতন ছোটে শুদ্ধ নিখাদে। সবগুণের আধার এই সুর, ঋষির উদাত্ত-কণ্ঠ-নিঃসৃত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দান...জয়জয় শম্ভু বিশ্বনাথ...কাশীর মন্দিরে ভোরবেলা ভৈঁরো বাজে সানাই-এ.. " (অধ্যায় ৪)।

সুজন আর কলকাতা-আগত বিজনের সান্নিধ্যে রমলাদেবীর দিন কাটে, কিন্তু তাঁর সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে থাকে খগেনবাবুর জন্য। ইঞ্জিনিয়ার অমলের সাহচর্য, সুজন বিজনের তর্ক-প্রতর্ক, কাশীর শুকনো হাওয়া ধুলের ঝড়—কোনো কিছুই রমলাদেবীকে টানে না। অবশেষে হরিদ্বার থেকে এলেন খগেনবাবু। (অধ্যায় ৮)

হরিদ্বার-প্রত্যাগত খগেনবাবু অনেকটা বদলে গিয়েছেন। খগেনবাবু কাশীতে উঠেছিলেন তাঁর মাসিমার বাড়িতে। হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে সেখানেই উঠলেন। সংসারে এখন তাঁর একমাত্র বন্ধন বা শাসন—এই মাসিমা। ঈষৎ পরিবর্তিত খগেনবাবুকে দেখে সুজন চমকিত হল, তাঁর সঙ্গে আলাপে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই ত্রিলেখ উপন্যাস সংলাপনির্ভর। পাত্র পাত্রীর যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্যকেন্দ্রিক চিন্তা-আবর্ত এখানে পাক খায়। খগেনবাবুর কাছে সুজনের প্রত্যাশা ছিল, হরিদ্বার-প্রত্যাগত 'ধর্মাবিশ্বাসী আশ্রমাভিমুখী হিন্দু খগেন্দ্রর মুখ থেকে শুনবে সোশিয়ালিজমের জড়বাদের

বিপক্ষে কড়া মন্তব্য' (তদেব)।

এই প্রত্যাশা সংসারের প্রত্যাশা, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। খগেনবাবু যে তা নন, সেটাই এই ত্রিলেখ উপন্যাসের অন্যতম প্রতিপাদ্য। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ, বুদ্ধিবাদী, কিন্তু বুদ্ধিসর্বস্ব নন। সুজনের বারবার বিভ্রান্তি ঘটে,—কাশীতে রমলাদেবীর আগমন-সংবাদে খগেনবাবু কৌতূহলী নন; কেন? দেহের সংযম, না তাঁর মন থেকে রমলাদেবী মুছে গিয়েছে?

লেখক সাধারণ মানুষের এই বিভ্রান্তির মধ্য দিয়েই খগেনবাবু-চরিত্রকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

বস্তুত, সুজনের সঙ্গে কথালাপে খগেনবাবু-চরিত্রের মানসিকতা ও মনের কাঠামো পাঠকের অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লঘুগুরু যুক্তি ও উপমার দ্বারা খগেনবাবু সোশিয়ালিজমের মূল কথাটি সুজনকে বোঝান। (তদেব)

সুজনের বন্ধু বিজন সোশিয়ালিস্ট হয়েছে—একথা শুনে খগেনবাবুর প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।—

"আমাদের পণ্ডিতমশাই বলতেন, ভোরে উঠলেই যদি ভাল ছেলে হওয়া যেত তবে দাঁড়কাকেরা হ'ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, আর বই পড়লে যদি পণ্ডিত হওয়া যেত তবে প্রুফ-রীডারের অমন দুর্দশা কেন? সব ক'টা অভিজ্ঞতা যোগ করলেও সবসময় একটি পূর্ণ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ধরা পড়ে না। অন্য একটা কিছু চাই যার জোরে স্বমহিম হয়ে তাদের স্বরূপ ধরা দেবে। সোশিয়ালিজম মানে কেবল জড়বাদ নয়, শুধু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও নয়, মাত্র শ্রেণীবিরোধ নয়, মজুরের প্রাধান্য নয়—সব মিলে একটা।" (তদেব)।

সোশিয়ালিজম সম্পর্কে খগেনবাবুর মতামত পাঠকের কাছে জরুরি নয়, জরুরি খগেনবাবু সমকালীন দুনিয়াকে, তার চিন্তাস্রোতকে, কীভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙাগড়াকে দেখছেন। সমাজতন্ত্র, জড়বাদ, সমাজের অগ্রগতি, মানবসভ্যতার নানা বন্ধুর পথের যাত্রা, সমাজের নানা রূপ সম্পর্কে খগেনবাবুর ধারণা এখানে ব্যক্ত। আর এখানেই দেখা যায় খগেনবাবুর নিঃসঙ্গতা, সমাজের একজন হয়েও পৃথক।

তারপরই রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর সাক্ষাৎকার। (অধ্যায় ৯, 'আবর্ত')।

হরিদ্বারে আশ্রমে থেকে ও গুহা-পরিদর্শন করেও খগেনবাবু বদলাননি, তিনি যুক্তিবাদী-ই আছেন, তা রমলাদেবীর সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকেই পাঠক জানতে পারে।

এইসব টুকরো-টুকরো সংবাদ থেকে পাঠক খগেনবাবু-চরিত্র সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্টতর করে নিতে পারে। তাই এসব সংবাদ বাহুল্য নয়। রমলাদেবীর উক্তি এই ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

"বলুন না... আপনাকে বকি—বড্ড ইচ্ছে করছে বকতে আপনাকে।....আমার কথাও মধ্যে মধ্যে শুনতে হয়—কেবল মাসীমারই কথা শুনবেন চিরকাল! সাবিত্রী কেন মরেছে বুঝেছি। সে চেয়েছিল একজন পুরুষ। পেয়েছিল শিশু। স্বামীর বদলে ছেলে সব সময় ভাল লাগে কী। বুঝেছেন? বোঝেন নি। বলছি, বসুন।" (অধ্যায় ৯)

রমলার এই তরল সংলাপ খগেনবাবু সম্পর্কে তাঁর আসক্তি পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে দেয়। দু'জনের অজস্র কথালাপে এই সত্যই পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। রমলাদেবী কুর্সি ছেড়ে উঠলেন, খগেনবাবুর কপালে হাত দিলেন, খগেনবাবুর ভুরুতে আতর মাখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইবার আশ্রম থেকে নির্বাসন'। (অধ্যায় ১০)।

পাঠক অনুভব করে, দুজনে পরস্পরের প্রতি আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। মাসিমার মৃত্যুর পর দু'জনের একত্রে সহবাসে আর বাধা রইল না। এখানেই 'আবর্ত'-এর শেষ, 'মোহানা'র সূচনা। খগেনবাবুর রূপান্তর—"আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় খগেনবাবু আত্মম্ভরি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সংকল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই তার একমাত্র প্রতিকার। অন্তঃশীল প্রবাহকে বহির্মুখী না করলেই মজে যায়, অথবা আবর্তের সৃষ্টি হয়। একি হল! এতদিন সংস্কারের মূলধন ভাঙিয়ে চলল, আজ একটিও কানাকাড়ি নেই। যা বাকি ছিল সব গচ্ছিত রাখলেন, বাঁধা পড়ল রমলার হাতে।" (অধ্যায় ১২)। এটাই সত্য।

চার

'মোহানা' উপন্যাসের একটি ভূমিকা ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন, যেমন লিখেছিলেন 'অন্তঃশীলা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (সেটি আমরা লক্ষ করেছি)। 'আবর্ত'-এর কোনো ভূমিকা তিনি লেখেননি।

'মোহানা'র ভূমিকাটি এখানে উদ্ধার করি।—

"মোহানা দিয়ে আমার তিন খণ্ডের উপন্যাস শেষ হল। বইখানি লিখি প্রায় তিন বছর আগে। ১৩৪৮-৪৯ সালে 'পরিচয়ে' এটি প্রকাশিত হয়। নানা ব্যস্ততা ও অসুবিধার জন্য পুস্তকাকারে ছাপান এতদিন সম্ভব হয়নি।

প্রথম দুটি খণ্ড, 'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্তে'র সমালোচনা পড়ে মনে হয়েছিল যে তৃতীয় খণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাসও ছিল তাই। প্রধান দুটি চরিত্র তখনও পরিণত হয়নি। পরিণতির অর্থ যে উন্নতি নয় এটুকু অবশ্য জানতাম। পরিস্থিতির মধ্যে যে শক্তি গুপ্ত থাকে তাকে সুযোগ দেওয়া যেমন নেতার কাজ তেমনই লেখকেরও। বাকিটা সচেতনতা-সাপেক্ষ।

কলমের মুখে যা বেরোয় তা-ই আর্ট, এমন কথা প্রতিভার বেলায় খাটে। অন্য লোকের পক্ষে সৃষ্টির নিয়ম-কানুন জেনে বিষয়কে রূপ দেওয়ার চেষ্টাই যথেষ্ট। সে রূপ অবশ্য একরকমের নয়। বিষয় যদি ভিন্ন হয়, বদলায়, তখন তাকে সাজাবার জন্য রচনাপদ্ধতির রীতিরও পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তনের বিচার করেন সচেতন লেখক ও সমালোচক। এইখানে দুজনের মিল।

প্রুফ সংশোধনের জন্য সব খণ্ডই পড়তে হয়েছে। যাকে চিত্ত বিনোদন বলা যায়, তার মালমশলা খুব কমই পেলাম। যার সন্ধান মিলল, সেটা একটানা গোটা কয়েক চরিত্রের অভিব্যক্তি। তার মধ্যে কোথায় যেন পুরুষকার রয়েছে। স্রোতে ভাসে খড়কুটো।

খড়কুটোর সাহিত্য হবে না কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব এবং কলাবিদের হাতে সেটা রসোত্তীর্ণও হবে। কিন্তু রসের নামে জীবনের অন্তঃশীল দ্বন্দ্ব ও তার আবর্তকে, মোহানা দিয়ে তার আকুল যাতায়াতকে সঙ্কীর্ণ করা আমার মনোমতো নয়, এযুগের উপযোগী নয়।

অর্থাৎ, বইখানি ভেবে-চিন্তে লেখা। মতামত-আলোচনায় যে অধীত চিন্তা থাকে তার অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে। পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি 'পরিশ্রম' মোটেই প্রত্যাশা করি না, কিন্তু পদ্ধতি, বিষয়-সৃষ্টির রীতিনীতি ও বিষয়ানুযায়ী তার পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা চাওয়া কি অন্যায়?—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

লখনউ, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩।"

'মোহানা'র এই ভূমিকায় লেখক পাঠকের কাছে প্রত্যাশা করেছেন পদ্ধতি, বিষয়সূচি, রীতিনীতি ও বিষয়ানুযায়ী তার পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা অর্থাৎ সচেতনতা। স্বীকার্য, এ উপন্যাস পড়তে পাঠককে 'পরিশ্রম' করতে হয়, ঘুরিয়ে বলা যায়, সচেতন থাকতে হয়।

ত্রিলেখ উপন্যাসের পরিচয় দিতে গেলে বলা উচিত—'একটানা গোটা কয়েক চরিত্রের অভিব্যক্তি।' লেখকের এই দাবি সমর্থন করতেই হয়। লক্ষণীয়, তিনি চরিত্রের পরিবর্তন বলেননি, বলেছেন 'চরিত্রের অভিব্যক্তি'। আমরা তাকেই বলেছি, চরিত্রের বিবর্তন। (পশ্য পূর্ব-উল্লিখিত বর্তমান লেখকের 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।)।

রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসরচনার যে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে চেতন অবচেতন, গৌণ বহির্জীবন, সেখানে মুখ্য হয়েছে অন্তর্জীবন। তাই উপন্যাসলেখক আশ্রয় করেছেন অন্তঃসংলাপ, যা চেতনাপ্রবাহের শিল্পরূপ। এই নতুন রীতির উপন্যাসের লক্ষণসমূহ কি?

"প্রাঙনির্দিষ্ট, নিয়মিত, নিটোল, সংহত কাহিনীর জায়গায় এলো আপাত-শিথিল, কিছুটা তরল ও সংহতিবিহীন প্রবহমান দৃশ্যের অন্তরালে শিল্পসচেতন জীবনবীক্ষা। বহির্জীবনের বিক্ষোভ ও সংঘাত এড়িয়ে জীবনের অন্তঃবাস্তবতার (ইনার-রিয়ালিটি) সন্ধানে ঔপন্যাসিক তৎপর হয়ে ওঠেন, সন্ধান করেন অন্তঃসঙ্গতির ফল্গুধারা। বাহিরের 'ফর্ম'হীনতার আড়ালে বহে চলে চেতনাপ্রবাহ। ব্যবহৃত হয় অন্তঃসংলাপ, ভাববিভঙ্গের বিচিত্র রূপ, প্রতীক আর অসাধারণ চিত্রকল্প। ঔপন্যাসিক যেন সৃষ্ট চরিত্রের মনের ভিতর থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পান। সময়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত কখনো বা থেমে যায়, মনে হয় পরিচিত দেশকাল পরিবেশের সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রথাসিদ্ধ প্লটের জায়গায় দেখা দেয় অসংলগ্ন দৃশ্য নিচয়।" ('কালের প্রতিমা', ৩য় সং, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)। এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট ইংরেজি উপন্যাসের নতুন রীতির লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে একথাই লিখেছেন (E. Albert. 'A History of English Literature', pp. 522-523, London. 1963).

বাংলা উপন্যাসে এই নতুন রীতির সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর, বুদ্ধদেব বসু-ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-অন্নদাশংকর রায়-গোপাল হালদারের উপন্যাসে তা দেখা যায়।

'মোহানা'র ভূমিকায় লেখক একথাই বলেছেন এবং পাঠকের কাছে এই নব

শিল্প-সচেতনতা দাবি করেছেন।

মাসিমার মৃত্যুর পরই 'মোহানা' উপন্যাসের সূচনা। এখন রমলাদেবী হয়েছেন রমা, খগেনবাবু হয়েছেন খগেন। দু'জনে কেবল মানসিক নৈকট্য নয়, শারীরিক নৈকট্য লাভ করেছেন। লেখক দুজনের শরীরসম্ভোগের কথা খোলাখুলি লিখেছেন।

রমার মধ্যে খগেনবাবু কেবল মানসিক আশ্রয় পাননি, সেইসঙ্গে পেয়েছেন কামনার পরিতৃপ্তি, তৃষ্ণার শান্তি। কিন্তু সত্যিই কি শান্তি?

কলকাতা থেকে কাশী, কাশী থেকে হরিদ্বার, পুনরায় হরিদ্বার থেকে কাশী। এখানে এসেই খগেনবাবুর আত্মান্বেষণ শেষ হয়নি। শেষ হতে পারে না। কাশী থেকে তাঁকে যেতে হয়েছে কানপুরে। সেখানে বৃহত্তর সমাজ-প্রেক্ষিতে খগেনবাবু-চরিত্র পূর্ণতা-অন্বেষণে এগিয়েছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে লেখক লখনউ-এ যুক্তপ্রদেশ সরকারের দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন, দেখছেন শিল্পে মালিক-শ্রমিকের সংঘর্ষ, যা রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়িয়ে উপনীত হয়েছে আর্থনীতিক সমস্যাক্ষেত্রে। খগেনবাবু জড়িয়ে পড়েছেন সেই আবর্তে। এবং তার মধ্য দিয়েই তিনি চলেছেন মোহানার দিকে। রমলাদেবীর সঙ্গে মিলনে যদি ব্যক্তির সার্থকতা হয়, তবে শ্রমিকসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় পুরুষের প্রতিষ্ঠা।

মোহানা উপন্যাসে খগেনবাবুর এই চিন্তা-চেতনার স্তরান্তরের পরিচয় আছে সূচনাংশেই।

রমলা-সম্ভোগে খগেনবাবু যৌবন ফিরে পান, রমলার অকুণ্ঠ আত্মদানে জীবনের নতুন স্তর আবিষ্কৃত হয় (অধ্যায়-১)। কিন্তু তারই মধ্যে তালভঙ্গের ইঙ্গিত। 'এক ক্লান্ত প্রত্যূষে শয্যায় বাসি বেলফুলের দুর্গন্ধ নাকে আসতে খগেনবাবু উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় রমলা তাঁকে শুইয়ে দিল।' (তদেব)

খগেনবাবু ফিরে যান চিন্তাপ্রবাহে। কাশীর গলিপথে পথনির্দেশ পাওয়া যায় না। খগেনবাবু কি জীবনে পথনির্দেশ পেয়েছেন? সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দেশভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চা, মাসিমার মৃত্যুকে—মুক্তির এক একটি স্তর ভেবেছেন, পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে অন্তঃস্থ সারবস্তুর প্রত্যাশা করেছেন। বিফল হয়েছেন। খগেনবাবুর মনে হয় স্তরান্তর কেবল পেঁয়াজের কূটে সেই খোসা ছাড়ানো, আর কিছু নয়। তাই ঘনিষ্ঠ শারীরিক মিলনের মধ্যেই অপূর্ণতার অতৃপ্তি থেকে যায়, বিচ্ছেদের বীজ রোপিত হয়।

সুজন বা অক্ষয় ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবহার খগেনবাবুকে শান্তি দেয়নি। কাশী থেকে কানপুর। ইচ্ছে না থাকলেও খগেনবাবু জড়িয়ে পড়েন শ্রমিক-আন্দোলনে। তাঁর মনে প্রবাহিত হয় নতুন চিন্তাস্রোত। খগেনবাবু একটির পর একটি আশ্রয়ে উপনীত হন, তা ভেঙে যায়, নতুন আশ্রয়ে পৌঁছন, পর মুহূর্তেই তা ছেড়ে যেতে হয়। রমলার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েই চলে। রমলাও তা বুঝতে পারেন। তার চেয়ে বড় কথা, খগেনবাবুর ব্যক্তির সম্পূর্ণতায় উত্তরণ ঘটতে চলেছে।

কানপুরের নতুন বাংলোয় আসার পরই নতুন মোটরগাড়ি এল। সঙ্গে আছে বিজন। তারই টাকায় কেনা হল ট্যুরিং-কার। বিজন তার রমাদিকে নিয়ে গাড়িতে ঘোরে। আস্তে আস্তে খগেনবাবুর পথ হল অন্য পথ। কানপুরের মজদুর সংঘের কাজের সঙ্গে তিনি

জড়িয়ে পড়লেন। মার্কসবাদ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তিনি এতদিন যা পড়েছিলেন কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে এসে টের পেলেন, তা করা যায় না। সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্মধারা ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতে প্রযুক্ত নয়। লেনিনের কর্মপদ্ধতি কি সবাই বুঝেছিল, এ বিষয়ে খগেনবাবু সংশয় প্রকাশ করলেন (অধ্যায় ১০)। কানপুরে রমলা ও খগেনবাবুর পথ আলাদা হয়ে যেতে থাকে। খগেনবাবু অনুধাবন করেন তাঁরা পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছেন। রমলার সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্ভব এমন চিন্তা খগেনবাবু করতে পারলেন। (পৃ. ১৫৬)। খগেনবাবু কানপুর থেকে রাত দশটায় ট্যাক্সিতে চললেন লখনউ অভিমুখে। সঙ্গী মহবুব আর কিষণ। খুনের চার্জে ধৃত সঙ্গীদের মুক্তির চেষ্টা করতে তিনি যাচ্ছেন। পিছনে পড়ে রইল রমলাদেবী ও তার সঙ্গীরা। (অধ্যায় ১১)।

এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি। এখানেই খগেনবাবুর জীবনে নতুন পালা।

পূর্বেই লিখেছি, আবার লিখি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রিলেখ উপন্যাস ঘটনানির্ভর বিবরণাত্মক উপন্যাস নয়। এখানে ঘটনার ফ্রেমে প্রধান দুই চরিত্রের মন-মানসিকতা ধরা আছে। খগেনবাবু রমলাদেবীর অন্তর্লোকের স্তরসমূহ, চিন্তাপ্রবাহের নানা বাঁক, বাঁকের মুখে নানা অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত, চিন্তার আবর্ত, সেই আবর্তে দিশেহারা ব্যক্তিচরিত্র, চরিত্র এবং নতুন দিশাসন্ধান, সন্ধানসূত্রে আবর্ত পেরিয়ে মোহানার উদ্দেশে অভিযাত্রা—সবকিছুই ত্রিলেখ উপন্যাসে চিত্রিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ এই তিন উপন্যাসে চেতন-অবচেতনের প্রবাহে ভাসমান চরিত্রসমূহের চিন্তার পরিচয় নিয়েছেন। ব্যক্তিচরিত্রের মুক্তি কোন্ পথে? লেখক মনে করেন, মুক্তি আসবে চরিত্রের নৈর্ব্যক্তিকতায়। খগেনবাবুকে তিনি সে-পথেই যেতে দিয়েছেন। অন্তত সেটাই তাঁর শিল্প-অভিপ্রায়। ত্রিলেখের বিশদ পরিচয় নেবার প্রয়াসশেষে আমরা ত্রিলেখ সম্পর্কে উপন্যাসলেখকের বক্তব্য পেশ করতে চাই।—

"নিতান্ত concrte ভাবে আজকাল বাংলাভাষায় লেখা উচিত। রবিবাবুর প্রভাবে ভাব এত বেশী আসে যে তা থেকে দূরে থাকাই ভাল। অনেকটা হেমিংওয়ের মতন, নেহাত না হয় গ্রাহাম গ্রীন। প্রমথবাবুর সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল তা জানি।

আজকালকার আমাদের নভেলিষ্টরা রূপকে concrete করতে গিয়ে realist কিংবা natural করেছেন। ভাবের পরশ এখনও লেগে রয়েছে, তাই romantic realism। যেমন মানিক বন্দ্যো'র লেখা। আমার বিশ্বাস আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত realist নয়, concrete হওয়া।

concrete হওয়ার অর্থই হলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া। পরে ব্যক্তিসম্পর্কতা থাকে ত দেখা যাবে। আমেরিকান কবিদের অনেকেই ভীষণ নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু mood একটা থেকেই যায়। mood নিয়ে কিন্তু আরম্ভ করা অন্যায়—লেখবার সময় অন্যায়।

এইখানেই বুদ্ধির খেলা। প্রকৃতিতে বিশ্বাস অচল। বুদ্ধি দিয়েই concrete হতে হবে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—তাদের প্রধান কাজ, stream of consciousness ততটা নয়, যতটা romantic প্রভাব থেকে concrete-এ আসা। আশ্চর্য! তিন-চার জন ছাড়া

কেউ ঠিক বোঝেননি—বুঝলে সুবিধা হতো, দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক realism চায়।" ('ঝিলিমিলি')।

আলোচনা শেষ করার পূর্বে 'অন্তঃশীলা'র দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকার দুটি বাক্য পুনরুদ্ধার করি।—'একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া।' এই ত্রিলেখ উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু পরস্পরযুক্ত তিনটি উপন্যাসে আত্ম-অতিক্রমী আধুনিক মানুষ রূপে দেখা দিয়েছেন, পেতে চেয়েছেন সমগ্রতা, বুদ্ধি ও মনীষার বেদনায় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়েছেন।

এই ত্রিলেখ উপন্যাস সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য।—

"এ উপন্যাসের দার্শনিক ভূমিকা যাই হোক না কেন, গল্পটি উপাদেয় ও চরিত্রগুলি জীবন্ত। তবে উপাখ্যানের সম্পূর্ণ রস পাবেন তাঁরাই, আধুনিক পাশ্চাত্য কথাসাহিত্য যাঁদের নখদর্পণে।

কেননা কাহিনীটিতে ঘটনাবৈচিত্র্য নেই। অবস্থান-পরিকল্পনা কোনও অব্যর্থ পরিণতির ধার ধারে না। একটা সুচিন্তিত প্লটকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্যই নয়। তিনি চান দুটি চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখাতে। অর্থাৎ নভেলের সংজ্ঞা-সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ আঁদ্রে মোরায়া-র সঙ্গে একমত ; তাঁরা দু'জনেই ভাবেন যে সাবেকী দৃষ্টান্তে কতকগুলো ছাঁচে-ঢালা প্রতিমার পুতুলনাচে জীবনের অনুকরণ ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তার কর্তব্য স্বসমুখ পাত্র-পাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা ; এবং এই চেষ্টায় ধূর্জটিপ্রসাদ বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন। অবশ্য লেখকের সঙ্গে খগেনবাবুর জীবনগত সাদৃশ্য না থাক, চরিত্রগত ঐক্য যে খুব বেশী, তা পূর্বেই বলেছি ; এবং তাই হয়তো এই চিত্রের জন্য অতিপ্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু রমলাদেবীর মতো গতানুগতিক বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর ; এবং এই দিক থেকে তাকালে, বইখানিকে একেবারে বাহুল্যবর্জিত ঠেকে ; আলেখ্যের কোনও রেখা নিরুদ্দিষ্ট নয়। সকল আচরণ সার্থক; এবং চরিত্রটি সেখানে পূর্ণতায় পৌঁছেছে। সেইখানেই পুস্তকের পরিসমাপ্তি।

খগেনবাবুর ছবিও সর্বত্রই বিশ্বাস্য। ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠাভ্যাসের প্রসাদে তিনি মাঝে মাঝে হয়তো একটু ভারাক্রান্ত। কিন্তু লেখকের অন্যান্য রচনার এই চেষ্টাও এখানে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তাদের সম্বন্ধে নায়কের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা কোথাও অসামঞ্জস্য আনেনি ; এমনকি তত্ত্বসংকুল উদ্ধারগুলোও চরিত্রচিত্রণের উপাদান জুগিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর মারফত আমাদের জানিয়েছেন যে প্রুস্ত্, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ; এবং সে-খবর না পেলেও, তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটত না। তথাচ 'অন্তঃশীলা' বাংলা উপন্যাস; এবং বাঙালিদের মধ্যে একা ধূর্জটিপ্রসাদই বোধহয় এই উপন্যাসপ্রণয়নে সক্ষম। আসলে অর্জিত বিদ্যায় তিনি যদিও বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বিশুদ্ধ স্বদেশি; এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বটে। কিন্তু তিনি যে স্বভাবতই

বিশ্লেষণ-বুদ্ধির অনুর্বর মার্গের প্রতিকূল, তার ভূরি প্রমাণ 'অন্তঃশীলা'-র প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। সেইজন্যে আধুনিক কাল তাঁর কথাকলির প্রশস্তি গেয়েই থামবে ; তাঁর মতো দুনৌকায় পা রেখে উভয়সংকট পেরিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়।" ['বিচিত্রা' আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যায় 'ধূর্জটিপ্রসাদ ও অধিকারভেদ' শিরোনামে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। তাঁর 'স্বগত' (১৩৪৫) প্রবন্ধ সংকলনে এবং পরবর্তীকালে 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৩৬৪) গ্রন্থে প্রবন্ধটি 'অন্তঃশীলা' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০০২/দে'জ) পরিশিষ্ট-১ (গ্রন্থ-পরিচয়) : অংশে গৃহীত।]

স্বীকার্য, বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা-র স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

গোপাল হালদারের ট্রিলজি

গোপাল হালদার (১১.২.১৯০২ - ৩.১০.১৯৯৩) যে জীবন কাটিয়েছেন তা বহুমাত্রিক। তিনি ব্যবহারজীবী, অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বের গবেষক, সাংবাদিক, বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদনাকর্মে অভিজ্ঞ, ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ার' ও সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সহ-সম্পাদক, বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের কর্মী, অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত কংগ্রেসকর্মী, সুভাষচন্দ্রের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মী-পরিষদের অন্যতম সহ-সম্পাদক, সারা ভারত কৃষক সভার অন্যতম সংগঠক, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (১৯৪১ থেকে), ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের সদস্য, কলকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সদস্য, মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক, 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য (১৯৫২-৫৮), পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৫৭-৬৮), প্রেসিডেন্সি জেলে ও বক্সা কারায় রাজবন্দী, কিছুদিন গৃহে অন্তরিন, এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য, তিন বছর ওই সোসাইটির সহ-সভাপতি। দেশে ও বিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ভাষণদান। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত সাহিত্য ও কলা শাখার 'ফেলো', বহু পুরস্কার-নির্বাচক সমিতির সদস্য, দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কার অর্জন, বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ, পশ্চিমবঙ্গের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত।

তিনি বন্দিজীবনে পড়েছেন ও লিখেছেন প্রচুর। বস্তুত অধ্যয়ন, গবেষণা, সাহিত্যসৃষ্টি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশেষ করে মার্কসীয় মতাদর্শের চর্চা করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'ইস্টবেঙ্গল ডায়ালেক্ট্' গবেষণা, 'একদা' উপন্যাস ও অন্যান্য উপন্যাস, ব্যক্তিক 'পার্সোনাল এসে' ('বাজে লেখা') ১৯৩৩-৩৬ সালে বন্দিজীবনে লেখেন। তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারায়ণের কূলে' (প্রথম খণ্ড ১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৮)। দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্য তিনি 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' অর্জন করেন।

ইংরেজি ও বাংলায় গোপাল হালদার লিখেছেন প্রচুর। সাংবাদিকতা ও পত্রিকা সম্পাদনা ক্ষেত্রে তাঁকে অজস্র ইংরেজি বাংলা নিবন্ধ লিখতে হয়েছে। তিনি গল্প, উপন্যাস, কবিতা লিখেছেন। তার তালিকা দিয়েছেন শ্রীঅমিয় ধর (এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রকাশিত গোপাল হালদার রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ ১৯৮৯, ২য় সং ২০০০ -এর শেষভাগে)। তা থেকে জানা যায় গোপাল হালদার লিখেছেন বারোটি উপন্যাস। তার মধ্যে প্রধান তিনটি উপন্যাস—'ত্রিদিবা' ট্রিলজি : 'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন'

(১৯৫০), 'আর একদিন' (১৯৫১)। আরও একটি ট্রিলজি তিনি লিখেছেন : 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), তেরশ পঞ্চাশ (১৯৪৫), 'উনপঞ্চাশী' (১৯৪৬)। এবং আর-একটি উপন্যাস-ধারা, ছয়টি উপন্যাসের সমাহার : 'ভূমিকা', 'নবগঙ্গা', 'জোয়ারের বেলা', 'ভাঙন' (বা 'ভাঙনীকূল'), 'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা'—একসঙ্গে 'ভদ্রাসন' নামে গ্রথিত।

গোপাল হালদার বিংশ শতাব্দের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম প্রধান রূপে এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১), 'বাঙালি সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), আর 'বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬)—এই তিনখানি গ্রন্থে গোপাল হালদার বাংলা ও বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে প্রসারিত বাঙালি সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরকে প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

গোপাল হালদার সম্পর্কে এই প্রাথমিক পরিচয় থেকে আমরা অনুধাবন করি, তিনি নিছক সাহিত্যিক নন। তাঁর বহুদূর প্রসারিত জীবনজিজ্ঞাসা ও দেশ-কালের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের পটভূমিতেই তাঁর সাহিত্য-চর্চাকে দেখতে হয়। উপরি-ধৃত ভূমিকা থেকে পাঠক 'ত্রিদিবা' ট্রিলজি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারেন।

'গোপাল হালদার রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ডে বিধৃত হয়েছে 'ত্রিদিবা' নামধারী ট্রিলজি। এই খণ্ডে প্রকাশিত ট্রিলজিই তিনটি উপন্যাসের প্রামাণ্য রূপ বলে লেখক দাবি করেছেন 'নিবেদন'-এ (১ জানুয়ারি ১৯৮৯)। তাঁর কথায়—"প্রথমত 'একদা' যখন আমি লিখতে আরম্ভ করি কোনো বড় পরিকল্পনা তখন আমার ছিল না। বন্দিদশায় পীড়িত অবস্থায় ভাবছিলাম মারাত্মক কিছু ঘটবার আগে আমার অভিজ্ঞতার কিছু চিহ্ন রেখে যাই—অন্তত একটি দিনের কথা। সেই একটি দিনের কথাই ক্রমে. আমার পরিকল্পনা না থাকলেও, একটি নাতিবৃহৎ উপন্যাস হয়ে ওঠে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অন্যদিন' ও তৃতীয় গ্রন্থ 'আর একদিন'-এর কথা আমার ভাবনায় তখনও ছিল না,—কারণ সে প্রসঙ্গ দুটি তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। প্রায় ছয় বৎসর ছিল 'একদা'-র সঙ্গে 'অন্যদিন'-এর ঘটনাকালের তফাৎ এবং আরো দশ বৎসর ছিল 'অন্যদিন'-এর ঘটনাকালের সঙ্গে 'আর-একদিন'-এর ঘটনাকালের দূরত্ব। 'আর একদিন' রচনা করার আগেই তিনটির প্রসঙ্গ সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ ট্রিলজিতে পরিণত করার আইডিয়া আমার মাথায় আসে। তার স্থির প্রকাশ ঘটে 'ত্রিদিবা' নামীয় গ্রন্থে। ফলে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ এবার পূর্বেকার ভেদরেখা মুছে ফেলে, কাহিনির ধারাগত অসামঞ্জস্য অপসারিত করে একত্রিত হয়ে উঠল।... এখন পর্যন্ত বলতে পারি এই খণ্ডের পাঠই আমার অভিপ্রেত ও প্রামাণিক। আশা করি পাঠক সাধারণ 'ত্রিদিবা'র গ্রন্থাবলী সংস্করণকে এভাবেই গ্রহণ করবেন।"

লেখকের এই বক্তব্য থেকে আমরা জেনে যাই 'একদা' রচনা ও প্রকাশকালে ট্রিলজির সম্ভাবনা ছিল না। তা পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছে এবং লেখক 'ত্রিদিবা' শীর্ষক ট্রিলজি ছাপার পূর্বে তাতে "যথাসম্ভব...অসামঞ্জস্য, ভুল-ত্রুটি দূর করবার প্রয়াস" পেয়েছেন, "কোথাও অল্প-সল্প বাদ দিয়ে, কোথাও-বা দু-চার পঙ্ক্তি যোগ করে।"

এভাবেই 'ত্রিদিবা' ট্রিলজি শিল্পগত ঐক্যে বিধৃত হতে পেরেছে। 'ত্রিদিবা'র আলোচনাকালে

আমরা কখনই ভুলতে পারিনা, লেখক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একাধিক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'ত্রিদিবা' ট্রিলজির নায়ক অমিত। তার সঙ্গে লেখকের মিল যতটা, ফারাক ততটাই। লেখকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা 'ত্রিদিবা'র পরতে পরতে মিশে আছে, কিন্তু অমিতের জীবনচর্যা ও চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ রূপেই লেখকের, এমন মনে করা উচিত হবে না। 'ত্রিদিবা' যেমন তিন যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, অমিত ও তার সঙ্গীরা তেমনি তার সঙ্গে জড়িত। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, মধ্যবিত্তের আন্দোলনের নানা পর্যায়ের সঙ্গে লেখক জড়িত ছিলেন, তা নিবন্ধের সূচনায় আমরা অনুধাবন করেছি। সেইসব অভিজ্ঞতা লেখক অমিতকে দিয়েছেন, কিন্তু অমিতের স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করেননি। অমিতের জীবনচর্যায় যে-সব চিন্তাতরঙ্গ উঠে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকেই আহৃত। এই ট্রিলজির মুখ্য চরিত্র অমিত। কালগত ব্যবধান রেখেই রচিত হয়েছে তিনটি উপন্যাস—'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'। এক একটি দিনের (চব্বিশ ঘণ্টার) মধ্যে অমিতের মনে যে সহস্র চিন্তাতরঙ্গ উঠেছে, পড়েছে, আবার উঠেছে, তার অন্তর্বয়ন হয়েছে এই উপন্যাসে। এবং তার জন্য লেখক মূলত ফ্ল্যাশ-ব্যাক-এর সাহায্য নিয়েছেন। সর্বোপরি একথা স্মর্তব্য যে, লেখক অমিতকে তার চিন্তাস্রোতে ভেসে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। একটি দিনে প্রবাহিত চিন্তাস্রোতের তরঙ্গ-শীর্ষে উঠে এসেছে নির্বাচিত ঘটনা ও চরিত্র। তা অবশ্যই অমিতের নিজস্ব নির্বাচন নয়, চিন্তাস্রোতই তাকে চালনা করেছে। এর থেকেই আমরা অনুধাবন করি, 'ত্রিদিবা' অমিতের নিজস্ব অন্তর্ভাবনার মালা। কতো ঘটনা, কতো চরিত্র দূর অতীত, সদ্য অতীত ও বর্তমান থেকে উঠে এসেছে অমিতের চিত্তলোকে এবং তা-ই কলমের মুখে ভাষারূপ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসের অমিত রায়ের সঙ্গে 'ত্রিদিবা'র অমিতের আদৌ কোনো মিল নেই, এবং সেই মিল সন্ধান করা আদৌ পাঠকের কর্তব্য নয়। 'ত্রিদিবা'র অমিত ইতিহাসের ছাত্র, সে জানে মানুষ কীভাবে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার পরিবেশকে প্রভাবিত করে। তার সঙ্গী সাথী বন্ধু কমরেড, পারিবারিক সম্পর্কে আত্মীয় এবং অনাত্মীয় হয়েও যারা তার মনোলোকের অন্তর্ভুক্ত,—সবাই অমিতকে প্রভাবিত করেছে। অমিতের জেলে যাওয়া, জেল থেকে ছাড়া পাওয়া, পুনর্বার জেলে যাওয়া (পরাধীন ও স্বাধীন—উভয় ভারতেই)—অমিতের জীবনযাত্রাকে মাঝেমাঝে উলট-পালট করে দিয়েছে। প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দি অমিত, বন্দিদশা থেকে মুক্ত অমিত, লর্ড সিনহা রোডে আই. বি. আপিসে দশ ঘণ্টা অস্নাত-অভুক্ত অমিত ও তার কমরেডরা, সেখান থেকে ফের জেলে পৌঁছনো—এর ঘটনা-বিবরণ 'ত্রিদিবা' উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে অমিতের অন্তর্লোকের চিন্তা।

আর একটি কথা 'ত্রিদিবা'র বিশদ আলোচনায় যাবার পূর্বে স্মর্তব্য, গোপাল হালদার 'সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' (১৯৭৮) নামে একটি বই লিখেছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে, আমরা জানি, অন্তর্লোকেরই প্রাধান্য। গোপাল হালদার অবশ্যই তা লক্ষ করেছিলেন। জেমস জয়েস ('Ulysses'), ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (Mrs. Dalloway',

1925 'The Waves' 1931), মার্সেল প্রুস্ত ('হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে', 'A la recherche du temps perdu' ও 'Du cote de chez Swann' 1913) ('Remembrance of things Past') প্রমুখের উপন্যাসে যে নবযুগের প্রবর্তনা হয়েছিল ইংরেজি ও ফরাসি উপন্যাসে, তা সম্যক অবহিত ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ডাবলিন শহরে একটি যুবকের চব্বিশ ঘণ্টার অন্তর্চিন্তা 'ইউলিসিস' (১৯২২) উপন্যাসের মূল আশ্রয়। 'ত্রিদিবা' ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'একদা'। জেমস জয়েসের উপন্যাসের নায়কের মতোই 'একদা' উপন্যাসে কলকাতা শহরে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কালসীমায় নায়ক অমিতের আত্মচিন্তা অন্তর্চিন্তা (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৮ অগ্রহায়ণ)—এই একটি দিনের কাল-পরিধিতে বিধৃত। জেমস জয়েস বা মার্সেল প্রুস্ত-এর উপন্যাসের মতোই 'একদা'য় পূর্বস্মৃতি রোমন্থন ও আলোচনায় দূর ও নিকট অতীতের ঘটনার রোমন্থন করেছে নায়ক এবং সেখানে কলকাতা শহরেই তা সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা বঙ্গের গ্রামেগঞ্জে, দার্জিলিঙে বিধৃত হয়েছে। এবং পূর্বেই বলেছি, অন্তর্চিন্তা তথা অন্তর্বয়নমূলক উপন্যাসের একটি সংহত কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত থেকে ফ্ল্যাশ-ব্যাক-এ (flash-back) দেশ ও কালের সম্প্রসারণ হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী'তে তা করেছেন, 'একদা' উপন্যাসে গোপাল হালদার তা করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রসঙ্গে গোপাল হালদার লিখেছিলেন, "তাঁর commitment ছিল....। তবে তা ছোট commitment নয়, বড় commitment, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে এবং শিল্পের কাছে। সতীনাথের সেই commitment অথবা সেই commitment বরাবর সত্তার কাছে, ছোট আমি ছাড়িয়ে বড় আমির কাছে।"

'একদা' উপন্যাসের নায়ক অমিতও ছোট আমি ছাড়িয়ে বড় আমির কাছে পৌঁছতে চেয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হয়, জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসে স্টিফেন ডেডলাস ১৯০৪ সালের ১৬ জুন—একটি দিনে একটি শহরের (ডাবলিন) গোটা জীবনকে তুলে এনেছিল, এবং তা করতে গিয়ে বারবার ফিরে যাচ্ছিল অতীতে। কিন্তু অমিত অতীতে ফিরে যায় না, বরং তার অতীত যেতে চায় ভবিষ্যতের দিকে। ১৯৩০ সালের একটি গোটা দিন-রাতের চিন্তা 'একদা' উপন্যাসে শেষ হয় ভোররাতে যখন পুলিশের সবুট পদধ্বনি অমিতের বাড়ির বন্ধ দুয়ারে এসে থামে। এই উপন্যাসে অমিত অতীতের চিন্তা করে ঠিকই, কিন্তু সেখান থেকে সে এগিয়ে যেতে চায় ভবিষ্যতের দিকে—"বিপ্লবের পবে আবার বোধন, আবার নতুন কালের নতুন বিরোধ, নতুন সমন্বয়। দিনের পর দিন—যুগের পর যুগ।" এভাবেই অমিত এগিয়ে যায়—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে।

দুই

" 'ত্রিদিবা'র প্রথম পর্ব 'একদা'। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দী থাকাকালে সাতদিনে লিখে শেষ করেন, প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এই উপন্যাসের কাহিনি ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের (অগ্রহায়ণ) একটি দিন। ...চৈতন্যস্রোতের আধুনিক রীতিকে

আশ্রয় করে গোপাল হালদার তাঁর 'একদা' উপন্যাসে বৈপ্লবিক জীবন-জিজ্ঞাসার যে সংশয়ক্ষুব্ধ মানবিক শ্রী ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলা কথাহিত্যে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ।" (গোপাল হালদার রচনাসমগ্র। ১। পরিশিষ্ট। পৃ. ৫৭৪।—শ্রীঅমিয় ধর)

গোপাল হালদারের প্রথম উপন্যাস 'একদা'। প্রথম উপন্যাসেই লেখক যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা অবশ্যস্বীকার্য।

উপন্যাসের সূচনাংশ :

"আটাশে অগ্রহায়ণ, তেরশো সাঁইত্রিশ সাল। মহাকালের পথের উপরে, সমকালের যাত্রাপথের ধারে, সবে একটি দিনের বাতায়ন খুলিয়া গেল।

শীত বেশ পড়িয়াছে—কলিকাতাতেও তাহা টের পাওয়া যায়। দিনের বেলা শহরের উপর কালো ধোঁয়ার ভার জমিয়া থাকে, সন্ধ্যা না হইতেই মাথার উপরকার ধোঁয়ার জটা শহরের বুকের উপর ছড়াইয়া পড়ে। পাতলা কুয়াশার বসন তখন মাথায় তুলিয়া দিয়া আজব শহর কলিকাতা পথ-ঘাট, পার্ক-ময়দান, গাড়ি-বাড়ি সকলের উপর সেই সাদা আঁচল বিছাইয়া দেয়।"

এভাবেই উপন্যাসের সূচনা হয়। এই উপন্যাস আধুনিক উপন্যাস। লেখক ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। তিনি ইংরেজি ও ফরাসি উপন্যাস (জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, মার্সেল প্রুস্ত) পড়েছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। এ উপন্যাস আদৌ ঘটনানির্ভর নয়, মননপ্রধান, চেতনাবাহী, স্মৃতিবাহী। এ উপন্যাস পড়তে গিয়ে অনিবার্য মনে পড়ে জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ও মার্সেল প্রুস্ত-এর পূর্বে উল্লিখিত উপন্যাসসমূহ।

ঘটনা বিশেষ কিছু নয়। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে এক সকালে ট্রিলজি-উপন্যাসের নায়ক অমিত সকালে বাড়ি েকে বেরিয়ে পড়ে পলাতক বিপ্লবী সুনীলের গোপন আস্তানায় অল্প কিছু টাকা পৌঁছে দেবার জন্যে। এই সুনীল ও তার সহযাত্রীদের গোপন সন্ত্রাসবাদে অমিতের কিছুমাত্র আস্থা নেই, শ্রদ্ধাও নেই। তথাপি অর্থ-প্রত্যাশী সুনীলকে সাহায্য করার দায়িত্ব সে এড়িয়ে যায় না। এখান থেকেই 'একদা' উপন্যাসের পথ চলা শুরু, নায়ক অমিতেরও চিন্তাপ্রবাহের সূত্রপাত।

সারাদিন—এক সকাল থেকে পরদিন ভোররাত—চব্বিশ ঘণ্টায় অমিতের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে লেখক পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

গোপন সন্ত্রাসের পথিক সুনীলের মতবাদ অমিত মানে না।

তবে সে কি মানে? কোন্ বিশ্বাসে সে প্রাণিত? তার কাছে জীবনের অর্থ কী?

সে প্রশ্নের উত্তর 'একদা' উপন্যাসে পাই। অমিত ভালোবাসে জীবনকে। "জীবনরসের পিপাসা তাহার প্রাণে অশেষ, অনির্বাণ, অতলস্পর্শী।" (রচনাসমগ্র ১। পৃ. ১৮১) অমিত জীবনের উপরিভাগে মানস-পরিভ্রমণ করে না, বরং সে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত। বলা যায়, আত্ম-জিজ্ঞাসায় অস্থির অমিত।

উপন্যাসের সূচনাতেই বাড়ি থেকে পথে নামার মুহূর্তে অমিত তাকে লেখা বন্ধু সুহৃদের চিঠি পায়—সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ লিপি। তারপরই অমিতের চিন্তাপ্রবাহে ভেসে ওঠে তার জীবন-জিজ্ঞাসা।

"সিনেমা মন্দ নয়, এক সময় অমিতেরও অপছন্দ ছিল না। কিন্তু সব আমোদেরই সময় আছে। এখন তো আর সিনেমায় ঘুরিবার সময় না। এই সুখ, আমোদ, স্ফূর্তি—এইসব লইয়া তাহার জীবন গড়াইয়া চলিয়াছে। এতদিন এই সব নিশ্চিন্ত বিলাসিতাতেই ছিল তাহারও আনন্দ। কিন্তু বড়ই হাল্কা, বড়ই লঘু, বড়ই অসার—এই বিলাসিতা। ইহাই কি শুধু জীবন? এ-ই মানুষের প্রাণলীলা? ... এই কি শুধু জীবন?" (তদেব, পৃ. ১২)

অমিত পথ চলে, তার মনও চলে। অবিরাম চিন্তাস্রোত তার মনকে ভরে তোলে। সুহৃদ ও তার স্ত্রী সুধীরা, প্রাক্তন সহপাঠী শৈলেন—তাদের সঙ্গ আজ অমিতের কাছে স্পৃহনীয় নয়। "আজ ১৯৩১-এর ডিসেম্বর। সেনেট হাউসের সম্মুখে ছয় বৎসর পূর্বে যে কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে শৈলেন হারাইয়া গিয়াছে—সে অমিত নাই। এমনই জীবন ... ইহাই নিয়ম। কিন্তু ইহাই কি নিয়ম? অমিতের তখনও বিশ্বাস হয় না, ইহাই নিয়ম—এমনই জীবন।" (তদেব, পৃ. ২২)

সুনীলের সঙ্গে দেখা করে টাকা পৌঁছে দিয়ে অমিত ফের পথে নামে। অমিত রাজনৈতিক চরিত্র। সে জনযুদ্ধের রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

অমিত জীবনকে ভালোবাসে। 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের' গ্লানিময় জীবনের স্থূলতা তার অসহ্য। জীবনের পরম সত্যকে সে পেতে চায়। কোন্ পথে তাকে পাবে?

অমিত জানে "জীবনের মানে আরও বেশি—সে শুধু দিন গাঁথিয়াই শেষ হয় না।... সে চাহে বিকাশ... বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান ইট্যারনিটি—ইন্ ইন্টেন্স লিভিং।" (তদেব, পৃ. ১২২)

শেষ কথাটি বারবার অমিতের মনে ভেসে ওঠে—ইন্টেন্স লিভিং-এ জীবনের সার্থকতা। তার মনে হয় সে জীবনের পথে সত্যান্বেষী। এটাই তার আসল পরিচয়।

অমিতের জীবনবোধ কী, এ প্রশ্নের উত্তর তার স্বগত চিন্তাস্রোতে ভেসে উঠেছে। অন্তর্কথনের মাধ্যমে লেখক তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তার সারাদিনের চলাফেরায়, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতে, নানা চরিত্রের সঙ্গে আলাপের স্মৃতিচারণায়।

সুকিয়া স্ট্রিটে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র রায়ের বাড়িতে সে পৌঁছে গেল। ব্রজেন্দ্রবাবুর আহ্বানেই সে এসেছে। ব্রজেন্দ্রবাবু এই ১৯৩১ সালে (রবীন্দ্র জয়ন্তী-বৎসরে) বাংলা জ্ঞানচর্চার খোঁজ নিয়ে হতাশ হয়েছেন। নলিনীকান্ত গুপ্তের রচনায় চিন্তার কুয়াশা। সুনীতি চাটুজ্জের লেখায় অজস্র ডিটেইলস্—গাছ চিনতে চিনতে বনের রূপ আর চোখে পড়ে না। তবু কিছুটা স্বচ্ছতা আছে অতুল গুপ্তের কাব্যালোচনায়। সমকালের সৃষ্টিশীল বাংলা সাহিত্য তাঁকে হতাশ করে। ব্রজেন্দ্রবাবু 'মডার্ন এজ'কে যেভাবে দেখেন, অমিত তা দেখে। সে ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানায়—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা পড়তে গিয়ে নৃতত্ত্বের ধারা খুঁজতে গিয়ে সে বুঝেছে, "মানুষের সভতাকে ঠিক চিনতে হলে চিনতে হয় তার বাস্তব ভিত্তি দিয়ে—যার ওপর মানস-ভিত্তি গড়া হয়, যে স্ট্রাক্চার-এর ওপর ওঠে শিল্প-সাহিত্যের সুপার স্ট্রাকচার, বেদীর ওপর ওঠে বিগ্রহ। এ বাস্তব ভিত্তিটা জীবিকায়োজন দিয়ে তৈরি, উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে গড়া। পাথর, তামা, লোহা, তারপর গোচারণ, কৃষি;—এমনই

করে সভ্যতা সামন্তযুগ ছাড়িয়ে এল আজ যন্ত্রবাহিত ধনিক যুগে। আমাদের দেশে সেই মডার্ন এজ, যন্ত্রযুগ দেখা দিয়েছে (প্রথম) মহাযুদ্ধের শেষে।.... পৃথিবী গিয়েছে এগিয়ে বণিকযুগের শেষ পাদে, তার ধাক্কা আমরাও পাচ্ছি।" (তদেব, পৃ. ১০১)

ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে অমিত সমানে তর্ক করেছে। ব্রজেন্দ্রবাবু যখন বলেন, 'কর্মই তো শেষ কথা নয়; কর্ম সভ্যতার গঠনভঙ্গির একটি খণ্ড মাত্র।' তখন অমিত বলে—'এযুগে চিন্তার খোঁজ করবেন না। চিন্তা আমাদের সেকেন্ড বেস্ট সাব্‌স্টিটিউট্। ইট ইজ অ্যান এজ অব অ্যাকশন। আপনি কর্মের মধ্য দিয়েই এই যুগের নৈতিক আধ্যাত্মিক রূপের সন্ধান করুন।' (তদেব, পৃ. ১০৫)

ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তর্ক করতে করতে অমিতের মনে হয়েছে, তার জীবনবোধ কী, তা সে স্পষ্ট করে তাঁকে বোঝাতে পারছে না। তবে সে অন্তর্কথনের মধ্যে সম্বিৎপ্রবাহের মধ্যে তা উপলব্ধি করেছে। লেখক সেই সম্বিৎপ্রবাহের মধ্য থেকে অমিতের অন্তর্কথনকে তুলে এনেছেন। এখানেই 'একদা' উপন্যাস চিন্তা ও মননের উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

অমিতের সেই অন্তর্কথনের মূল বক্তব্য লেখক তুলে ধরেছেন : "একদিন অমিতও এমনই একটা মানদণ্ডের সন্ধান করিতেছিল—কর্মে, চিন্তায়, জ্ঞানে, শিল্পে, জীবনের সর্বত্র, একটা মূল্য খুঁজিতেছিল—সত্যকারের মূল্যজ্ঞান আয়ত্ত করিতেছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না—শিল্প, সাহিত্য, পাণ্ডিত্য এই সবের নামে কিছুতেই তাহার সত্তা ঢাকা পড়িল না, নিজ সত্তার দাবি ও বিরাটত্বের দাবিকে একটি সমন্বয়ে আনিয়া পৌছাইতে পারিল না। কেন তাহা পারিল না?" (তদেব, পৃ. ১০৬)

অমিতের এই মূল্যজ্ঞান (ভ্যালুজ)-সন্ধান আধুনিক মানুষের আত্মসন্ধান। 'একদা' উপন্যাসে এই সন্ধানই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে প্লটপ্রধান ঘটনাপ্রধান কাহিনি অন্বেষণ বৃথা। আমরা যদি তা অন্বেষণ করি, তবে আমরা ব্যর্থ হবো।

অমিতের আত্ম-সমীক্ষা, আত্মবিচার আধুনিক মানুষের আত্মবিচার। তাই তার আত্ম-অন্বেষণ 'একদা' উপন্যাসে প্রাধান্য পায় : "সে আত্মসর্বস্ব নয়, তাহার সত্তা নিজেকে চিনিয়াছে, চিনিয়াছে বলিয়াই তো সে নিজেকে কালের সহিত, কাজের সহিত, মিলাইয়া লইতে চায়। এতটুকু জানিয়াছে বলিয়াই সে জানে, নির্বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বলিয়া কিছুই নাই। ইতিহাসের ছাত্র সে, সে এই কথা বেশ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। ব্যক্তিবাদ আসলে মানুষের 'ছোট আমি'র পূজা, যে 'আমি' সংসারের ভয়ে, জীবিকার ভয়ে, গুরুর ভয়ে ছোট হইয়া নিজের ছোটত্ব মানিয়া লয়। status quo মানিয়া চলে। এই ভয় দূরে ঠেলিয়া ফেলিলে দেখিবে, যেখানে সত্তার সত্যকার প্রকাশ, সেখানে সত্তার অনন্ত বিরাট রূপ। শ্রেণিবৈষম্য পীড়িত এই ব্যবস্থা শেষ না হইতে মানব-সত্তা সেই বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করিতেই পারে না—সমাজকে পঙ্গু করিয়া নিজেরও সেই সুস্থ সম্ভাবনাকেই সে অস্বীকার করে।.... 'একান্ত নিজস্বতা'র অর্থ কি একেরই স্বার্থরক্ষা? বন্ধ ঘরে বসিয়া অভিজাত সাহিত্য লেখা বা নির্বাণোন্মুখ উল্কার দিকে তাকাইয়া থাকা? না, না, এই সাব-নরম্যাল, অ্যারেস্টেড্ গ্রোথ-কে সত্তার প্রকাশ বলা চলে না। সে প্রকাশে ঘরের দুয়ার-জানালা খুলিয়া যায়, হয়তো ছাদ ফাটিয়া পড়ে, তাহা ভেদ করিয়া আকাশ ছুঁইয়া খাড়া হয় বিরাট

সত্তা—জগতের কোণে কোণে তাহার দৃষ্টি, উল্কার আলোতে তাহার মাথায় আশীর্বাদ করে—বিশ্বব্যাপী বেদনার পৌরুষময় অনুভূতিতে তাহার করুণা উছলিয়া উঠে—এ করুণা 'দি ডীপ ওভারফ্লাইং লাভ্ দ্যাট ইজ দি ব্রেস্ট অব গড্'—জগৎ-জোড়া। সেই করুণার প্লাবন। তাহাই আছড়াইয়া পড়ে তাহার বুকে। যেখানে তাহার সত্তার পূর্ণতা, সেখানে সে এমনই 'বড় আমি'—আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম। আর তাই বিশ্বাত্ম। ইহাই অমিতের জীবনবোধ।" (তদেব, পৃ. ১০৭)

'একদা' ও পরবর্তী দুটি উপন্যাসে অমিতের এই জীবনবোধ নানাভাবে প্রকাশ পেতে চেয়েছে। এই বক্তব্য অমিত স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। তাই সকলে তাকে ভুল বুঝে। অন্যেরা মনে করে, অমিত ক্ষণিক নেশায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নিজের সত্তাকে বিস্মৃত হয়েছে।

এখানে 'ছোট আমি' আর 'বড় আমি'—দুয়েরই উল্লেখ আছে। লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন অমিতের 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'-তে উত্তরণ-প্রয়াস। সে কারণে এ ট্রিলজি-উপন্যাসকে কেবল রাজনৈতিক উপন্যাস না বলে, মননপ্রধান দর্শন-প্রধান উপন্যাস বলা যেতে পারে।

অমিত অথবা তার সৃষ্টিকর্তা লেখক কি এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন?—এই প্রশ্ন পাঠক মনে উঠতে পারে এই উপন্যাসত্রয়ী পাঠে।

এখানে অনিবার্য মনে পড়ে ১৯৩১ সালে অক্স্ফোর্ডে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 'Religion of Man' শীর্ষক হিবার্ট-ভাষণ। সেই ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন,

'The individual man must exist for Man the great... on the surface of our being we have the everchanging phases of the individual self, but in the depth there dwells the Eternal Spirit of human unity beyond our direct knowledge.'

এখানে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ছোট-আমি থেকে বড় আমি-তে নিরন্তর উত্তরণের প্রয়াসের কথাই বলেছেন, আত্ম-পরিচয় সন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলেছেন, ইঙ্গিত করেছেন সেখানেই মানুষ সমস্ত বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তি-স্বার্থকে জয় করে বিশ্বমানবের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়। অমিত কি এইকথাই এখানে বলে নি? এটাই কি অমিতের জীবনবোধ নয়?

'একদা' উপন্যাসে অমিত ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রামে চড়ে পৌঁছে যায় ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজার। সেখান থেকে যুগলের বাড়ি। যুগলকে নিয়ে সে রাত দশটায় পৌঁছে যায় খিদিরপুরের ট্রামলাইনের ধারে। সেখানেই সুনীল অপেক্ষা করবে। যুগলের বাড়িতে পলাতক বিপ্লবী সুনীল আশ্রয় নেবে। তাকে যে অনবরত আশ্রয় বদলাতে হয় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ব্যর্থ করে দিতে। ইন্দ্রাণী, সবিতা—এদের কথা 'একদা' উপন্যাসে এসেছে। একদা ইন্দ্রাণী তাকে চেয়েছিল, হয়তো আজও চায়। একদিন সবিতার সঙ্গে বিবাহের কথা হয়েছিল, অমিত নিজেই সে প্রস্তাব থেকে সরে এসেছিল। আজ শীতের রাতে খিদিরপুরে ট্রামলাইনের ধারে দাঁড়িয়ে অমিতের মনে হয়—time is out

of joint. একটা 'জেনারেশন'কে বলি না দিলে তারা পাবে না কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, সেইসঙ্গে অমিতের মনের মধ্যে এসে পড়ে ইন্দ্রাণী। আজ কোথায় সে? বিবাহ-ভঙ্গ ইন্দ্রাণীর জীবনে আছে একটি ছোট পুত্র। সেখানে অমিতের স্থান কোথায়? বোধহয় শেষ বাসে অমিত বাড়ি ফেরে। অপেক্ষা করে আছেন তার মা। খাওয়ার পর অমিত ঘুমোয় না। সারাদিনের কথা, জীবনের লক্ষ্যের কথা, ইন্দ্রাণীর কথা অমিত ভাবে। পুনরায় মনে হয়, intense living-এর কথা। শেষ রাতে অমিতের বাড়ির দরজায় পুলিশের সবুট ধ্বনি পৌঁছে যায়।

এখানেই 'একদা' উপন্যাসের—চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনির সমাপ্তি।

তিন

দ্বিতীয় পর্ব 'অন্যদিন' ১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখেন গোপাল হালদার। প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। উপন্যাসের ঘটনা-কাল ১৯৩৭-৩৮ সালের বিশেষ একটি দিন।

'একদা' উপন্যাসে আমরা দেখেছি, অমিতের জীবনবোধ, তার জীবনের প্রতি ভালোবাসা, মর্ত-মমতার প্রতি আকর্ষণ। সে পলাতক বিপ্লবী সুনীলকে কিছু টাকা পৌঁছে দেয়, কিন্তু তার সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ করে না। সহপাঠী বন্ধু শৈলেন বা সাতকড়িদের 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের' গ্লানিময় জীবন তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সে জীবনের মহত্ত্বকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু কোন্ পথে জীবনের সেই সত্যকে সে পাবে? (তদেব, পরিশিষ্ট, শ্রীঅমিয় ধরের নিবন্ধ 'গোপাল হালদার : জীবন ও শিল্পে-একাত্ম', পৃ. ৫৭৫)।

অমিত জানে 'জীবনের মানে আরও বেশি—সে শুধু দিন গাঁথিয়াই শেষ হয় না।.... সে চাহে বিকাশ......বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান্ ইটারনিটি—ইন্ ইন্টেন্স্ লিভিং।" ('একদা', রচনাসমগ্র ১, পৃ. ১২২)। সে জীবনের পরম সত্য নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেছে। "আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির অমিত ভাবে জীবনের পথে সে সত্যান্বেষী তীর্থযাত্রী—এই তার পরিচয়।" (শ্রীঅমিয় ধর। তদেব, পৃ. ৫৭৫)। "জীবনকে পুরুষের মতো স্বীকার করাই বড় কাজ", এবং বাস্তব পৃথিবীর "রূপান্তরের দাবিকে জীবনে গ্রহণ করিতে পারাই বড় সার্থকতা। অমিত তাহাই করিতে চায়।' ('একদা', তদেব, পৃ. ১২৩)। মধ্যরাতে সে বাড়ি ফেরে এবং ভোররাতে তার দরজায় পৌঁছয় পুলিশের সবুট পদধ্বনি। (তদেব, পৃ. ১৩১)। এখানেই 'একদা' উপন্যাসের সমাপ্তি। অমিত আবার বন্দি হয় কারাগারে। পাঠক জেনে যায়, অমিত 'বড় আমি'র জগতে তীর্থযাত্রার প্রয়াসী।

শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব 'অন্যদিন'। কর্মচঞ্চল জীবন থেকে বন্দিজীবনের বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অমিত তত্ত্বগতভাবে জীবনসত্যকে পেয়ে যায়—"মানুষের সৃষ্টি-শক্তি আজ পৃথিবীতে নতুন করিয়া রচনা করিতে শিখিতেছে, মানুষ আজ পৃথিবীতে

নতুন করিয়া রচনা করিতে শিখিতেছে, মানুষ আজ শিখিতেছে নিজেকেই রচনা করিবার বিদ্যা। ইহাই এযুগের দৃষ্টি, ইহাই এযুগের সৃষ্টি। আর এই মানুষের পরিচয় রচনাতেই তোমাদের পরিচয়" ('অন্যদিন', তদেব, পৃ. ১৫১)। শ্রীঅমিয় ধর ইঙ্গিত করেছেন, কারাগারে কর্মহীন দিনযাপনে অমিতের চিন্তাস্রোত বন্ধ হয় না, এই জীবন, এই মানুষকে ভালোবেসে, সত্যরূপে জেনে, কার্যের মধ্য দিয়ে আপনার সার্থকতা আবিষ্কারের দিন। (তদেব, ৫৭৫)। 'অন্যদিন' উপন্যাসে তার স্পষ্ট সমর্থন—"আজ অন্যদিন—সেদিন আর নাই, নাই বিচারহীন সেই অধীর আত্মদানের দিনও।" (তদেব, ৩২৬)।

'ইনটেন্‌স লিভিং'-এর ব্যাকুলতায় কারাবন্দি অমিতের চিন্তাস্রোত কেবল স্রোতমাত্র নয়, তা কঠিন সংকল্প গ্রহণের দিন। তা-ই অমিতের কাছে 'অন্যদিন'। তীব্র গভীর আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাওয়া জীবন-দৃষ্টিকে কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করে জীবনসত্যরূপে গ্রহণের আগ্রহ নিয়ে অমিত পৌঁছে যায় 'অন্যদিনে'। 'একদা' উপন্যাসে আমরা জেনেছি অমিত ইতিহাসের ছাত্র। আরো জেনেছি, ইতিহাস তার কাছে অতীত ঘটনাবলীর সমাহারমাত্র নয়। তার আছে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। মানবসভ্যতার পর্ব থেকে পর্বান্তরকে অমিত জেনেছে, তা আমরা লক্ষ করেছি 'একদা' উপন্যাসে। এখন 'অন্যদিন' উপন্যাসে অমিত 'ইতিহাসের সৃষ্টিশক্তিকে' স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে যায়। 'লাইফ মার্চেস্‌' — জীবন থামে না, সে চলতেই থাকে। মানব-মহাতীর্থের দিকে অপরাজেয় মানুষের মহা অভিযানের সে এখন সচেতন সহযাত্রী। এই চেতনাবিন্দুতেই 'অন্যদিন' উপন্যাসের সমাপ্তি।

'অন্যদিন' উপন্যাসের সূচনায় উল্লেখ আছে, আজ শরৎকাল। "চোখ মেলিতে না মেলিতে অমিতের চোখে আসিয়া পড়িল আর একটি দিনের আলো। আশ্চর্য বাংলাদেশ, আশ্চর্য তার শরৎকাল।... অমিত আর স্থির থাকিতে পারিল না। বিছানা ছাড়িয়া গারদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাত দিনই সে এমনি দাঁড়াইয়াছে,—বাংলাদেশের প্রভাতকে এমন করিয়া প্রণাম জানাইয়াছে। ....এক-একটা দিনই এখন এক-একটা পরীক্ষা। ছয় বৎসর যেন ইহারই প্রস্তুতি। ছয় বৎসরের চাপা-পড়া আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা অবশেষে দিন ও প্রহরের হিসাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ... ছয় বৎসরের প্রত্যাশা আর ছয় বৎসরের প্রতীক্ষা... প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা।" ('অন্যদিন', রচনা-সমগ্র ১, পৃ. ১৩৭-১৩৮)।

কারাগারে বসে অমিতের মন জাল বুনে যায়। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর দেয়। অমিতের মনে পড়ে, তার মা আর নেই। বোন অনুর পত্রে জানতে পারে, কতো রাত মা বিনিদ্র কাটান, জানালা ধরে দাঁড়ান, বলেন, 'অমি' আসছে। মৃত্যুযাত্রী মা'কে দেখার অনুমতি সরকার তাকে দেয় না। জেলে নিদ্রাহীন রাত্রির নির্দয়তাকে অমিত ভালো করেই জানে। ('অন্যদিন', তদেব, পৃ. ১৪২)। মনে পড়ে তার বাবার কথা, জানালার কাছে ঝুঁকে সংবাদপত্র পড়ছেন—তিনি পড়েন প্রতিটি সংবাদ—এই জটিল কালের জটিল ভগ্ন কাহিনি। ('অন্যদিন', তদেব, পৃ. ১৪৩)। জেলে সহবন্দিদের কথা মনে ভেসে বেড়ায়। সুশীলদা ফ্রেজারের 'গোল্‌ডেন বাউ'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শেষ করে এঙ্গেল্‌সের 'পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র' নিয়ে বসেছেন অমিতের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' শেষ

করে সুশীলদা অমিতকে প্রশ্ন করেন—'এতই তোমার ভালো লাগলো অমিত? অমিত জানায় ভালো লেগেছে।' (তদেব, পৃ. ১৪৮)। কেন? অমিতের উত্তর পাঠককে কৌতূহলী করে—"লাগিবে না কেন? সকলের সহিত সে তর্ক করিয়াছে : বাঙালী বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি অমন করে ব্যক্তিসত্তাকে বলি দেয় নি—মানলাম এ সত্য। কিন্তু যে-সত্য নিয়ে সাহিত্যের পরিচয়, সে-সত্য তো তোমার-আমার মতো বাঙালী বিপ্লবী জীবনের কর্মপদ্ধতি বা এ-প্রয়াস, ও-প্রয়াস মাত্র নয়। সে-সব ঘটনা, চিন্তা ও প্রয়াসের স্থূল রূপের মধ্যে থেকেই সাহিত্য ছেঁকে তোলে সত্য—মানব-সত্য। মানুষ যেখানে মানুষ, জীবন যেখানে জীবন। সে পৃথিবীকে ভালোবাসে। তার প্রিয়জন চাই—সন্তান-সন্ততি—এ সত্য গভীরতর। এখানেই তো সাহিত্যের তাই জয়, সে বাইরের সত্যের কারবারী নয়।" (তদেব, পৃ. ১৪৮)

অমিত তথা লেখক গোপাল হালদারের রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস সম্বন্ধে এই অভিমত পাঠকের কৌতূহলকে তীব্র করে তোলে। তার অভিমত সুশীলদা মানতে চান না। বোধ করি, তার মনে হয়, সে সুশীলদাকে ঠিকমতো বুঝাতে পারেনি। (তদেব, পৃ. ১৪৮-১৪৯)

অমিত বলতে চেয়েছিল, 'ইতিহাস শুধু কাগজের পিঠে কলমের আঁচড়ের লেখা হয় না সুশীলদা। বরং কর্ম দিয়ে প্রয়াস দিয়ে সে ইতিহাস লেখা হয়। মানুষই তার সেই ইতিহাসের স্রষ্টা। এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি—এতেই পরিচয় আমাদের জীবনের।' (তদেব, পৃ. ১৪৯)

'তোমার পরিচয় তুমি দেবে না অমিত?'—অমিতের চিন্তাস্রোতে ভেসে আসে এই প্রশ্ন, ফের উচ্চারিত হয় ছয় বছর পরে। এ প্রশ্ন ব্রজেন্দ্র রায়ের। (তদেব, পৃ. ১৪৯-১৫০)

সুশীলদা, ব্রজেন্দ্র রায় অমিতকে জানেন নি, ভুল করেছেন। অমিতের আত্মচিন্তা—নিজেকে প্রশ্ন—'তুচ্ছতম মানুষকেও দেখিয়া দেখিয়া শেষ করিতে পার কি তুমি, অমিত? অতি সাধারণ মানুষকেও কি মনে হয় না 'মিরাকল্ অব মিরাকল্স্'—'হোয়াট এ পীস্ অব ওয়ার্ক ইজ ম্যান'.... "বলুক ব্রজেন্দ্রনাথের ও অমিতের পিতা অমিতদিগকে 'হ্যামলেট্স্ অব দি এজ্'। না, তাহারা হ্যামলেট নয়।... তুমি ভারতবর্ষের আগামী দিনের মুক্ত মানুষের পুরোধা, তুমি মহামানবের আগামী-গায়ক। ইতিহাসের নবজাতকের আভাস তোমরা, অমিত ; সেই নবজাতকের স্রষ্টাও তোমরা। তোমরাও—তুমিও।" (তদেব, পৃ. ১৫১)

কার্ল মার্কস্ আর শেকসপীয়রকে ছাপিয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর।

জেলে চরসের গুরু রঘু ওড়িয়া অতি সহজেই অমিতের হাত থেকে অমিতের দেহ-ভার তুলে নিয়েছিল, তার সেবা করেছিল। রঘু তাকে চা করে দেয়, তার গেঞ্জি কেচে দেয়, গেলাসের ঢাকনি এনে দেয়, লবঙ্গ-এলাচ এনে দেয়।

এই কারাগার যেন ফলস্টাফের পৃথিবী নয়, ও যেন গোর্কির 'পাতালপুরী'ও। (তদেব, পৃ. ১৩৬)। কড়া শাসন পাহারা সত্ত্বেও রঘু অমিতকে অনেক কিছু এনে দেয়। জেলের 'ইহাই নিয়ম'কে অগ্রাহ্য করে সামান্য মানুষ রঘুর মহত্ত্ব অমিতের সামনে প্রতিভাত হয়। জেলে অমিতের আত্মজিজ্ঞাসার শেষ হয় না। তার মুক্তির আদেশে কতজন খুশি। 'আজ অন্যদিন—অন্যদিন'। (তদেব, পৃ. ১৮১)

টানা চার বছর পরে অমিতের মুক্তির সংবাদ এলো। সহবন্দিদের কাছে বিদায় নিয়ে অমিত চলে মুক্ত পৃথিবীতে। (তদেব, পৃ. ১৮২, 'অন্যদিন')।

অমিতের চিন্তাস্রোতে বারবার ফিরে আসে দুটি শব্দ—'প্রত্যাশা' আর 'প্রতীক্ষা' (তদেব, পৃ. ১৮৫)।

"যে গৃহের অনেকখানি ছাইয়া আছে অমিত,—এক অমিত,—সেই গৃহের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষাই অমিতকে ছাইয়া রহিল। একটি সুডোল অনাবৃত বাহুর আভাস, পশ্চিম-আকাশের মুখ-চাওয়া একটি তরুণী মুখের স্থির নির্বাক প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা...আর প্রতীক্ষা—অধীর উন্মুখ ইন্দ্রাণীর—সেই দৃপ্ত সাহসিক মুখ।" (তদেব, পৃ. ১৮৫)

ঘুরে ঘুরে আসে সেই দুটি শব্দ, অমিতের হৃদয়কন্দরে ধ্বনিত হয়। 'অমিতের আত্ম-পরিহাস ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে : তাহাকে, তুমি ত, ফাঁকি দিয়াছ তুমি? নিজেকে, শুধু নিজেকেই দিয়াছ।" (তদেব, পৃ. ১৮৬)

'অন্যদিন' উপন্যাসে কারামুক্তির মুহূর্ত আর কারামুক্তির পরবর্তী প্রহরগুলি অমিতের আত্মজিজ্ঞাসায় নিঃশব্দে মুখরিত। বাহিরের ঘটনায় কোলাহল আর অন্যান্যদের কথাবার্তা অপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে অমিতের আত্মজিজ্ঞাসা। "নিজের চিন্তাকে অনুসরণ করিয়া চিন্তা চলে পিছনের দিকে, আবার চিন্তার অনুসরণের চিন্তা আসিয়া তাহা গুলাইয়া দেয়। স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করিয়া চলে পিছনে, ছেদ টানিয়া জাগিয়া ওঠে শুধু উদ্ভট স্বপ্ন।" (তদেব, পৃ. ১৮৭)

মাঝে চার মাস অসুস্থ অমিতের ঠাঁই হয় পাহাড়ে (বক্সা ক্যাম্পে)। চার মাস বাদে আবার ফিরে আসে প্রেসিডেন্সি জেলে (কলকাতায়)। "জীবনের মমতাতেই সেবার অমিত মরণকে ঠেকাইতে পারিয়াছে,—এইবার সেই জীবনের পরীক্ষা। বন্দিশালায় জীবন এতদিন বহিয়া গিয়াছে। জীবনের স্পর্শলাভ সে করিয়াছে, অর্জন করিবার অধিকার তাহার ছিল না। এইবার তাহাকে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে মুখামুখি করিতে হইবে—জীবনের সঙ্গে এইবার মুখামুখি করিতে হইবে.... মূল্য দিয়া অর্জন করিতে হইবে—জীবন-সত্য।" (তদেব, পৃ. ১৮৮)

সহবন্দিদের দল, জেল-সুপার, সেবক রঘু—সবাইকে প্রীতি সম্ভাষণ করে, বিদায় চেয়ে নিয়ে, মতভেদ মিটিয়ে নিয়ে বিদায়ের পূর্ব শেষ করে অমিত জেলগেট পেরিয়ে মুক্ত পৃথিবীতে মুক্ত সংসারে মুক্ত পথে এসে দাঁড়ায়। তার চিন্তাস্রোতে ভেসে ওঠে প্রশ্ন—"কে রহিল পেছনে? কি রহিয়াছে সম্মুখে?" (তদেব, পৃ. ২১৪)

শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। 'অন্যদিন' উপন্যাসের মধ্যে নতুন পালা, শিরোনাম 'গৃহাঙ্গন'। (তদেব, পৃ. ২২২) চিন্তাস্রোত অমিতকে ছাড়ে না। সহস্র প্রশ্ন আর উৎকণ্ঠায় ভরা অমিতের মন। বাহির-জগতে যা দেখে তার চেয়ে সহস্র প্রশ্নের মুখোমুখি অমিত। রিলিজঅর্ডার (রেস্‌ট্রিকশন-সমেত) অমিতের হাতে দিল 'বুলডগ্' রায়সাহেব। 'এবার কি করবেন, অমিতবাবু?' এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই অমিতের। তবু এটাই সত্য, আজ সে মুক্ত।

অমিত নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছল। আজ আর মা নেই। আছেন বৃদ্ধ পিতা, আছে বোন অনু। কানে কম শোনেন, দেহ প্রায় অচল, বৃদ্ধ পিতার সামনে অমিত। তার মনের

মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—"এই তোমার পিতা, অমিত? কোথায় সেই চিরজীবনের শান্ত চিন্তাশীলতা, ক্লাসিক্স্ পাঠকের অভ্যস্ত সংযম, গাম্ভীর্য?.... কিন্তু এ কি অমিত,— সেই ক্লাসিক্স্-পরিপুষ্ট মনও শ্লথ হইয়াছে, নুইয়া পড়িয়াছে, সেই অখণ্ড সত্তা গলিয়া যাইতেছে—একি অমিত? এ কি?" (তদেব, পৃ. ২৪৩)

এই দৃশ্য সদ্যমুক্ত রাজবন্দি অমিতের মনকে ভেঙে দেয়। ঘরের চারদিক দেখে অমিত। এই ছয় বছরের ব্যবধানে বদলেছে পরিবেশ, বদলেছে মানুষ। পিতার ধ্যানমূর্তি আজ সে দেখে না, দেখছে ভাঙা মূর্তি। তার কুশল-জিজ্ঞাসু পিতার প্রশ্নের উত্তর অমিতের জানা নেই। (তদেব, পৃ. ২৪৬-২৪৭)। আজ আর মা নেই। বোন অনু তাকে খেতে দেয়, দাদাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস করে (পশ্য, পৃ. ২৫০-২৫৩)।

আহার শেষে অমিতের বিশ্রাম। নিদ্রা নেই, শুধু তন্দ্রা—অল্প সময়ের মধ্যে। তার মনের মধ্যে তীব্র বেগে প্রবাহিত চিন্তাস্রোত। অনু, রবি দত্ত, সবিতার সঙ্গে কথা বলে অমিত, কথা বলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু মনে হয় ঠিক সুর বাজছে না। সবিতার বাবা ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় অমিত। 'তোমরা কমিউনিস্ট অমিত, না?'—ব্রজেন্দ্র রায় প্রশ্ন করেন (পৃ. ২৮৩)। অমিতের উত্তর—'ঠিক জানি না। কাজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা হলে বুঝব—কী সত্য, কী মিথ্যা, আমিই বা কী, আর কী নই।'

আর একটি নতুন পর্ব—'পথচারী' তার শিরোনাম। 'অন্যদিন' উপন্যাসের নতুন পর্ব। এই পর্বে অমিত তার নিয়তিব মুখোমুখি। তার নাম ইন্দ্রাণী। 'তোমার আশায় দাঁড়িয়ে আছি, অমিত' (পৃ. ২৯৪)। ইন্দ্রাণীর কথায় অমিতের চিন্তাস্রোত ঘুরে যায়, জীবনকে নতুন করে দেখতে হয়। ইন্দ্রাণী জানায় সে 'ইন্দ্রাণী বউদি' নয়, শুধু-ই ইন্দ্রাণী। "আমি জানি—আমি ইন্দ্রাণী। কারও ভার্যা নই, বউদিও নই। আমি ইন্দ্রাণী—তোমার অন্তরাত্মাও তা স্বীকার করেছে স্বতোচ্ছ্বাসে সেই প্রথম মুহূর্তেই আজ পথের উপরে।" (পশ্য, পৃ. ৩০৪)। অমিত আর ইন্দ্রাণীর কথালাপে পাঠক জেনে যায়, ইন্দ্রাণী-ই অমিতের আশ্রয়। অমিত সে কথা স্বীকার করে ইন্দ্রাণীর কাছে। কারাকক্ষে কতো চিন্তাস্রোত বহে গিয়েছিল, সেদিন সেই স্রোতে বারবার ফিরে এসেছিল ইন্দ্রাণী। অমিতের এই স্বীকারোক্তি (পৃ. ৩০৬-৩০৭) অমিত-চরিত্রকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। হয়তো লেখকের অভিপ্রায়ও তা-ই। ইন্দ্রাণীর সম্ভাষণ—'অমিত'। "যেন কণ্ঠস্বর নয়, রক্তকণার সম্ভাষণ।" (পৃ. ৩১১)। অমিতের চেতনায় জেগে ওঠে এইসব পঙ্ক্তি—My desire and they desire/turning to a tongue of fire,/leaping live and laughing higher,/thro' the everlasting life/In the mystery of life'. (পৃ. ৩১২)

চার

'ত্রিদিবা'র তৃতীয় ও শেষ পর্ব 'আর একদিন'—১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে লেখার শুরু, শেষ করেন জেল থেকে বেরিয়ে পাটনায়,—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত—১৯৫৯ সালে। এ উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪৮ সালের আর একটা দিন। ভারত সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছে, দেশ ভাগ হয়েছে (১৯৪৭), তারপরই আবার কারাগারে রাজবন্দি অমিত ১৯৪৮ সালে। (দ্র. পরিশিষ্ট)

তৃতীয় পর্ব 'আর একদিন'-এর কাহিনি। "হ্যামলেটীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে, জ্ঞান ও অনুভূতিলব্ধ জীবনদৃষ্টিকে আশ্রয় করে অমিত কর্মের পথে তার আকাঙ্ক্ষিত তীর্থে পৌঁছবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে সহযাত্রী বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়ায়। শুরু হয় অমিতের জীবনে 'আর একদিন'—কমিউনিস্ট জীবন—'সর্বজনসুখায়, সর্বজনহিতায়' জগৎকে, জীবনকে রূপান্তরিত করার জন্য দুঃখ বরণের, আত্মদানের মহৎ জীবন-বাসনা—'বড় আমির তপস্যা।' ১৯৪৮ সালের এক সকালে লর্ড সিনহা রোডে গোয়েন্দা দপ্তরে অমিতকে আনা হল। অমিতের "জীবনে শুরু হইল আর-এক দিনের।... যখন এ স্পেক্টর ইজ হান্টিং দি ওয়ার্ল্ড।" (তদেব, পৃ. ৩৬৯)। এ দেশের মানব অভিযানের পুরোভাগে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে। 'মানবমুক্তির দিকে, ভালোবাসার রাজ্যে' তীর্থযাত্রী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী—নানা মানুষের সাহচর্যে অমিতের মনে হয় সে একা নয়—আমিও তার অঙ্গ—মহামানবের।' (তদেব, পৃ. ৩৬৯)। সে রক্তের অণুপরমাণুতে অনুভব করে 'জীবন্ত সেই বড় আমির স্পন্দন', প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের মুখে খুঁজে পায় 'বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর'। 'স্থির চরণে অমিত' তীর্থযাত্রী বন্ধুদের সহযাত্রী হয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে যায়—'টু হুম দি মিজারিজ অব দি ওয়ার্ল্ড আর মিজারিজ, অ্যান্ড উইল নট লেট দেম রেস্ট।' (তদেব, পৃ. ৫২২)।" (তদেব, পরিশিষ্ট, শ্রীঅমিয় ধর)।

'একদা' উপন্যাস রচনার সময় পরবর্তী পর্ব সম্পর্কে লেখকের কোনো সংকল্প ছিল না, তা লেখক কবুল করেছেন, কিন্তু শেষ পর্ব 'আর একদিন' লেখার সংকল্প ছিল মধ্যপর্ব 'অন্যদিন' রচনার সময়, একথা লেখকের 'নিবেদন' থেকে আমরা জানতে পারি। তাই রচনার সংহতি ও ঐক্যবোধ এই পর্বে লেখককে চালনা করেছে,—একথা মনে হয়।

'আর একদিন' উপন্যাসের শুরু সেই ভোররাতে—"নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়া সবুট পদধ্বনি আগাইয়া আসিল।... কে?.... থানা থেকে আসছি আমরা।" (তদেব, পৃ. ৩৪৭)

গোয়েন্দা বাহিনির সেই চিরাচরিত কায়দা, গ্রেফতারের কৌশল। 'বিস্মৃত একটা বাস্তব। অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাব। মন তখনো তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই।.... উন্মোচিত আবার রাইফেলের রাজত্ব? ঝুটা হইয়া গিয়াছে তবে '৪৭-এর এক স্বাধীনতা-স্বপ্ন?—অমিতের মন আপনাকেই আপনি জানাইয়া দেয়।" (তদেব ৩৪৭)

'আপনার ভগিনী অনুজা রায় ও ভগিনীপতি শ্যামল রায় নেই?'—গোয়েন্দাদের এই

প্রশ্নে সচকিত হয়ে ওঠে অমিত। তারা নেই। গোয়েন্দারা তা বিশ্বাস করে না। সারা বাড়ি সার্চ করে। অমিতের মনের মধ্যে প্রশ্ন : "এ স্পেক্টর ইজ হান্টিং দি ওয়ার্ল্ড? হাঁ, এ স্পেক্টর ইজ হান্টিং দি ওয়ার্ল্ড।" (তদেব, পৃ. ৩৪৮) ফ্ল্যাটে কেবল আছে তার পরিচারক সাধু। গোয়েন্দারা সারা বাড়ি সার্চ করে। আর কাউকে পায় না। অমিতের মনে হয়—'না, ১৮৪৮ নয়, আজ ১৯৪৮। শুধু আর ইউরোপ নয়, এ স্পেকটার ইজ হান্টিং দ্য ওয়ার্ল্ড।" (পৃ. ৩৪৯)

এই কথাটাই গানের ধুয়ার মতো সারা উপন্যাসে বেজে উঠেছে। 'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, ফর আর্মস, এক্‌স্‌প্লোভিস্‌'। গোয়েন্দার এই কথায় চমকিত হয় অমিত। কিছুই পাওয়া গেল না। অমিতের মনে পড়ে গেল যদু সেন লেনের ঠাকুরদালানে গানের আসরের কথা। হঠাৎই গানের মধ্যে বোমার ধূম্র, বারুদের গন্ধ, গুলির শব্দ, পড়ে গেল সুবীর, তার কপালে রক্তের ধারা—গুলি ঢুকে গেছে মাথায়। সেদিন অমিতের মনে হয়েছিল কলকাতাতেই হিটলারী তাণ্ডব—সুবীর শেষ। ভারতের নানা স্থানে জেগে উঠেছিল বিক্ষোভ। স্বাধীন ভারতে তার সমাপ্তি ঘটে নি। 'যদু সেন লেনের খুনের এটাই বুঝি পুলিশি সাফাই?' গ্রেপ্তারি হুকুমের কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে অমিতের প্রশ্ন। গোয়েন্দার কোনো উত্তর নেই। 'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে'। ঠিক আঠরো বছর পূর্বে এমন কথা অমিতকে বলেছিল এক গোয়েন্দা। আজ স্বাধীন ভারতে সেই একই কথা। 'আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবে'—গোয়েন্দার এই মিথ্যা বাক্য শুনে অমিত পুলিশের গাড়িতে ওঠে। মনে মনে ভাবে, গ্রেফতারির তালিকায় শ্যামল রায়ের নামও আছে, তাকে কী করে খবর দেবে? কেবল গ্রেফতার নয়, তার ফ্ল্যাটও সীলবদ্ধ হল, পরিচারক সাধু তার জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে দাঁড়াল।

পুলিশের সঙ্গে অমিত পৌঁছে গেল গোয়েন্দা-দফতরে লর্ড সিনহা রোডে। পুলিশের গাড়িতে ওঠার পূর্বে অমিতের মনে হয়েছিল—'আমি 'বড় আমি'কে চাই, সেখানে এও সত্য, ইন্দ্রাণী, 'তুমি আছ, আমি আছি।' (পৃ. ৩৬৯) গোয়েন্দা-আপিসে দেখা হল এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। পূর্ব-পরিচিত এবং কিছুকাল পূর্বে পরিচিত কর্মীর দল। প্রাণচঞ্চল সুরো, মঞ্জু, আরো অনেকে সারাটা দিন সেই গোয়েন্দা-আপিসে অস্নাত অভুক্ত। অবশেষে সন্ধ্যায় জেলে। সকলের সঙ্গেই অমিত আলাপ করে, বুঝতে চেষ্টা করে নানা মানুষকে। অমিতের মনে পড়ে যায় নানা কারখানা আপিসে কর্মীদের আন্দোলনের কথা, বিশেষ করে চটকল মজুরদের লড়াইয়ের কথা। লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে ফ্যাক্টরির গেটে সভা। বাঙালি-অবাঙালি মেয়ে-পুরুষ কর্মীদের লড়াই। বাঙালি ও বিলাসপুরিয়া মেয়ে-কর্মীদের সাহস ও তৎপরতার কথা মনে পড়ে।

অমিতের মনে হয় হ্যামলেটীয় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় এইসব কর্মীদের কতো তফাৎ। এদের সাহস ও সংগ্রামী মনোভাব দেখে চমক লাগে। (পৃ. ৪১৫) অবাঙালি আজমগড় ও বিলাসপুরের নারী ও পুরুষদের সপ্রতিভতা আর সংগ্রামী মনোবৃত্তিতে অমিত জীবনের একটা নতুন রূপ দেখে। তার মনে হয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের থেকে এরা—আনপড় মজুর-মজুরনীরা কতো অগ্রসর।

অমিতের জীবনে প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা যেমন সত্য, তেমনই সত্য জীবনের নব নব উপলব্ধি, অনুভূতি। তার পরিচয় পাই 'আর একদিন' উপন্যাসে গোয়েন্দা-আপিসে ধৃত অমিতের চিন্তাপ্রবাহে :

"সুখের চিন্তার ছায়ার সঙ্গে মমতা-ভরা দরদের সুর বাজিয়াছে (আজমগড়ের কালাইটিকি গ্রামের অধিবাসী, বর্তমানে কারখানার কর্মচারী ধৃত কুলকনের) গলায়।—দৃঢ় দেহ, সবল তেজীয়ান সেই মজদুর সৈনিকের আড়াল হইতে কথা বলিতেছে এই কে? সেই চিরদিনের মানুষ—মমতায় দুর্বল, স্নেহে জীবন্ত, আর জীবন-বৈচিত্র্যে পরমাশ্চর্য সত্য। মানুষ।

অমিত ভাবিতে থাকে—এই মানুষই কি সবার উপরে সত্য? সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সত্য? না সকল মানুষের এই পরম বিকাশকেই সম্ভব করিবার জন্য জানাইতেছে এই মজদুর মানুষ—উগ্র, লড়াকু মজদুর,—'বাহাদুর মজদুর'—তাহার আহ্বান—

লা'দাম! লা'দাম! ফুঝুর লা'দাম!

—এ শুধু মজুরের কথা নয়—মানুষেরই দাবি—মানুষ সত্য হতে চায়। 'সম্ভাবনা' 'সত্য' হয়ে ওঠে—কিন্তু বিশেষ মুহূর্তের 'সম্ভাবনা', বিপ্লবের মুহূর্তে সম্ভাবনা... সে 'মুহূর্তে' যে অনেক আয়োজনের ফলশ্রুতি... লগ্নের মহামুহূর্ত—তা কি আসিতেছে? আসিয়াছে সে 'লগ্ন' এ দেশের জীবনে?" (তদেব, পৃ. ৪৬৯)

চাষি কানাই হাজরা বলে—"ও আমরা চাষিরা বলব। আপনারা বলেন কমরেড লেনিন, কমরেড স্তালিন। আমরাও নিজেদের বলি 'কমরেড'—কিন্তু ওঁরা হলেন মহাগুরু। আমরা ত ওনাদের মন্ত্র আপনাদের মুখেই পেলাম। আপনারাই কি আমাদের ছাড়তে পারেন?—গুরুই কি ছাড়তে পারে শিষ্যদের?" (পৃ. ৪৭০)

অমিতের একথা শুনে মনে হয়, সে সত্যই ওদের ছাড়তে পারে না। সন্দেহ নেই, লেখক তাঁর বিস্তীর্ণ সংগ্রামী জীবনে চাষি, মজদুর, মধ্যবিত্তদের বিভিন্ন ফ্রন্টে কাজ করার সময়ে অভিজ্ঞতাকে এখানে তুলে এনেছেন। এইখানে কতো দূরবর্তী অঞ্চলের মজদুর, চাষিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে সেইসব দূরবর্তী মানুষদের জীবনের মধ্য থেকেও প্রাণরস আহরণ করেছে, করছে। কেবল রাজনৈতিক মতবাদ নয়, বাস্তব জীবন থেকেও অমিত প্রেরণা ও প্রাণরস আহরণ করে। এঁদের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাণের স্পর্শ পায়।

এভাবেই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে যায় অমিত। নিজেকে সে বলে, "সীমাবদ্ধ সত্তার মধ্যে তুমি আপন সীমাবদ্ধ স্মৃতি-চেতনা-আবেগে আলোড়িত অমিত, —বুলকনরা, রশীদরা, কানাই হাজরারা তোমাকে বাহির হইবার পথের সংকেত দিতেছে—গণ্ডী ছাড়াইয়া ওঠো.... অর্থাৎ পালাও। 'এস্‌কেপ ফ্রম সেল্‌ফ'—ছোট আমি হইতে বড় আমিতে।" (পৃ. ৪৭১)

ফের জেলে উপনীত হয় অমিত ও তার সঙ্গীরা। আবার ইন্দ্রাণীর কথা অমিতের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথায় অমিতকে শুনতে হয় ইন্দ্রাণীর নিজ জীবনের বিপ্লবের কথা।

"এসো, অমিত, এসো : অবিশ্বাস করো না অন্তত তুমি এই বিপ্লবকে এখন। অমিত

ভাবনায় বিধ্বস্ত কিন্তু কার্যক্রমে অটল : বিপ্লবের পথ সরলরেখায় নয়, ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর আবেগ, দৃপ্ত আত্মাভিমানে পরিণত হইল : বিপ্লবের পথ ইন্দ্রাণীর অত অপরিচিত নয়, অমিত।" (পৃ. ৪৯৮)

সেই ব্যক্তিত্বময়ী সচেতন নারী অমিতের সামনে আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করল।... 'ইন্দ্রাণীর দেহের উদ্ভাসে, মুখের উল্লাসে, চোখের দীপ্তিতে যেন এই কথাই ফুটিতেছে : তুমি, অমিত, তুমি,—ইন্দ্রাণী যাহার হাতে হাত মিলাইয়াছে,—অর্থাৎ ইন্দ্রাণীই যাহার কাছ হইতে আপন শক্তিতে আদায় করিয়াছে নিজের স্বীকৃতি—সেই তুমি, এই তেজোময়ী দীপ্তিময়ী নারীসত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে মিলাইয়া দিয়া কি সার্থক না হইয়া পারিবে আজ?" (পৃ. ৪৯৯)

অমিতের সাধ্য কি এই দীপ্তিময়ী ইন্দ্রাণীকে ফিরায়?

গোয়েন্দা-দফতর থেকে অমিতরা চলল কারাগারের পথে।

"হেড লাইট জ্বালিয়া, হর্ন দিয়া ব্ল্যাক মেরিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে গোয়েন্দা-আপিস ছাড়িয়া। অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার বাতির বিদ্যুৎ-বহ্নিরেখা সম্মুখের পথ দেখাইতেছে—কোথায়? জেলের দিকে?—ফুঁঃ, অমিত মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসিল—জেলে—আলোকের রেখা। কত কত জেল পার হইয়া ছুটিয়াছে—কত বিরোধ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া মানব-মুক্তির তীর্থসঙ্গমে—কত 'ছোট আমি' চূর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে কত 'বড় আমি'র দাবি। ... মহামানবের আগামী দিনের আগমনকে স্বাগত করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে কত প্রাণের দীপ।... ইন্দ্রাণী, তোমার-আমার-সকলের বুকে—সকলের চোখে-মুখে, বুকে-বুকে সেই মানব-সম্পূর্ণতার দীপশিখা। ... এই মুহূর্তে বিচিত্র বিপুল জগতের স্পন্দন অমিতের রক্তে, জীবন্ত সেই 'বড় আমি'র স্পন্দন।... এক একটি দিনের মধ্যে—প্রতিটি এই সাধারণ দিনের মধ্যেও—ইতিহাসের সেই ভাবী দিন রূপায়িত, বিঘোষিত তাহার মহদোল্লাস : 'অয়মহং ভো!' (পৃ. ৫২৪)

এখানে 'আর একদিন' উপন্যাসের সমাপ্তি।

স্বীকার্য, 'ত্রিদিবা' চেতনাপ্রবাহের পদ্ধতিতে লেখা আত্মজীবনীমূলক আধুনিক উপন্যাস। এর প্লট কোনো প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের প্লট নয়, অমিতের কাহিনি কোনো নিটোল প্লটের আখ্যানে নিবদ্ধ উপন্যাস নয়। 'ত্রিদিবা' রাজনৈতিক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, এর নায়ক অমিতের চরিত্রের উদ্ভাস। এক সংশয়ী জিজ্ঞাসু বাস্তবসচেতন বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্ভাস, তা নিজেকে নিয়ে আবদ্ধ নয়, তা 'ছোট আমি'-কে ছাড়িয়ে 'বড় আমি'-তে উত্তরণ-প্রয়াসের আধুনিক উপন্যাস।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ট্রিলজি

লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের জন্ম হয় কলকাতায় ১৯০৮ সালের ১১ নভেম্বর। তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতার উপকণ্ঠে ঢাকুরিয়ায় (১৬-১০-১৯৯৪)।

তাঁর জীবনকথা আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো গতানুগতিক খাতে প্রবাহিত হয়নি। তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুলে। কলকাতায় ফিরে এসে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে গজেন্দ্রকুমার মিত্র বসবাস শুরু করেন এবং বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনস্‌টিটিউশনে ভর্তি হন। স্কুলজীবন পেরিয়ে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। স্কুলে শিক্ষা সমাপ্তির কিছু পরেই সহপাঠী বন্ধু সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দুই বন্ধুতে মিলে গড়ে তোলেন 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশন প্রতিষ্ঠান। গোড়ার দিকে স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করে বাংলা বিহার অসমের বিভিন্ন স্কুলে নিজেরাই বই ধরাবার জন্য যেতেন। পরে সাহিত্য প্রকাশনায় চলে আসেন। শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধুই হয়ে ওঠেন প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও লেখক। আজ থেকে ৫৮ বছর পূর্বে দুই বন্ধুর সম্পাদনায় ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় 'কথাাহিত্য' পত্রিকা। আজও তা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র বাল্যকালে ছিলেন কাশীতে ও বৃন্দাবনে। এ দুটি স্থানকে তিনি করতলরেখার মতো চিনতেন। এ দুই জায়গার পটভূমিতে লিখেছেন উপন্যাস। পুরানো কলকাতার থিয়েটার মহলও তাঁর চেনা ছিল। তাঁর উপন্যাসে সে অভিজ্ঞতাও রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু কাশী, বৃন্দাবন আর কলকাতার থিয়েটার জগৎ নিয়ে লেখেননি কোনো স্মৃতিকথা। যদি লিখতেন তা হলে আমরা পেতাম এক অসাধারণ জীবন-অভিজ্ঞতার কাহিনি।

''গজেন্দ্রকুমার মিত্র সাহিত্যচর্চা করেছেন পঞ্চাশ বছর যাবৎ। তাঁর লেখনীর বিচরণক্ষেত্র বিরাট ও ব্যাপক। সামাজিক উপন্যাস, পৌরাণিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোর সাহিত্য—সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি। তিনি জীবনকে দেখেছেন নানা বিচিত্র রূপে, যা সব মধ্যবিত্ত বাঙালি লেখক দেখেননি। তাঁর পর্যবেক্ষণ দূরব্যাপ্ত ও নিখুঁত, তাঁর রূপায়ণ নির্ভুল, তাঁব বিশ্লেষণ অগ্রাহ্য করা কঠিন।" (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গজেন্দ্রকুমার মিত্রের পাঞ্চজন্য', 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', ২০০৪, 'দে'জ, পৃ. ২২১)।

অন্নদাশংকর রায় একদা লিখেছিলেন, বড় উপন্যাস লিখতে দম লাগে। সে দমের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে (৬ খণ্ড)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র সে পরিচয় দিয়েছেন 'পাঞ্চজন্য' (দুই খণ্ড) এবং ত্রিলেখ 'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে', 'পৌষ ফাগুনের পালা'য়। প্রথমটির জন্য লেখক ১৯৫৯ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

আর তৃতীয়টির জন্য ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক, ছোটগল্পের সংখ্যা গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত ধরে তিন হাজারেরও বেশি।

ত্রিলেখ (ট্রিলজি) 'কলকাতার কাছেই' (১৯৫৭), 'উপকণ্ঠে' (১৯৬১) আর 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১৯৬৪)। 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৪৯-১৯৫৫। পেপারব্যাক সংস্করণ প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯, দশম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১১। 'উপকণ্ঠে' উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৫৬-১৯৬০। পেপারব্যাক সংস্করণ প্রথম প্রকাশ ১৩৮২, সপ্তম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৮। 'পৌষ ফাগুনের পালা' উপন্যাসের রচনাকাল মে ১৯৬১—ডিসেম্বর ১৯৬৬। পেপারব্যাক সংস্করণ—প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮৬, সপ্তম মুদ্রণ মাঘ ১৪১১/জানুয়ারি ২০০৫। 'কলকাতার কাছেই' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং থেকে (১৯৫৭), পরবর্তী সংস্করণগুলি 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে। 'উপকণ্ঠে' (১৯৬১) আর 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১৯৬৪) গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাক্‌সাহিত্য প্রকাশন থেকে, পরবর্তী সংস্করণগুলি 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে। এই নিবন্ধের মূল অবলম্বন পেপারব্যাক শেষতম সংস্করণ।

উপরি-ধৃত সাল তারিখ থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি গজেন্দ্রকুমার মিত্রের এই ত্রিলেখ পাঠকসমাজে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল এবং এখনও একইভাবে পাঠকপ্রিয় হয়ে আছে।

এই প্রাথমিক পরিচয়ের পর আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখি হই তা হল এই ত্রিলেখের মূল বিষয়বস্তু কী। কলকাতার অদূরে হাওড়া জেলার এক গ্রাম ত্রিলেখের মূল বিচরণক্ষেত্র। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকাতা, মেদিনীপুর জেলা ও বিহারের জামালপুরের পটভূমি।

মূল বিষয়বস্তুর পরিচয় আমরা পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। বোধ হয় গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রেরণাস্থল এই রচনাংশ :

"বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নর-নারী, তাদের দুঃখ-দারিদ্রময় জীবন। তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল। বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনেফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে। তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।"

গজেন্দ্রকুমার তাঁর প্রিয় লেখক অগ্রজপ্রতিম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে শিরোধার্য করে লিখেছেন এই ত্রিলেখ। কলকাতার এত কাছে অথচ আমাদের মনের থেকে এত দূরে যে গ্রামসমাজ, তার সুধাক্ষরণের দুঃখহরণের জীবনকথা ত্রিলেখে রূপায়িত হয়েছে। গজেন্দ্রকুমারের লেখনীগুণে তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখনীতে এই নিস্তরঙ্গ গ্রামসমাজের রূপ চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ না করার কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাংলার গ্রামজীবনকে এঁদের মতো করে দেখেননি।

দুই

এই ত্রিলেখ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'কলকাতার কাছেই'। এর সূচনায় শেষ (তৃতীয়) খণ্ডের শেষাংশের সম্পর্ক আছে। ত্রিলেখ উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুটি—রাসমণি ও তার মেয়ে শ্যামা। রাসমণির মৃত্যুতে 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের সমাপ্তি। রাসমণির মৃত্যুর পর তার মেজ মেয়ে শ্যামা তাদের এতদিনের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে ছেলেমেয়েদের আগেই নতুন ভাড়াটে বাড়িতে নিয়ে গেছে। আর শেষ মুহূর্তে বড় মেয়ে কমলা আর ছোট মেয়ে উমা চোখের জলে.বিদায় নিয়েছে। 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের সূচনায় নিঃসঙ্গ একাকি শ্যামার জীবনের শেষ পর্বের উল্লেখ আছে, যা শেষ খণ্ডের ('পৌষ ফাগুনের পালা') শেষ পাতায় শ্যামার একাকি জীবনযাপনের বিবরণে আছে। প্রথম খণ্ডের সূচনায় তার ঈষৎ বিবরণের পর ফ্ল্যাশ-ব্যাকে লেখক গোটা ত্রিলেখ-উপন্যাসের বিবরণ শুরু করেছেন। স্বীকার্য, পঁচাত্তর বছরের যে কাহিনি তিন খণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, তা রচনা শুরু করার পূর্বেই লেখক মনে মনে গুছিয়ে নিয়েছিলেন। ত্রিলেখ উপন্যাসের সূচনা মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের আবহে। ত্রিলেখ-উপন্যাসের শেষ স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরে (১৯৪৮)।

তিন প্রজন্ম ধরে এই আখ্যান বিস্তৃত। কতো চরিত্র, কতো ঘটনা, কতো বৈচিত্র্য। এই তিন প্রজন্মকে মনে রাখার জন্যে লেখক পাঠককে সাহায্য করেছেন। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বংশলতিকা নির্মাণ করে দিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডে সূচনায় দেখি কলকাতার অদূরে—আট দশ মাইলের মধ্যে এস. ই. আর (তখনকার বি. এন. আর) রেলপথে মাত্র কয়েকটি স্টেশন। এই অল্প দূরত্ব পেরোলেই আমরা পৌছে যাই শ্যামাঠাকরুনের বাড়ি—অনেকটা জায়গা নিয়ে নানা গাছপালায় আকীর্ণ এক বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক অশীতিপর বৃদ্ধা—বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শ্যামাঠাকরুন। ঝরে পড়া ফল মূল নারকেল পাতা সংগ্রহ করেছেন। পাতা চেঁচে কাঠি বার করে সঞ্চয় করেন। বারান্দা ঘর ভর্তি হয়ে গেছে শুকনো পাতা আর নারকেলের কাঠিতে। আর গ্রামগঞ্জের নানা মানুষকে তিনি জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে ধার দেন। তাদের কাছ থেকে সুদ আদায় করেন এবং অনেক সময় ভুলেও যান কার কাছে কতো টাকা ও সুদ পান। এই নিয়েই তার নিঃসঙ্গ জীবন মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়। শেষ খণ্ডের শেষ অংশে শ্যামাঠাকরুনের পরিণতির ঈষৎ বিবরণ পাই প্রথম খণ্ডের সূচনায়।

কলকাতা থেকে অদূরে হাওড়া জেলার এক গ্রামে বিরাজ করে আঁধার। সেখানে পৌছয়নি বিজলী বাতি, পৌছয়নি সভ্যতা-শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো। সেখানকার নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারগুলির সুখদুঃখ আনন্দবেদনার কাহিনি ত্রিলেখ উপন্যাস। তারা যেমন দরিদ্র তেমনই হীনমনা।

এদের নিয়েই লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তিনপুরুষের জীবনকাহিনি চিত্রায়িত করেছেন। কিশোরী শ্যামা ছিলেন সুন্দরী, বলা যায় বিশেষ সুন্দরী। তাঁর বিবাহের ঘটনা থেকেই কাহিনি চলতে শুরু করে।

ত্রিলেখ উপন্যাস পাঠক পায় লেখকেরই বিবরণ থেকে। তিনিই উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই বিভিন্ন চরিত্রের নির্মাতা, তাঁরই নির্দেশে কাহিনি পথ চলতে শুরু করে। সুরুচি-ভদ্রতা-শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন যে পাত্রর (নরেন) সঙ্গে শ্যামার বিবাহ হয় সে পশু মাত্র। বিবাহের রাতেই শ্যামা নরেনের স্বভাব জেনেছিল। শ্যামার শ্বশুরবাড়ি যে গ্রামে সে অঞ্চলটা খিদিরপুর ডক-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নরেনের মা ক্ষমাসুন্দরীকে উঠে অন্যত্র যেতে হয়। কোম্পানির টাকা পেয়েছে দুভাই নরেন আর দেবেন। ক্ষমাসুন্দরী চলে গেলেন গুপ্তিপাড়া গ্রামে, সেখানে শিষ্যবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেই জঙ্গলে ভর্তি নিরানন্দ পরিবেশে ক্ষমাসুন্দরী তার পরিবারভুক্ত বউমেয়ে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। দুই ভাই অন্য কোনো জায়গায় জমি কিনছি বলে টাকাটা ভাগ করে নিয়ে ফুর্তি করে কয়েক মাসেই উড়িয়ে দিল। বাবুয়ানা, বেশ্যাগমন—কোনো কিছুতেই তাদের আপত্তি রইল না।

এভাবেই রাসমণির মেয়ে শ্যামার সংসারজীবন শুরু হল। তার স্বামী নরেন অশিক্ষিত, দুর্মুখ, মিথ্যাবাদী, দুর্ব্যবহারকারী যুবক। গুরুবংশের ছেলে বলে কখনো কোনো শিষ্যবাড়ি থেকে প্রাপ্তিযোগ ঘটলে তা নিমেষে উড়িয়ে দিতে বাধে না। এবং সে স্বভাবত উড়নচণ্ডী পলাতক। সে কখনো কখনো বাড়ি আসে, মা ও স্ত্রীর কাছ থেকে যা পায় তা কেড়ে নিয়ে যায়, তবে বংশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যটি কখনো অবহেলা করে না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্যামা কী দুর্দশায় জীবনযাপন করে তা নরেন জানে না, জানতে চায়ও না।

বস্তুত অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং দারিদ্র, এইসব অতি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে কোন্ অতলে নামিয়ে দেয়, তা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ত্রিলেখ উপন্যাস পড়লে অনুধাবন করা যায়।

সমস্ত আলেখ্যটা লেখকের লেখনীগুণে পাঠকের কাছে কঠিন ভয়ংকর বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। লেখক কোনো দয়া দেখাননি, যা বাস্তব তাকেই অংকন করেছেন। এই কাহিনি পড়তে পড়তে পাঠকের মন ক্রমশ অসাড় হয়ে যেতে থাকে। মানুষ কতো নীচ হতে পারে, কতো কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে পারে, কতো স্নেহভালোবাসা-বর্জিত হতে পারে, তা লেখক নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ মানুষেব যে কর্তব্য-অকর্তব্য মায়াদয়া কাণ্ডজ্ঞান থাকতে পারে, তা যে এইসব চরিত্রে নেই, লেখক তা দেখিয়েছেন।

'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের মূল কথাটা গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী প্রথম খণ্ডের ('মিত্র ও ঘোষ') ভূমিকায় অল্পকথায় বর্ণনা করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা প্রথমে সেই বিবরণটি তুলে দিয়ে তারপরে তার বিশদ ব্যাখ্যানে যাব।

"একটি দরিদ্র পরিবারের তিনপুরুষের দুঃখ-বেদনা হতাশা-ব্যর্থতায় শ্রীহীন আখ্যান সুদীর্ঘ কালপরিবেশে চেনাঅচেনা চরিত্রের ভিড়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তাতে গজেন্দ্রকুমারকে বাংলা উপন্যাসের অন্যতম সার্থক শিল্পী বলে গ্রহণ করতে হবে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে আধুনিক কাল—"প্রায় পঁচাত্তর বৎসর ব্যাপী এক পরিবারের তিনপুরুষের কাহিনি, যার প্রথম পর্বে গৃহকর্ত্রী রাসমণির বিড়ম্বিত জীবন এবং

দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বে তাঁর কন্যা শ্যামার দারিদ্রপীড়িত শুষ্ক কঠোর বিবর্ণ চরিত্রটিকে লেখক যেভাবে তুলির ধূসর রঙে এক বিষণ্ণতার তিক্ত আরকে ডুবিয়ে প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর শিল্পকর্মকে বিশেষভাবে প্রশংসা করতে হবে।

কলকাতা ও কলকাতার কাছাকাছি দরিদ্র পরিবারের কঠোর বাস্তব বর্ণনা এবং দারিদ্রজনিত উঞ্ছবৃত্তির যে তথ্যচিত্র এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে কল্পনার বাষ্পবিন্দুও নেই। জীবন কতো আকর্ষণহীন হতে পারে, প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা কতো তীব্র আকার ধারণ করতে পারে, অভাবের তাড়নায় নরনারী কত নীচে নামতে পারে—এই উপন্যাসে তারই বর্ণনা আছে। এই নিষ্প্রাণ স্বার্থকলুষিত, তুচ্ছ চরিত্রগুলির পাশে একমাত্র রাসমণিই সুস্থ ও স্বাভাবিক। এই ঘৃণ্য পরিবেশের উর্ধ্বে উঠে তিনি চিত্তের অমলিন তেজ ও ভদ্র পরিবারের ভব্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চারিদিকে যে কুৎসিত ঘৃণ্য বর্বরতা ফুঁসে উঠেছে, তার কাছে তিনি নতি স্বীকার করেননি। নিকট আত্মীয়স্বজনের অপরাধ ও পাপকেও তিনি ক্ষমা করেননি। ভাগ্য তাঁকে বঞ্চনা করেছে, পরিবেশ তাঁর চারিদিকে পূতিগন্ধময় পঙ্ককুণ্ড সৃষ্টি করেছে, সামান্য স্বার্থ নিয়ে তাঁর কন্যা-জামাতার ইতর কলহ তাঁর অন্তরের সুরবাঁধা বীণার সব তার ছিঁড়ে ফেলেছে—তবু তিনি নীচতার গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন। স্বল্পভাষিণী এই নারী কোনো কোনো দিক থেকে সুকঠোর স্পষ্টবাদী এবং প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যবোধে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। কন্যা-জামাতার নীচ রুচি তাঁকে ব্যথিত করে, কিন্তু অবসন্ন করতে পারে না। তাঁর ট্র্যাজিক অবসানেই গ্রন্থের সমাপ্তি।"

এর থেকেই 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়।

এই উপন্যাসে কোনো কারুণ্যধারা প্রবাহিত হয়নি। আছে বিষণ্ণতার ঘোলাটে অন্ধকার ও মায়ামমতাহীন নির্বেদ। জীবনের কোনো সুখবোধ এই উপন্যাসকে মহিমামণ্ডিত করে না।

জীবনের মহিমা ও মমতা থেকে শত হস্ত দূরে অবস্থিত এই উপন্যাস। লেখক অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে এই উপন্যাসের পরিবেশ ও চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন।

উপন্যাসের সূচনাংশে পথের ও পরিবেশের বর্ণনা পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে। "যে মানুষগুলো সদা-সর্বদা এখানে বাস করে তারা সবাই অর্ধমৃত; ম্যালেরিয়া ও পেটের অসুখ ওদের জীবনীশক্তিকে যেন নিঙড়ে বার করে নিয়েছে।"

পরে পরিবেশের বর্ণনা। সূচনাতেই তা পাঠকের মনকে দমিয়ে দেয়। "স্টেশন থেকে নেমে সোজা যে রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে মিনিট তিন-চার হাঁটলেই আপনার মনে হবে যে আপনি কোনো গহন অরণ্যে প্রবেশ করছেন।... রাস্তার ধারে ধারে প্রকাণ্ড পগার বর্ষার জলে এবং তারপর বহুদিন পর্যন্ত পাঁক ও কাদায় ভর্তি থাকে। অনেকের বাড়ি থেকেই ময়লা পড়বার এ-ই পথ, কিন্তু বেরোবার নয়। ফলে একটা চাপা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বাড়ির বাতাসকে সর্বদা ভারি করে রাখে। এইসব পগার ভাম ও ভোঁদড়ের আড্ডা। কুৎসিত ভয়ঙ্কর গোসাপগুলো এঁকেবেঁকে প্রকাশ্য দিবালোকেই চলাফেরা করে। মশা

এখানে দিনের বেলাতেও আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না। দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্তেই ম্যালেরিয়ার সর্বনাশা বিষ ছড়িয়ে বেড়ায়।”

এই পরিবেশে যেসব মানুষ বাস করে তারা সবাই অর্ধমৃত ; ম্যালেরিয়া ও পেটের অসুখ ওদের জীবনীশক্তিকে যেন নিঙড়ে বার করে নিয়েছে।

হাওড়া স্টেশন থেকে চার আনার টিকিট কেটে বি. এন. আর গাড়িতে চাপলে আট-নয় মাইলের বেশি নয়। একবার এই গ্রামে প্রবেশ করলে পাঠকের শ্বাসরোধ হয়ে আসবে। এখানে পরিবেশ দূষিত, মানবচরিত্রও দূষিত। তাদেরই কাহিনি এই উপন্যাস।

খানিকটা এগিয়ে খালের পুল পার হয়ে রাজার (ধনী জমিদার) বাড়ি ডাইনে রেখে বাজারের পাশ কাটিয়ে আরও যদি চলতে থাকেন তো একসময় আপনার মনে হবে দুপুরেই বুঝি সূর্য অস্ত গেছে—ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আপনার নিঃশ্বাস রোধ করে আসবে। বুঝবেন—আপনি এইবার শ্যামাঠাকরুনের বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন।

পাঠককে এভাবেই লেখক দিক নির্দেশ করে রাসমণির মেজ মেয়ে শ্যামার বাড়ি পৌঁছে দেবেন। শ্যামার কাহিনি পাবো পরবর্তী দুটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে (‘কলকাতার কাছেই’) পাবো রাসমণির কাহিনি, যার তিন মেয়ে—কমলা (বড় মেয়ে), শ্যামা (মেজ মেয়ে) আর উমা (ছোট মেয়ে)। রাসমণি আর তার তিন মেয়ের দুর্বিষহ দুঃখ-দারিদ্রময় জীবনের কাহিনি এই ত্রিলেখ উপন্যাস।

শ্যামাঠাকরুনের নিজস্ব ঊনআশি বছরের দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটি বিবরণ দিয়ে ত্রিলেখ উপন্যাসের শুরু ও শেষ। ফ্ল্যাশব্যাকে কাহিনি ফিরে আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে।

আজ বয়েসের ভারে নতজানু লোলচর্ম ক্ষীণদৃষ্টি শ্যামার। কিন্তু একদিন শ্যামা ছিল সুন্দরী। দশ বছর বয়সে শ্যামার বিয়ে হয়। তখন নিবিড় কালো কেশ, ঈষৎ পিঙ্গল দুটি চোখ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাতলা চাপা ঠোঁট, কুন্দদন্ত ও শুভ্রা, অসাধারণ সুন্দরী। আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে দশ বছরের কিশোরী শ্যামার বিয়ে হয়।

এখানেই লেখক এক ধাক্কায় কাহিনিকে সত্তর বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছেন।

শ্যামাসুন্দরীর তিন ছেলে, তিন মেয়ে, অসংখ্য নাতি-নাতনী। তাদেরও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। তবু আজ কেউ নেই তাঁর। এতবড় বাড়ি আর ঝুপসি বাগানে তিনি একা। একাকিই তিনি ঘুরে বেড়ান। শুকনো পাতা সংগ্রহ আর টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায়—এছাড়া শ্যামার জীবনে আজ আর কোনো চিন্তা নেই।

তিনটি মেয়ে নিয়ে অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন শ্যামার মা রাসমণি। কিছুই তিনি পান নি, সামান্য কিছু নগদ টাকা আর গহনাপত্র নিয়ে রাসমণিকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। শ্যামার বিয়ে সুন্দর যুবক নরেনের সঙ্গে। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই শ্যামার মোহভঙ্গ হয়—নরেন নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। পরদিন নরেনের দাদা দেবেন আর নরেনের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। শাশুড়ি ক্ষমাসুন্দরী হতবাক ও লজ্জিত। বিয়ের আটদিন পরে শ্যামা মায়ের কাছে ফিরে গেল। নতুন জামাই নরেনের স্বভাবচরিত্র ব্যবহার যে কতো নিষ্ঠুর ইতর যা বুঝতে শ্যামার যমজ বোন আর মা রাসমণির বাকি রইল

না। জামাই প্রায়ই আসত এবং তার উগ্র নীচ স্বভাব প্রকাশ পেতে লাগল। আর তখনি রাশভারি শাশুড়ি রাসমণি জামাইকে তর্জনী তুলে বললেন—'যাও, আভি নেকাল যাও।' সেই রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে নরেন সন্ত্রস্ত হয়ে পালাল। শ্যামাসুন্দরীর বিবাহিত জীবনের এই সূচনা।

শ্যামা এ ঘটনায় মনমরা হয়ে পড়ল। সে বুঝল তার জীবনে সর্বনাশ হতে চলেছে। মাস পাঁয়-ছয় পরে বিনা আমন্ত্রণেই নরেন বাবাজী এসে হাজির। রাসমণি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সেদিনই মেয়ে-জামাইকে বিতাড়িত করলেন। শ্যামা ও নরেনের আসা-যাওয়া বন্ধ হল না, কিন্তু শ্যামার প্রতি নরেনের দৈহিক ও মানসিক পীড়নও চলতে লাগল। শ্বশুরবাড়িতেও নরেন তাকে প্রহার ও অপমান করত।

কিছুদিন পরে নরেন-দেবেনদের বাড়িটা সরকার বাহাদুর কিনে নিলেন। সেখানে খিদিরপুর ডক হবে। অনেক জমিবাড়ি চলে গেল। নরেন দেবেন দু ভাই হাতে নগদ টাকা পেয়ে উচ্ছন্নে গেল। স্থির হল ক্ষমাসুন্দরীরা গুপ্তিপাড়ায় চলে যাবে।

গুপ্তিপাড়ায় জঙ্গলভরা পরিবেশে এক শিষ্যবাড়ির দৌলতে ক্ষমাসুন্দরী তার দুই পুত্রবধূ রাধারাণী (দেবেনের বৌ) আর শ্যামাকে (নরেনের বউ) নিয়ে সেই নির্বান্ধব জঙ্গলভরা গ্রামে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই তিন মেয়েমানুষের দিন আর কাটে না। রাত-বিরেতে ঝড়বৃষ্টিতে ভয় করে, হাতে পয়সা নেই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া আর কারুর কাছে তাঁরা প্রতিগ্রহ করেন নি কখনও, একথা ক্ষমাসুন্দরী প্রায় গর্ববোধ করে বলতেন--কিন্তু সে গর্ব আর বজায় রাখা গেল না। নিম্ন-জাতের পরিবারের থেকে সিধা, দান (আসলে ভিক্ষা) নিতে হল। ('কলকাতার কাছেই', পৃ. ২০)। তাঁতিগিন্নির দয়াতেই তাদের চলতে লাগল। কতো অপমান আর লজ্জা সয়ে তিনটি মহিলাকে এই সবকিছু নিতে হল। আর তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হল। নরেন ও দেবেন—দুই ছেলে তাদের খোঁজও নেয় না। একদিন দেবেন এসে তার স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে চলে গেল। রইল ক্ষমাসুন্দরী, ছোট বউ শ্যামা ও তার পুত্র। বিরাট বাড়ি হা-হা করে। কতো আপদবিপদ ঘটতে পারে। রাসমণির চিঠি এল—শ্যামার বোন উমার বিবাহ। কিন্তু শ্যামা গেল না। কোন্ মুখে খালি হাতে সে যাবে? কিন্তু উমার ফুলশয্যার দিন নরেন বহুদিন পরে এসে হাজির। নির্লজ্জ নরেন ভিখিরির মতো উমার বিয়েতে গিয়ে পড়েছিল, আর ছাঁদা বেঁধে নিয়ে এসেছে। তার মা বৌয়ের মাথা কাটা গেল কিন্তু নরেন নির্বিকার। রাসমণির জামাতা নরেন জানোয়ারেরও অধম।

রাশভারি রাসমণি উমার বিয়ে দিলেন। উমা ফুলশয্যার রাতেই স্বামী শরতের কাছে শুনল তার একটি রক্ষিতা আছে। তার কাছেই সে থাকে এবং থাকবে। এই অপরিসীম অপমান আর লাঞ্ছনায় উমার বিবাহিত জীবন শুরুতেই নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে নরেন এসে তার বউ শ্যামা ও শিশু হেমকে নিয়ে গেল। ক্ষমাসুন্দরী একা পড়ে রইলেন গুপ্তিপাড়ার জঙ্গলে।

লেখক যেভাবে রাসমণি ও ক্ষমাসুন্দরীর জীবনযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন তাতে পাঠকের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, ভাবে—এদের পরিবারে শাশুড়ি বউ নাতির আর কতো অপমান

ঘটবে। তা ঘটে এবং তার কোনো ক্ষান্তি নেই যেন। পদ্মগ্রামের সরকার বাড়িতে নরেন একটা দেবসেবার কাজ নিয়েছে, থাকে একটি বদ্ধ ঘরে, সেখানেই তাঁর বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে গেল। রাসমণি যতই রাশভারি হন, আর বাধা দিতে পারলেন না।

রাসমণির জীবনে এখন আছে কেবল শূন্যতা আর হাহাকার। বাধ্য হয়ে একটি ছোট ছাপাখানার জন্যে একতলার একটা ঘর ভাড়া দিলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী-পরিত্যক্ত উমা—দুজনের সংসারে নেই কোনো আনন্দ। ওদিকে পদ্মগ্রামে মূল বাড়ির পিছনে একটি বদ্ধ ঘরে ওঠে নরেন, শ্যামা, তাদের দুই ছেলেমেয়ে মহাশ্বেতা আর হেম। সেখানেও নরেনের হাতে শ্যামার লাঞ্ছনার শেষ নেই। পদ্মগ্রামের সরকারগিন্নি মঙ্গলার আশ্রয়ে উঠেছে তারা। তিনিই তাদের সব মুশকিল-আশান করেন। তাঁর দয়াতেই শ্যামার অন্ন জোটে। নরেনের কোনো খোঁজ নেই।

কোনো উপায় না দেখে শ্যামা ছেলেমেয়ে নিয়ে চার ক্রোশ পথ হেঁটে মা রাসমণির বাড়িতে পৌঁছয়। সেখানে আছে বোন উমা। তারও দিন চলে না। তাদের হাভাতে চেহারা দেখে রাসমণি কপালে করাঘাত করেন। কিন্তু দুই বোনের মধ্যে মিল হয় না। "সে রাতে প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ওপরে জাগে উমা, নিচে জাগেন রাসমণি।" (পৃ. ১০৭)

পাতার পর পাতা কাহিনি এগিয়ে চলে। সরকার-গিন্নির দয়ায় শ্যামা তার ছেলে হেমের উপনয়ন দেয়, মেয়ে মহাশ্বেতাকে পাত্রস্থ করে। তার স্বামী নরেনের কোনো পাত্তা নেই। মাঝে মাঝে আসে, হম্বিতম্বি করে, আবার উধাও হয়ে যায়। কষ্টের শেষ নেই, অপমানের শেষ নেই, দুশ্চিন্তার শেষ নেই—এভাবেই শ্যামাসুন্দরীর জীবন কাটে। ভরসা সরকারগিন্নি মঙ্গলা। নরেন দেবপূজা করে না, সে কাজটা তো এখন হেম করতে পারে। এতেই হয়তো শ্যামা জীবনধারণ করতে পারে। নরেনই খবর আনলে তার বড় ভায়রাভাই মারা গেছে, শ্যামার ভগিনী কমলা বিধবা হয়েছে। শ্যামা শিউরে ওঠে, নরেন হ্যা-হ্যা করে হাসে। নরেনের কথায় উল্লাসের স্বর ফোটে। তা প্রমাণ করে নরেন কত নীচ, কত নিষ্ঠুর। আর উমার চিঠিতে শ্যামা জানতে পারে রাসমণি পাথর হয়ে গেছেন—'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'। (পৃ. ১২৭)

এই উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকের কেবলই মনে হয় এইসব চরিত্রের জীবনে সদা দুঃখের নদী প্রবাহিত হয়। নেই কোনো সুখ, নেই কোনো আনন্দ।

আশ্রয়দাত্রী সরকারগিন্নি মঙ্গলার সাহায্যে ও দয়ায় শ্যামার বড় মেয়ে মহাশ্বেতার বিয়ে হয়ে গেল। হঠাৎই এসে পৌঁছল নরেন, খানিকটা চিৎকার করল। শ্যামা এতদিন স্বামী নরেনের হাঁক-ডাককে ভয় পেত। সেই ভয় ঘুচিয়ে শ্যামা সাহসী হয়ে উঠল। নরেনকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। নরেন কোনো টাকা দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করলে শ্যামা হ্যাঁচকা টেনে নরেনের গেঁজেটা টেনে বার করলে। ঝন্‌ঝন্ করে টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়ল। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে শ্যামা নরেনকে এক চড় মারলে, তারপরই টাকাগুলি কুড়িয়ে নিল।

শ্যামার এই সাহসিক কাজের বর্ণনা দিয়ে লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"বহুদিনের

বহু সঞ্চিত ক্ষোভ, স্বামীর অমানুষিক অত্যাচারের জন্য সমস্ত তিক্ততা ওর অন্তরে যা জমেছিল এত কাল—তা যেন ওই চড়ের শক্তি ও প্রেরণা জোগাল নিজের অজ্ঞাতসারে, সম্পূর্ণ অতর্কিতে।" (পৃ. ১৩৫)

এখানেই গজেন্দ্রকুমার মিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গণ্ডী ছাড়িয়ে এসেছেন। শরৎচন্দ্রের গ্রামসমাজ-নির্ভর তিক্ত উপন্যাসগুলিতে অত্যাচারিতা নারীচরিত্ররা এই সক্রোধ প্রতিবাদ দেখাতে পারেনি। গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্যামা-চরিত্রে তা দেখিয়েছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে শ্যামা কতো আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসিকা। পরদিন অপমানিত লাঞ্ছিত নরেনের আকস্মিক অন্তর্ধান, যাবার সময়ে একখানা নতুন কোরা কাপড় (দাম তেরো আনা) চুরি করে পালাল।

মহাশ্বেতার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি দেখে সে ঘাবড়ে গেল। ঝুপসী বাগান, জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে নিচু নিচু পুরোনো ঘর। একটিই ঘর। পাশের ঘরটা আংশিক ভগ্ন।

শুরু হল সাত বছরের মেয়ে মহাশ্বেতার নতুন জীবনযাত্রা। মহাশ্বেতা চিনত দুটি বাড়ি। এক, কলকাতায় দিদিমার বাড়ি, পদ্মগ্রামে সরকার বাড়ি। মৌড়ীগ্রামে তার এই শ্বশুরবাড়ি। স্বামী অভয়পদ, বয়স চব্বিশ। বিলিতি কারখানায় কাজ করে, ঊনিশ টাকা আন্দাজ মাস-মাইনে পায়। ধীরে ধীরে মহাশ্বেতা তার স্বামীকে চিনতে বুঝতে পারে। অল্পভাষী, গম্ভীর, পরিবারের বড় ছেলে, সংযত। শাশুড়ি ক্ষীরোদা তাকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের বিগ্রহ আছে—রাধা-দামোদর—এ বংশের তিন ঘরের ঠাকুরসেবার পালা পড়ে। এবার তাদের পালা আসছে। মহাশ্বেতা আনন্দময়ীতলায় ঠাকুর দেখেছে, বাগবাজারে মদনমোহন দেখেছে, দক্ষিণেশ্বরে কালী দেখেছে, সরকারবাড়ির ঠাকুর দেখেছে। সে সব মন্দির ও দেবতা কতো সুন্দর। আর এই ঠাকুর—ছোট্ট আঁধার ঘরে নিচু বেদির ওপর ন্যাড়াবোঁচা দুই মূর্তি, কেষ্ট আর রাধা। পেতলের মূর্তি।

ভাঙা ঘরবাড়ি আত্মীয়জন আর ঠাকুরঘর দেখে শ্যামা বুঝতে পারল সে এসে পড়েছে এক নতুন জগতে। এখান থেকেই শুরু হল তার জীবনযাত্রা। ধীরে ধীরে সে হয়ে উঠল এই ত্রিলেখ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র—শ্যামা ঠাকরুন। আজ তার বয়স ঊনআশি। ঝুপসি গাছপালায় ঢাকা বাড়ির মালিক শ্যামা একাই বাস করেন—উপন্যাস-মালার শেষে লেখক এখানেই পাঠককে পৌঁছে দেন।

শ্যামার নতুন জীবন কি রকম? দারিদ্র ভরা নিস্তরঙ্গ জীবন। "একটানা দারিদ্রের মধ্যে শ্যামার দিন তেমনি একঘেয়ে ভাবেই কাটে। তেমনি প্রতিদিনের যুদ্ধ। পরের দিনের কথা ভেবে প্রায় প্রতি রাত্রেই তেমনি দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত থাকা।" (পৃ. ১৭৮) শ্যামার দুই ছেলে—হেম আর কান্তি। মহাশ্বেতা, ঐন্দ্রিলা আর তরু শ্যামার তিন মেয়ে।

মহাশ্বেতার স্বামী অভয়পদ, দেবর অম্বিকাপদ আর দুর্গাপদ। অম্বিকাপদর স্ত্রী প্রমীলা, দুর্গাপদর স্ত্রী তরলা।

আমরা জানি, রাসমণির বড় মেয়ে কমলা, শ্যামা মেজ মেয়ে, উমা ছোট মেয়ে।

কি রাসমণির তিন মেয়ে, কি শ্যামার ছেলেমেয়ে, কি মহাশ্বেতার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা—এদের সকলেরই সংসার চলে নিস্তরঙ্গ স্রোতের মতো। কলকাতা শহর থেকে

কিছুদূরে পাড়াগাঁ অথবা আধাশহর আধা পাড়াগাঁয়ের জীবন। এদের না আছে শিক্ষাদীক্ষা, না আছে পরিমার্জিত রুচি, না আছে জীবনের মহৎ মূল্যবোধ। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ, স্নেহ—তারও একান্ত অভাব। লেখক এই নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম্য মানুষগুলির জীবনের ছবি এঁকেছেন। "দরিদ্রের সংসারে, যেখানে যত অভাব, সেখানে তত সচ্ছলতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন কর্মকর্তারা। অভয়পদর বাড়িতেও তার অন্যথা হয়নি।" (পৃ. ১৪৫)

শ্যামার স্বামী নরেন কখনো আসে—ভবঘুরে উড়নচণ্ডী দুর্ব্যবহারকারী। আবার চলে যায়। কবে আবার আসবে কেউ জানে না। অভয়পদর মেজ ভাই অম্বিকাপদর চাকুরি হল অভয়পদর আপিসেই। আর শ্যামার ছেলে হেমকে অভয়পদ একটা সামান্য চাকরিতে ঢুকিয়ে দিল। যজমান অক্ষয়-মঙ্গলার চেষ্টায় শ্যামার মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার বিয়ে হয়ে যায়। হেমেরও বিয়ে হয়ে যায় কনকের সঙ্গে।

'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের শেষ দৃশ্য রাসমণির মৃত্যু। রাসমণি তাঁর যাবতীয় পার্থিব সম্পদ বাসনপত্র তিন ভাগে ভাগ করে তিন মেয়েকে—কমলা, শ্যামা আর উমাকে দিয়ে দিলেন। রাসমণি দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছিলেন। হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, অ্যালোপাথ—তিনেরই চিকিৎসা বিফল হল। গহনা ছিল সামান্যই—কয়েকটা গিনি, একটা সাতনরী হার, একজোড়া বড় কান পাশা, দু জোড়া ঝুমকো, একগাছা বালা আর কিছু কুঁচো সোনা, গোটা দুই আংটি, একটা হীরের নাকছাবি, একটা মুক্তোর নথ। সবকটি তিনি তাঁর বিবেচনা মতো মেয়েদের দিয়ে দিলেন।

এবার চিরবিদায়ের পালা। পূর্ণিমার দিন ভোরবেলায় মারা গেলেন রাসমণি। মৃত্যুর পূর্বে রাসমণি নাম করতে থাকেন।

"দীর্ঘদিনের বিপুল ব্যথা-বেদনার সঞ্চার নিয়ে রাসমণি কোন্ অজানা সান্ত্বনার পথে যাত্রা করলেন, তা কে জানে!" (পৃ. ২২৯)

এখানেই প্রথম পর্ব 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের সমাপ্তি।

তিন

দ্বিতীয় পর্ব 'উপকণ্ঠে', তৃতীয় পর্ব 'পৌষ ফাগুনের পালা'। এ দুই পর্বে শ্যামাঠাকরুন চরিত্রেরই প্রাধান্য। দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি শ্যামার স্বামী চির ভবঘুরে নরেনের মৃত্যুতে। তৃতীয় পর্বে নিজের বাড়িতে উনআশি বছরের শ্যামার দিন গুজরান। তখন তার পাশে কেউ নেই। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী কেউ তার পাশে নেই। সম্পূর্ণ একাকি শ্যামা। ঝুপসি গাছে বাগান ভর্তি, দালানে নারকেল পাতা ভর্তি এই বাড়িতে প্রহর গণনা করেন।

'উপকণ্ঠে' উপন্যাসে ছড়ানো আছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার প্রভাব পড়ে সব শ্রেণির মানুষের জীবনে। তা থেকেই পাঠক দেশকালের পটভূমি জানতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ রদ ও মহারানীর নাতি—নতুন রাজা ভারতে আসছেন। সেদিনকার ভারতের রাজধানী কলকাতা। রাজভক্ত প্রজাদের মানসিকতার পরিচয় দু-চার কথায় লেখক দিয়েছেন:

"রাজা নাকি বাঙালিদের বড় ভালোবাসেন ('ভারতীয়' শব্দের তখন ব্যবহার ছিল না, ব্যাপক অর্থেও বাঙালিকে বোঝাত, আবার হিন্দু শব্দের বদলেও 'বাঙালি' কথার ব্যবহার ছিল)।" ('উপকণ্ঠে', পৃ. ২৪)

বিলেত থেকে নতুন রাজা কলকাতায় আসছেন। তাকে নিয়ে নানা অবান্তর এবং অবাস্তব কাহিনি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে সুদূর পল্লীগ্রামের ডোবার জলেও যেন তরঙ্গ তুলেছে, এখানকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কূপমণ্ডূকের জীবনেও জাগিয়েছে বহির্বিশ্বের কৌতূহল। রাজাকে দেখতে হবে। এ দুর্লভ সুযোগ ছাড়া হবে না। আর কি এ সুযোগ মিলবে?' (তদেব, পৃ. ১৪)

শ্যামা ঠাকরুনের বড় মেয়ে মহাশ্বেতাও বায়না ধরে, স্বামী অভয়পদকে বলে, 'আমাদের বাপু রাজা দেখাতে হবে।' আর মহাশ্বেতার শাশুড়ি স্মৃতিমন্থন করে বলেন—'মা'র মুখে শোনা,—জানো মেজ বৌমা, কথাটা উঠল যে সেপাইরা নাকি সায়েব দেখছে আর কাটছে।' একথা ক্ষীরোদা শুনেছিলেন নিতান্ত শৈশবে। এ সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের গল্প। আজ এতদিন পরে মহারানীর নাতি নতুন রাজা আসছেন রাজধানী কলকাতায়। কলকাতায় অভয়পদ-অম্বিকাপদর মামার বাড়িতে গিয়ে তারা উঠবে। মানিকতলায় মামাশ্বশুরের বাড়ি গিয়ে মহাশ্বেতা প্রমীলা রাজা দেখবে—এই ব্যবস্থাই হল। হাওড়া থেকে ঘোড়ার গাড়িতে (ভাড়া আট আনা) বড়বাজার, সিঁদুরে পট্টি, নতুন বাজার, ছাতুবাবুর বাজার, মানিকতলা স্ট্রিট পেরিয়ে মামাশ্বশুরের বাড়িতে তারা পৌঁছল।

এই বর্ণনাটুকু থেকেই পাঠক সেকালের কলকাতার পরিচয় পেয়ে যায়। সেই বাড়িতেই দেখা হল প্রবীণ মামাশ্বশুরের সঙ্গে। আর সুন্দরী রতনকে (অভয়পদর মামাতো বোন)। তাকে নিয়ে অনেক রহস্য—তা ভেদ হয় পরবর্তীকালে। ক্রমশ তারা জানতে পারল দিদিঠাকরুন রতনের একজন 'বাবু' আছে। তিনিই আসেন রোজ রাতে, ভোরে চলে যান। মামীশাশুড়ির সঙ্গেও তাদের দেখা হল। তিনি মূর্তিমতী বিষাদিনী, এককালে অন্তত সুন্দরী ছিলেন, এখন কংকালসার দেহ, একটুতেই তাঁর দু চোখ দিয়ে জল পড়ে।

রাসমণির ও তার মেয়েদের কাহিনি সংক্ষেপে জানিয়েছেন লেখক তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায়। এই বিবরণ থেকে পাঠক মূল প্লটের আভাস পেয়ে যায়। এটাই লেখকের কৌশল—কাহিনি বলতে বলতে থেমে গিয়ে তার মূল কাঠামোটার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন।—

'শ্যামার মা রাসমণি জমিদারের স্ত্রী হয়েও ভাগ্যচক্রে একই সঙ্গে স্বামী শ্বশুরবাড়ি এবং স্বামীর ঐশ্বর্য সব হারিয়ে বসেছিলেন। শুধু পেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব অলংকার এবং কাঁঠালকাঠের দুই বড় সিন্দুক বোঝাই কাঁসার বাসন। তাইতেই তিনি দীর্ঘকাল স্বতন্ত্রভাবে আলাদা বাড়িভাড়া করে সম্ভ্রান্ত বংশের গৃহিণীর মর্যাদাতেই জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তবে তিনি বেঁচেও ছিলেন অনেকদিন। তাই তাঁর মৃত্যুর সময় বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে তিনি যেদিন চোখ বুজলেন সেদিন তাঁর স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যা উমা চোখে অন্ধকার দেখল। তার স্বামী শরৎ এক বিচিত্র মানুষ। সে ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের পরিবর্তে শুনিয়ে দিয়েছিল যে সে এক

রক্ষিতাকে ভালোবাসে—এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসতে সে পারবে না। মা জ্বালাতন করছিল বলেই সে উমাকে বিয়ে করেছে। এবং সত্যিসত্যিই তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক সে রাখে নি। শাশুড়ির নির্যাতন অসহ্য হওয়াতে যখন পাশের বাড়ির একটি মহিলা তাকে উদ্ধার করে এনে রাসমণির কাছে রেখে যান তখনও সে কোনো খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করেনি। অবশ্য তারপর দু-একবার দেখা হয়েছিল বৈকি। মা যেদিন মারা যান সেদিনও সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, হয়তো বা কিছু সাহায্যও করতে পারত, কিন্তু যে স্বামী কোনোদিন তাকে—ভালোবাসা দূরে থাক্—স্পর্শ পর্যন্ত করলে না, যে স্বামী স্পষ্টতই এক বারনারীর প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন—তার কাছ থেকে অবহেলিত দেহটাকে রক্ষা করার জন্য পয়সা ভিক্ষা করার চেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলাও যে ঢের সহজ! না, উমা সে ভিক্ষা চায় নি।

অথচ সেদিন আর কোনো আশ্রয় ওর ছিল না। রাসমণি তিনটি মেয়েরই বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সত্য—কিন্তু কারুরই নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। উমার বড় বোন কমলা অবস্থাপন্ন চরিত্রবান লোকের হাতেই পড়েছিল কিন্তু অত্যন্ত অকালে বিধবা হওয়ার ফলে সেও আজ নিরাশ্রয়। সামান্য গহনা বেচে কটি টাকার সুদে কায়ক্লেশে তার সংসার চলে। উমার যমজ বোন শ্যামা—তার স্বামী নরেন তো আরও অমানুষ। সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে ভিখারির পর্যায়ে দাঁড় করিয়েও সে থামে নি। একেবারেই পথে বসত ওরা, কোনোমতে পদ্মগ্রামের সরকার বাড়িতে নিত্য সেবার কাজটা যোগাড় হয়েছিল তাই মাথা গোঁজবার মতো একটু আশ্রয় এবং দৈনিক আধসের আতপ চালের এই ব্যবস্থাটুকু হয়েছে। তাও সে কাজটুকুও তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। ঠাকুরের ভার একরকম ঠাকুরের নিজের ওপরই। সমস্ত সংসারের ভার তরুণী স্ত্রীর ওপর তুলে দিয়ে অনায়াসে সে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করত এবং মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ এসে তাদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসিয়ে, এমন কি কিছু চুরি করেও আবার গা-ঢাকা দিত।

সুতরাং কার কাছে যায় উমা? শুধু দেহধারণের প্রশ্নই নয়। নবীন বয়স এবং অসামান্য রূপ, এই দুটি পরম শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয়ও চাই।

অগত্যা কমলার কাছে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। সিমলের কোনো সংকীর্ণ গলির এক প্রাচীন বাড়ির একতলায় দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া করে দুই বোন তাদের জিনিসপত্র নিয়ে কোনোমতে মাথা গুঁজে ছিল। উমা দু-এক টাকা মাইনের কয়েকটি টিউশনি করত, আর কমলার ছিল মাসিক ষোলটি টাকা বাঁধা আয়। তাইতেই কোনোমতে চলত ওদের। এরই মধ্যে গোবিন্দর (কমলার ছেলে) লেখাপড়া শেখার খরচাও ছিল। সুতরাং অবসর বস্তুটি ওদের জীবনে একেবারেই ছিল না—না চিন্তার, না বিলাসের।—তবু সেই অন্ধকার ঘরেও একদা খবরটা এসে পৌঁছয় 'রাজা আসছেন'। (পৃ. ৩২-৩৩, 'উপকণ্ঠে')

হঠাৎ ভগ্নীপতি নরেন (শ্যামার স্বামী) এসে হাজির। তাকে নিয়েই উমা কমলা গোবিন্দ ঘোড়াগাড়ি চড়ে বৌবাজার ধর্মতলা হয়ে এসপ্লানেডে সাহেব-পাড়ার আলো দেখে

পাঁচঘণ্টা বাদে ফিরল। ভাড়ার পাঁচটা টাকা নরেন দিল না, কমলা উমাকেই দিতে হল। 'রাজা' আসছে বলে আলোর উৎসব দেখেই তাদের ফিরতে হল। উমা-কমলার দুঃখের রাত তাতে আলোকিত হয় না।

কমলার ছেলে গোবিন্দ অনেক দিন জ্বরভোগের পর পথ্য পেলে। ডাক্তারের পরামর্শ 'চেঞ্জে' পাঠাও। শ্যামার ভাশুর দেবেন বিহারের এক গঞ্জে ডাক্তারি করে। তার জন্যে ডিগ্রির দরকার নেই, দুটো বোলচাল আর দুটো বোতলে রাখা জল নিয়েই সে চিকিৎসা করে। শ্যামার পরামর্শে কমলা তার ছেলেকে সেখানেই পাঠালে। সে তখনো জানে না এরপর গোবিন্দর জীবনে কী ঘটতে পারে। দুই বোনের আপত্তিতে শ্যামা কান দেয় না।

লেখকের একটি মন্তব্যের আলোকে শ্যামা-চরিত্র ঝলসে ওঠে—

'সংসারের বাস্তব পাঠশালায় শ্যামা এই জ্ঞানটি লাভ করেছে—সহস্র অভিজ্ঞতার ফল এটা। প্রয়োজনের কাছে কিছুই বড় নয়—দুটো কথা তো তুচ্ছ। গালাগাল গায়ে বেঁধে না, দুর্নাম তো নয়ই। অপমানের জ্বালা? ক্ষুধার জ্বালা তার চেয়ে ঢের বেশি সত্য, ঢের বেশি বাস্তব। যাদের পেট ভরা আছে, তারাই মানুষের 'কথা' নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে। শ্যামা আবারও কণ্ঠস্বরে জোর দেয়, "রেখে বোস দিকি। কে কী বলবে আর কে কি ভাববে সে কথা এখন ভাববার সময় নয়। যেমন করে হোক ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো।" (তদেব, পৃ. ৪৯)।

এখানেই শরৎচন্দ্রের গ্রামভিত্তিক জীবনে দারিদ্র-জর্জরিত নারীচরিত্রের সঙ্গে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নারীচরিত্রের তফাত।

নরেনের দাদা দেবেনের কাছে গিয়ে হাজির নরেন। এবং সে-ই গোবিন্দ তথা কমলার সর্বনাশটা ঘটাল। সেই দূর অঞ্চলে নরেন গোবিন্দর একটি বিয়ে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কমলাকে।

এই উপন্যাসে নরেন-চরিত্রটি বিশুদ্ধ স্কাউড্রেল। দেবেন এল তার স্ত্রী রাধারানীর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। আর নরেনের কুকীর্তির জন্য নরেনকে গাল দিলে। তার পরদিনই হাওড়া স্টেশন থেকে ঘোড়াগাড়িতে এসে হাজির হল গোবিন্দ—সঙ্গে নববিবাহিতা স্ত্রী তারা। গোবিন্দর কাছে জানা গেল, এ ব্যাপারটায় নরেন দেবেন দুজনেরই হাত আছে। কমলা আর একবার ভাগ্যের হাতে প্রস্তুত হয়ে চোখের জল ফেললে।

সরকার-বাড়িতে গৃহদেবতার পুজো করে শ্যামার ছেলে হেম। খুবই কষ্টের মধ্যে শ্যামার দিন কাটে। "আজকাল শ্যামার দিন কাটে অবিচ্ছিন্ন একটিমাত্র চিন্তার মধ্য দিয়েই। সেটা হল অর্থচিন্তা।" (পৃ. ৫৯) হেম কাজ করে রংকলে। মাইনে পনের টাকা। দেড়ক্রোশ হেঁটে যায় সকাল সাতটায়, ফেরে সন্ধে ছ'টায়। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে উড়নচণ্ডী নরেন আসে। যা পায় তা-ই নিয়ে পালায়। এই হতভাগ্য স্বামী নরেনকে শ্যামা ঝাঁটা মেরে ফেরাতে পারে না। তাকে খেতে দিতে হয়। তার সঙ্গে শুতেও হয়। শ্যামার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। বড় মেয়ে মহাশ্বেতার সঙ্গে বিয়ে হয় অভয়পদর। মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে হরিনাথের।

শ্যামার জীবনে এই বড় জামাই (অভয়পদ) যথার্থ সহায়ক হয়ে ওঠে। সে আপাত

নির্লিপ্ত। নিজের সংসারেও নির্লিপ্ত। বেশি কথা বলে না, কিন্তু অনেক সময়েই শ্যামার মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়ায়।

লেখক মাঝে মাঝেই সমাজে রাষ্ট্রে বড় বড় ঘটনার বিবরণ দিয়ে পাঠককে সচেতন করে দেন। প্রথম বিশ্বসমরের ফলে সুদূর বঙ্গদেশে কলকাতায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মহাশ্বেতার ছোট দেওর দুর্গাপদ খবর আনে যুদ্ধের। (পৃ. ৭০)

শ্যামার কন্যা ও পুত্রদের সুবাদে তার সংসারের ডালপালা ছড়িয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে নানা সংবাদ আর গুজব শহর কলকাতা ও উপকণ্ঠে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অধিকাংশ লোকেরই ভূগোলের জ্ঞান খুব কম। কোথায় অস্ট্রিয়া, কোথায় জার্মানি, কোথায় মহারানির রাজপাট বিলেত—তারা কিছুই ধারণা করতে পারে না। কেবল জানে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

'উপকণ্ঠে' উপন্যাসে শ্যামার জীবনযাত্রাই প্রাধান্য পায়। পুত্র হেমের চাকরি যাওয়া, কন্যা ঐন্দ্রিলার শ্বশুরের মৃত্যুর পরে পরেই তার কন্যার জন্ম হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা—এসবই শ্যামাকে আঘাত করে। তবু সে দারিদ্র অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করে। আর খুব গোপনে টাকা সঞ্চয় করে। একটি দুটি করে টাকা জমায়। আজ তার পরিমাণ ছ শ' টাকা। "সে টাকাতে শ্যামা প্রাণ ধরে হাত দিতে পারবে না।... ধীরে ধীরে একটু একটু করে মনের সঙ্গোপনে একটি অতিশয় উচ্চাভিলাষ বাসা তুলেছে তার মধ্যে।" (পৃ. ৮৩)

শ্যামার পক্ষে তা অসম্ভব, একান্ত দুরাশা—অথচ মনে মনে সেই অসম্ভবকে লালন করে : তার নিজের একটি বাড়ি হবে। সেই স্বপ্ন সম্ভব করার পথে বড় সহায়ক হয়ে দাঁড়াল তার বড় জামাই অভয়পদ। সে ধীর, স্থির, সংযতবাক, কিন্তু তার শাশুড়ির পরিবারটিকে যতটা পারে সাহায্য করে, যেমন করে নিজেদের পরিবারকেও। (পৃ. ২০৮-৯)

শ্যামার বড় ছেলে হেমকে অভয়পদ থিয়েটারে গেটকিপার করে দেয়। সেই সূত্র ধরে হেমের জীবনে ঘনিয়ে এল অশেষ সুখ আর অশেষ দুঃখ। থিয়েটারের মালিকের রক্ষিতা নলিনী। ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে হেমের পরিচয় ঘটে। তা ক্রমশ গাঢ় হয়। শেষপর্যন্ত নলিনীর প্রলোভনে ধরা দেয়। এবং নলিনীর মা একদিন দুপুরে ব্যাপারটা ধরে ফেলে। যখন তার আসার কথা নয়, সেই দুপুরে এসে নলিনী-হেমকে একত্র দেখে চরম ধিক্কার দেয়।

অপর দিকে ঐন্দ্রিলার শ্বশুরবাড়ির দিন শেষ হয়। সে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বাড়িতে পাচিকার কাজ করে বেড়ায়।

শ্যামার মেজ ছেলে কান্তি। শ্যামার বড় জামাই অভয়পদর মামাতো বোন রতন থাকে কলকাতায়। তার কাছেই শ্যামা কান্তিকে পাঠায়। রতনের বাড়িতে থেকে সে কলকাতার ইস্কুলে লেখাপড়া শিখবে। রতনের বাড়িতে তিনতলায় একটি ঘরে কান্তি থাকে। এ বাড়িতে 'বুড়োকত্তা' রতনদির বাবা আছেন। তিনি থাকেন একতলায়। দোতালায় রতনের রাজত্ব। কান্তি প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেনি। রতনের খাস পরিচারিকা মোক্ষদার কাছে অনেক কথা শুনল যা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। রতনদির একটি বাবু আছেন,

তিনি সন্ধের পর আসেন, শেষ রাতে চলে যান। তখন কান্তির নিচে নামা মানা।

কান্তির চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে যায়। সে যে রামবাগানে থাকে—একথায় তার সহপাঠীরা তাকে বিদ্রূপ করে। শিক্ষক ধীরেনবাবু ওকে সাবধান করে দেন—আসল ঠিকানা বোলো না, বলবে বিডন স্ট্রিট কি মানিকতলা স্ট্রিট। রতনদির আগে একটি 'বাবু' ছিল, এখন অন্য 'বাবু'। কান্তি ঠিক বুঝতে পারে না। রতনদির কি দুই বিবাহ? কান্তি বোঝে না, কিন্তু ধীরে ধীরে তাকে সবই বুঝতে হয়। রাতের আর সকালের রতনদি যেন অন্য মানুষ। সকালে স্নান সেরে যখন বেরোয় তখন রতনদি অন্য মানুষ—স্নেহশীলা দিদি। (''উপকণ্ঠে', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

রতনের বাবু একদিন রতন ও কান্তিকে অসম্বৃত অবস্থায় ধরে ফেলে এবং কান্তিকে চাবুকের পর চাবুক মেরে অর্ধমৃত করে দেন। তারপর তাকে কলকাতা থেকে দূরে আরামবাগে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়। সে বধির হয়ে যায়। আরামবাগের যে স্কুলে কান্তি ভর্তি হয়েছিল, সেই স্কুলের শিক্ষক বদ্ধকালা কান্তিকে তার বাড়িতে ফেরত দিয়ে যান। শ্যামার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। (পৃ. ১৫০-১৫৪, পৃ. ১৭৩-১৮৭, পৃ. ১৯৮-২০৭, ২৭৫-২৭৮)

শ্যামার বড় ছেলে হেমও থিয়েটারের গেট-কিপার। প্রধান গেট-কিপার। পাট বা শট-লেখক দক্ষিণাদাই এখানে তার অভিভাবক। তারই পরামর্শে হেম চাকরি বাঁচিয়ে চলে। থিয়েটারের মালিক রমণীবাবুর রক্ষিতা নলিনীর সঙ্গে হেমের ঘনিষ্ঠতা ও তার অবসানের কথা ঈষৎ পূর্বেই লিখেছি।

এদিকে শ্যামাঠাকরুনের জীবনেও অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে। শ্যামার ছেলেমেয়েদের একের পরে এক বিয়ে হয়ে যায়। বড় ছেলে হেম, বড় মেয়ে মহাশ্বেতা, মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলা, ছোট মেয়ে তরুর বিয়ে হয়ে যায়। নিতান্ত অভাবের সংসার, কোনোমতে একটা পাত্র জোটানো ও কোনো মতে বিয়ের খরচ চালানো—সবকিছুই শ্যামার ঘাড়ে এসে পড়ে। তার স্বামী নরেন উদ্ভ্রান্ত, চিরপলাতক, দায়িত্বজ্ঞানহীন, আট-দশ মাস পরে পরে আসে,খানিকটা চেঁচায়, কিছুদিন পরে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শ্যামার সব কাজে সব বিপদে সাহায্যকারী তার বড় মেয়ে মহাশ্বেতার স্বামী অভয়পদ। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে এইরকম একটি সংযতবাক নির্ভরযোগ্য কর্মনিষ্ঠ চরিত্র আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর শ্যামা-নরেনদের আশ্রয়দাতা যজমান অক্ষয়বাবু ও তার স্ত্রী মঙ্গলা নানাভাবেই ভাগ্যের মার খাওয়া শ্যামাকে সাহায্য করেন।

'উপকণ্ঠে' উপন্যাসে সবচেয়ে হতভাগিনী চরিত্র শ্যামার ভগিনী উমা। তার বিয়ে হয়েছিল শরতের সঙ্গে। সে ফুলশয্যার রাতেই জানিয়েছিল তার একটি রক্ষিতা (গোলাপী) আছে, তারই কাছে সে সমর্পিতচিত্ত। নেহাত মায়ের পীড়াপীড়িতে তাকে বিয়েটা করতে হয়েছিল। এই উপন্যাসে আমরা দেখি উমা একাই আপন জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত। কারুর সাহায্য সে পায় নি, চায় না। বেলা এগারোটায় ভাত খেয়ে বেরোয়। সন্ধে পর্যন্ত বিভিন্ন বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করে—অল্পবিদ্যায় সে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়। সে ইংরেজি জানে না। তাই তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আয়ও সীমাবদ্ধ। দুটাকা চারটাকা পাঁচ টাকা করে যা পায়, তাই

দিয়ে কোনক্রমে তার জীবন কাটে। এই উপন্যাসে লেখক তাকে দয়া করেছেন। রক্ষিতার মৃত্যুর পর শরতের জীবনও আর চলে না। একটা ছাপাখানা ছিল, তাতেই তার চলত। সে অক্ষম হয়ে একটা গলির মধ্যে ঘুপচি বাড়িতে একটি ঘরে মাথা গুঁজে দিন কাটায়, ছাপাখানা লীজ দিয়ে তার জীবন চলে। শেষ পর্যন্ত উমার সঙ্গে শরতকে লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন। উমা তাকে প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু কোনো দেহ-সম্পর্ক ও ভালোবাসা-সম্পর্ক স্থাপন করে না। সম্পর্ক কেবল সহানুভূতি। দুটি ছত্রভঙ্গ নরনারী শেষ জীবনে কাছাকাছি আসে, এই পর্যন্ত।

লেখক এভাবেই প্রথম মহাসমর-পরবর্তী কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের গ্রামের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব 'উপকণ্ঠে'-র শেষে চিরপলাতক দায়িত্বজ্ঞানহীন নরেনের মৃত্যু ঘটেছে।

হঠাৎই নরেন একদিন হাজির হয় শ্যামার বাড়িতে। শ্যামার জীবনে নরেন কোনো আশ্রয় নয়, আনন্দদায়ক অবসর নয়, মূর্তিমান আপদ। উদ্ভ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ নরেন এবার ধুঁকতে ধুঁকতে আসে। শয্যায় পড়ে। লোক চিনতে পারে না। ছেলে হেম, হেমের স্ত্রী কনক—কাউকেই চিনতে পারে না। ছেলে জামাই মেয়ে—সবাই মৃত্যুপথযাত্রীকে নামগান শোনায়। এবার নরেনের চিরবিশ্রাম উপনীত। এতদিন সে আশ্রয় খুঁজেছে, স্বভাবদোষে তা পায়নি। ধীরে ধীরে নরেন ঝিমিয়ে আসে, অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। (পৃ. ৩১৭)। এখানেই 'উপকণ্ঠে' উপন্যাসের সমাপ্তি।

চার

শেষ পর্ব 'পৌষ ফাগুনের পালা'। রাসমণির ছোট মেয়ে উমার জীবন সর্বার্থে ব্যর্থ। তাই বড় ও মেজ মেয়ে কমলা ও শ্যামার সংসার নিয়েই গড়ে উঠেছে ত্রিলেখ। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে কমলা ও শ্যামার দারিদ্র-ক্লিষ্ট জীবনের কাহিনির শেষাংশ 'পৌষ ফাগুনের পালা'। লেখক অনায়াস দক্ষতায় সামলেছেন। কমলা ও শ্যামার ক্রমবর্ধমান পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় মানুষজনের কাহিনিতে বৈচিত্রর অভাব নেই। সারা জীবন এরা দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়েছে কিন্তু অশিক্ষা-অল্পশিক্ষায় তাদের মানসিকতা, চিন্তার কোনো ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায় না। এরা সংস্কার ও সংস্কৃতিতে উন্নত—একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

তবু কখনো কখনো একটি দুটি চরিত্রে জীবনের সুমধুর প্রকাশ দেখা যায়। যেমন অভয়পদ-মহাশ্বেতার মেয়ে স্বর্ণলতা আর অম্বিকাপদর স্ত্রী প্রমীলার বোনপো অরুণ। সারা ত্রিলেখে অশিক্ষা, গ্রাম্যতা, স্থূলতা ও ইতরতার ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় একটি উজ্জ্বল রামধনু তৈরি করেছে এই দুটি চরিত্র—স্বর্ণলতা আর অরুণ। স্বর্ণলতাদের বৃহৎ পরিবারে এসে পড়েছিল প্রমীলার বোনপো অরুণ। চারপাশে সমবয়স্ক কিশোর-কিশোরীর কাছে অরুণের উচ্চশিক্ষা, ভদ্রতা ও সংস্কৃতির মান শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেনি, বরং বিদ্রূপের বাণ তার প্রতি

নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একমাত্র স্বর্ণলতাই তার পাঠাভ্যাসে সাহায্য করেছে। সহানুভূতি দেখিয়েছে। কিন্তু উভয়ের মিলন হয়নি। স্বর্ণলতার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে হরেনের। সে একটি বিশুদ্ধ স্কাউন্ড্রেল। স্বর্ণলতা সংসারের জন্য প্রাণপাত করে আর সন্তানপ্রসব করে। সে যখন যক্ষ্মায় ধুঁকছে, তখন তার কোনো আত্মীয়-পরিজন তাকে সাহায্য করেনি। অনেকদিন বাদে দেবদূতের মতো এসে হাজির অরুণ। তার মোটরগাড়ি হরেনদের গলিতে ঢুকতে পারে না। অরুণ আর স্বর্ণলতা, দুজনেরই এত পরিবর্তন হয়েছে, তারা পরস্পরকে প্রথম সাক্ষাতে চিনতে পারে না। অবশেষে চিনেছে এবং অরুণ প্রস্তাব করেছে তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবে স্যানাটোরিয়ামে ('পৌষ ফাগুনের পালা', পরিচ্ছেদ ২১)। স্বর্ণর স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাদের ঘাড় থেকে মৃত্যুপথযাত্রী স্বর্ণলতা নেমে যাওয়ায় আপত্তি করে না। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে বেরিলি হয়ে পাহাড়ের উপর স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছে গেল স্বর্ণলতা (বুঁচি)। অরুণদা তার জন্য কতোটা কী করছে তা প্রথম ধারণাই করতে পারে নি। পরে একটু একটু বুঝেছে। তার বাড়ির খবর শুনেছে ছ মাস পরে। স্বর্ণলতার শাশুড়ি মারা গিয়েছে, স্বর্ণলতা বাড়িতে শয্যাশায়ী থাকার সময়েই দেখেছে তার স্বামী হরেন নবাগতা রাঁধুনি যুবতীকে নিয়ে রাত কাটাচ্ছে। স্বর্ণ চলে আসার পর আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এই যুবতীর হাতেই সব তুলে দিয়েছিল, সে একদিন চাবি খুলে সবকিছু নিয়ে পালায়, আর, হরেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বাড়িতে শুয়ে আছে। স্যানাটোরিয়ামে আটমাস ছিল স্বর্ণলতা। অরুণ আর স্বর্ণ পরস্পরকে জানিয়েছে তাদের ভালোবাসা। স্বর্ণ স্পষ্ট ভাষায় তার অরুণদাকে বলেছে—এখন তুমিই আমার সব। তোমাকে আমি আর ছাড়ব না। (পৃ. ৪৫১, পৌষ ফাগুনের পালা)। অরুণ স্বীকার করেছে, স্বর্ণর এই ভালোবাসায় সে ধন্য হয়েছে। তবু স্বর্ণকে নিজ পরিবারে ফিরে যাবার কথা বলেছে। স্বর্ণলতা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে—এখন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, তুমিই এখন আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। (পৃ. ৫৪৫)

শ্যামাঠাকরুন তার নিজের বাড়িতে ঝুপসি বাগান আর নারকেল পাতাভরা দালান নিয়ে একাই আছেন। আজ তাঁর বয়স উনআশি। সব দুঃখের আগুনে পুড়ে শ্যামা আজ স্বনির্ভর। তার ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে, কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে—এসব সংবাদে শ্যামাঠাকরুন আর বিচলিত হন না। হেম-কনক, মহাশ্বেতা-অভয়পদ, ঐন্দ্রিলা- হরিনাথ, তরু-হারান, কান্তি-বিনতা, খোকা—তার ছেলেমেয়ে জামাই নাতি নাতনীর থেকে আজ তিনি দূরে। তিনি আজ আর তাদের সঙ্গ কামনা করেন না। ঐন্দ্রিলার জীবনের সংগ্রাম, ঐন্দ্রিলার মেয়ে সীতার বিবাহিত জীবনের লাঞ্ছনা, কান্তির অভিশপ্ত জীবন, তরুর জীবনের হতাশা—কোনো কিছুই আজ শ্যামাঠাকরুনকে স্পর্শ করে না। হেম আর কনকের দূরবর্তী স্থানে সুখী গৃহস্থালীতে তিনি আর সুখ বোধ করেন না। অপরদিকে বলাই-মালতীর জীবনের দুর্ভাগ্যেও তিনি বিচলিত নন।

স্ত্রী মালতীর পরামর্শে শ্যামার নাতি বলাই শ্যামার আশ্রয় ও সাহায্য চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল নিঃসঙ্গ শ্যামাঠাকরুন এতে খুশি হবেন। "কিন্তু দেখা গেল বলাই বা মালতী

কেউ কিছুমাত্র চিনতে পারে নি শ্যামাকে। শ্যামা কেঁদে এসে পড়লেন না—দু-চারদিনে তো নয়ই—দু-চার মাসেও না।" (পৃ. ৪৫৮)

একদা বলাই-মালতী শ্যামাঠাকরুনের আশ্রয়ে ছিল। বুড়ি দিদিশাশুড়ির কাছে ধমক খেয়ে অন্যায়কারী বলাই মালতীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ফেরত এসেছিল। কিন্তু বলাই কোনো কাজের নয়। লেখাপড়া জানে না। কারখানায় লোহা পিটতে পারে না। মুদির দোকান চালাতে পারল না। অগত্যা ফের শ্যামাঠাকরুনের পায়ে ধরতে গেল বউয়ের তাড়নায়। "আমাকে মাপ করো, আমি না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি।" "শ্যামা হাসলেন একটু। সে হাসি দেখে কিছু না বুঝেও বলাই শিউরে উঠল। এমন নিরানন্দ কঠিন হাসি সে আর কখনও দেখে নি। .... শ্যামাঠাকরুন বললেন—আর না, আর কোনদিনই না। চৌকাঠ যেদিন ডিঙিয়েছ সেইদিন থেকেই সব সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে।.... কোনো সহায়-সম্বলই ছিল না আমার। মেয়েছেলে হয়ে যদি এতগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পেরে থাকি, তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে পারবে না?.... বলাইয়ের মনে হল সত্যি-সত্যিই বুঝি তার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।" (পৃ. ৪৫৯, 'পৌষ ফাগুনের পালা')

'পৌষ ফাগুনের পালা'য় অনেক স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, আইন অমান্য আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনায় শ্যামাঠাকরুনের মেয়েদের জীবনে অনেক কষ্ট, অনেক মৃত্যু ঘটেছে, অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সকলের উপরে মাথা তুলে আছে শ্যামাঠাকরুন—তাঁর নিজের বাগান নিজের বাড়ি নিয়ে একাই থাকেন। এইরকম নারীচরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য।

আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি

বিংশ শতাব্দের বাংলা উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী (গুপ্ত) (৮.১.১৯০৯-১৩.৭.১৯৯৫) একটি অবশ্যউল্লেখ্য নাম। তিনি লিখেছেন প্রচুর। শুরু করেছিলেন ছোটদের জন্য গল্প লিখে। বস্তুত ছোটদের জন্য গল্প লেখায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি কবুল করেছিলেন, ছোটদের জন্যে লিখে আনন্দ পেয়েছেন। সারা জীবন ধরেই তাদের জন্য লিখেছেন। তাঁর 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' নামের গল্পসংকলনটি ছোটবেলায় অনেকেই পড়েছেন। আমিও পড়েছি। এবং আজও সে-সব গল্পের কথা মনে পড়ে।

আশাপূর্ণ দেবী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করেননি। কিন্তু তিনি স্ব-শিক্ষিত। জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছেন সংসারের আবর্তের মধ্যে থেকে।

তাঁর সম্পর্কে গজেন্দ্রকুমার মিত্র লিখেছেন, "আশাপূর্ণা বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূ। স্কুল-কলেজে পড়ার সুবিধা পান নাই। অনুরূপা-নিরুপমা-ইন্দিরা ('স্পর্শমণি'র লেখিকা সুরূপা) সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ইঁহার ভাগ্যে তেমন যোগাযোগ হয় নাই। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আশাপূর্ণার কৃতিত্ব অনেক বেশি। তাঁহার পুঁজির মধ্যে ছিল বিধিদত্ত এক জোড়া চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি এবং মানুষ সম্বন্ধে অসীম মমত্ববোধ। তবে সে মমত্ব অন্ধ স্নেহ নয়—মানুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন তিনি, খোলা চোখে সহজ স্বাভাবিক চেহারাতেই তাহাদের দেখিয়াছেন। সব স্খলন-পতন ত্রুটিবিচ্যুতি দোষগুণ মিলাইয়াই তাহাদের ভাল বাসিয়াছেন। এদিক দিয়া তিনি জেল আইনের সমগোত্রীয়া। আশাপূর্ণার জীবন শুরু হইয়াছিল ষাট বছরেরও অধিককাল আগের হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরে। অনেক অবিচার অনেক অনেক অশোভনতা; এমনকি অত্যাচারও দেখিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার সাহিত্যের মূল সুর হইল বিদ্রোহ।... আশাপূর্ণা চিরবিদ্রোহিণী। এককালে তিনি যেমন 'সেকালে'র বিরুদ্ধেও ক্ষমাহীন জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন—এখন তেমনি 'একালে'র বিরুদ্ধেও আপসহীন যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। হয়ত দীর্ঘকাল পার হইয়া আসিয়া দেখিয়াছেন—অবিচার অত্যাচার অমানুষিকতা রূপ পালটাইয়াছে মাত্র। আসল দৈত্যটা মরে নাই, সমাজজীবনের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াই আছে।" ('কথাসাহিত্য' : আশাপূর্ণা দেবী সংবর্ধনা সংখ্যা)

আশাপূর্ণা দেবী একটানা পঁয়ষট্টি বছর যাবৎ লিখেছেন এবং সে লেখায় কোনো বিরতি ঘটে নি। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা ঠিক কতো তা আমার জানা নেই। তাঁর জীবন-পরিধি ছিয়াশি। লিখেছেন পঁয়ষট্টি বছর যাবৎ। তাঁর উপন্যাস সংখ্যা কতো? কেউ লিখেছেন—দুশো চব্বিশ খানা, কেউ লিখেছেন—একশ উনআশি খানা। মোটামুটি ধরে নিতে পারি দু'শ খানা।

উপন্যাসের সংখ্যা—২০০, ছোটগল্প সংকলন—৩২, ছোটদের জন্য গ্রন্থ—১৯, রচনাবলী—১০ খণ্ড, উপন্যাসের সংকলন—১৬, প্রবন্ধগ্রন্থ—১। তাঁর লেখা বইয়ের অনুবাদ (বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়)—৬২। তাঁর গল্প উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র—১২ (বাংলা), ৬ (হিন্দি), তামিলে—১, তেলুগুতে—১, ওড়িয়াতে—১, অসমীয়াতে—১ ; রঙ্গমঞ্চে অভিনীত কাহিনি—৭।

এই সুবিপুল গ্রন্থরাজির তালিকাপাঠেই আমাদের বিস্মিত হতে হয়। আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের বৃত্ত খুব ব্যাপক নয়, অথচ তার বৈচিত্রের শেষ নেই। খুব ছোট পরিসরে (হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে) বাস করেও তাঁর পর্যবেক্ষণ বহুবিচিত্র, দূরগামী, অন্তর্ভেদী। তাঁর বিপুল সৃষ্টিশীলতা দেখে আমরা বিস্মিত হই। একজন গৃহবধূর পক্ষে এই সুবিপুল বহুবিচিত্র সৃষ্টি কীভাবে সম্ভবপর তা ভেবে কূল পাওয়া যায় না। সাংসারিক কাজকর্মে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এক গৃহবধূ কীভাবে এতো বিচিত্ররূপে মানবচরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এ প্রশ্নের কোনো সোজাসাপ্টা উত্তর আমাদের জানা নেই। হয়তো গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিরন্তর লেখনীচালনা করতে করতে তিনি এমন একটি শিল্পস্বাচ্ছন্দ্যে উপনীত হয়েছিলেন যেখানে একটি গল্পের প্লটকেও তিনি উপন্যাসের ব্যাপক পরিধিতে নিয়ে আসার শিল্পসামর্থ্যে পৌছতে পেরেছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নারীসমাজ ও বহুবিচিত্র নারীচরিত্রের উদ্‌ঘাটন, তা নারীমুক্তির আহ্বানে সদামুখরিত। তাঁর প্রধান কীর্তি ত্রিলেখ-উপন্যাস : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (ফাল্গুন ১৩৭১/১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (চৈত্র ১৩৭৩/১৯৬৬) আর 'বকুলকথা' (চৈত্র ১৩৮০/১৯৭৩) (মিত্র ও ঘোষ)। প্রথম উপন্যাসটির জন্যই তিনি অর্জন করেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৩৭২) ও 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' (১৩৮৪)। এই উপন্যাসটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হবার ফলে ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভের কারণে তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

এই তিনটি উপন্যাসে কালপরিধি বিস্তারিত। এই পরিধির একটা হিসেব করা যেতে পারে। প্রথম উপন্যাসের সূচনা উনবিংশ শতাব্দের মধ্যবিন্দু-অতিক্রান্ত সময়ে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতী যখন কলকাতায় এল তখন কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়ে গেছে। কলকাতায় আসবার পূর্বেই তার দুটি সন্তানের জন্ম হয়। কলকাতায় আসার পরে জন্ম হয় তৃতীয় সন্তানের। তখনকার দিনে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। দুই সন্তানের জননী সত্যবতী যখন কলকাতায় আসে তখন তার বয়স বিশের নিচে। কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতে শুরু করে ১৮৮০ সালে। তাহলে সত্যবতীর জন্ম অন্তত ১৮৬০ সালে।

পুরোনো কলকাতার কালক্রমের একটা হিসেব এখানে নিতে পারি।

তা পেয়ে যাই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধে ('কলকাতা কার কমলালয়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৯ তারিখের সংখ্যা) :

১৭৯৩—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৮০০—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন। ১৮১৭—হিন্দু কলেজ স্থাপন। ১৮১৮—শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৮১৩—'চার্টার' নবীকরণ, ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের অধিকার রদের সূচনা। ১৮৩৫—ফার্সির বদলে প্রশাসনে ও বিচার ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার প্রচলন। ১৮৩৩—কোম্পানি সবরকম বাণিজ্যের অধিকার হারাল। ১৮২৭-২৯—বাণিজ্যে মন্দা, ভারতে ব্যবসায়ে নিযুক্ত 'এজেন্সি হাউজে'র পতন, ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ। ১৮৩০ নাগাদ কলকাতায় দক্ষ শ্রমিকের মাসিক মজুরি দশ টাকা, অদক্ষ শ্রমিকের চার টাকা। ১৮২৭—কলকাতায় পালকিওয়ালাদের মজুরির জন্য ধর্মঘট। ১৮৩৫—কোম্পানি সর্বভারতীয় টাকা প্রচলন করে, এক তোলা (১১ গ্রাম) রুপোর তৈরি টাকা। ১৮৫৩—প্রথম রেললাইন খোলা হল বোম্বাই ও থানে-র মধ্যে। ১৮৫৪—রেললাইন খোলা হল কলকাতা আর রানিগঞ্জের মধ্যে, ফলে রানিগঞ্জের কয়লা কলকাতা পর্যন্ত আনা সহজ হয়ে গেল। স্টিমারে আসামের চা আনা ও রপ্তানির শুরু হল। ১৮৫৫—রিষড়াতে প্রথম বাষ্পচালিত সূতাকল। ১৮৫৯—প্রথম চটকল হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরে। ১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ, কোম্পানির রাজত্বের অবসান, রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার নিলেন, তাঁর প্রতিনিধি হলেন বড়লাট। পরবর্তী ৪০ বৎসরে কলকাতা রেলপথে সারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল। অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্য দুই-ই বাড়ল। কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে স্থাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৬৯—সুয়েজ খাল খনন, ফলে ভারত ও ইয়োরোপের মধ্যে যাতায়াত ও মাল চলাচল বহুগুণ বর্ধিত হল। ১৮৭০-৭১—আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দাম কমে যায়। ফলে টাকার দামও কমে যায়। এতে রপ্তানিকারকদের বিশেষ সুবিধা হয়। ১৮৯৩—'বেহালা টাকশাল' বন্ধ। ১৮৯৮—টাকার দাম স্থির করা হল, ১ শিলিং ৪ পেনি। ১৮৭৬—ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ, ব্যাঙ্ক অফ বম্বেকে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে পরিণত করা হল। ১৮৭০—কলকাতা শহরে কলের জল। ১৮৮০—কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম। ১৮০০—কলকাতার জনসংখ্যা দেড় লাখ থেকে দুলাখের মধ্যে। ১৯০১—কলকাতার জনসংখ্যা আট লাখ। ১৯০২—বিদ্যুৎচালিত ট্রাম।

এই পটভূমি মনে রেখে আশাপূর্ণার ত্রিলেখ-এর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কাহিনির সূত্রপাত হিসেব করতে হয়। সত্যবতীর বাবা রামকালী চাটুয্যে প্রথম জীবনে বিদ্রোহ করে গ্রাম ছেড়ে মুকশুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) গিয়ে কবরেজী শিখে ফিরে আসেন। পণ্ডিত না হয়ে হয়েছেন নাড়ী-টেপা কবিরাজ, বিবাহ করেন বেশি বয়সে (অর্থাৎ ২৫/২৬ বছরে)। তাঁরই বেশি বয়সের (অর্থাৎ ৩০ বছরে) প্রথম সন্তান সত্যবতী। সত্যবতীর বিবাহ হয় সাত বছর বয়সে। তার ঘরবসত হয় বারো-চোদ্দ বছর বয়সে। পরবর্তী সাত বছরে তার দুটি সন্তান হয়। তারপর সত্যবতী স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় আসে। তখন কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলা শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ ১৮৮২-৮৩ সালে সত্যবতী কলকাতায় আসে। কাহিনির সূত্রপাত সত্যবতীর বাবা রামকালী চাটুয্যেকে নিয়ে। রামকালীর প্রথম সন্তান সত্যবতী জন্মায় বেশি বয়সে (৩০ বছর বয়সে)। অর্থাৎ কাহিনির সূত্রপাত ১৮৫০ সালের পরবর্তী দু-তিন বছরে। আর ত্রিলেখ উপন্যাসের শেষ ও তৃতীয় উপন্যাস 'বকুলকথা'র নায়িকা বকুল একালের মেয়ে। শেষপর্যন্ত কাহিনি এসে উপনীত হয়েছে ১৯৫০/৬০ সালে।

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রিলেখ উপন্যাস বলতে পারি এক শতাব্দীর কাহিনি, তিন প্রজন্মের কাহিনি, সত্যবতী, তার মেয়ে সুবর্ণলতা ও তার মেয়ে বকুলের কাহিনি। আশাপূর্ণা অভ্রান্ত বিচারবুদ্ধিতে তিন উপন্যাসের কাল-পরিধিকে ধরেছেন। স্থান-বিচারও লক্ষণীয়। সত্যবতীর বাবা রামকালী চাটুয্যের বাড়ি নিত্যানন্দপুরে (হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে)। সত্যবতীর বিয়ে হল বারুইপুরে (এখনকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়)। তার স্বামী নবকুমার (ইংরেজি-জানা যুবক) চাকুরি করতে এসেছিল কলকাতায়—তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলছে। শেষ বয়সে প্রতিবাদী নায়িকা চলে যায় কাশীতে।

সত্যবতী আপাদমস্তক প্রতিবাদী চরিত্র। এই প্রতিবাদের বীজ কোথায় ছিল? তার বাপ রামকালী চাটুয্যের কাছ থেকেই কন্যা পেয়েছিল প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রেরণা। রামকালী টুলো পণ্ডিত না হয়ে মুকশুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) গিয়ে আরোগ্যশাস্ত্র পড়ে হয়েছিল নাড়ী-টেপা কবিরাজ। সত্যবতী পেয়েছিল বাপের আগাধ স্নেহ আর প্রশ্রয়।

লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী পুরুষ-শাসিত শাস্ত্র-শাসিত আচার-শাসিত হিন্দু বাঙালি সমাজে সত্যবতী, তার কন্যা সুবর্ণলতা ও তার কন্যা বকুলের সংগ্রামের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

লেখিকার দৃষ্টিতে সত্যবতীর সংগ্রাম অভ্রান্ত সমাজদৃষ্টি ও সচেতন পর্যবেক্ষণ-প্রসূত। ত্রিলেখ পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয়, নারীর প্রতিবাদ ও সংগ্রামের কাহিনিকে লেখিকা সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। একালের মেয়ে বকুল (ওরফে অনামিকা) যে লড়াই দিয়েছে তা আকস্মিক নয়। বকুলের মাতামহী সত্যবতীর কাহিনিতে তার সূচনা। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সূচনা-পৃষ্ঠায় সত্যবতীদের সেই ফেলে-আসা জীবনের ইঙ্গিত আছে।

লেখিকার কথায়—

"আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল-পারুলদের মা দিদিমা পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না। তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক-একজন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা-ডোবা ডিঙিয়ে পাথর ভেঙে কাঁটাঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজেরই কাটা-পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আর একজন; তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করেই তো তৈরি হল রাস্তা। যেখান দিয়ে বকুল-পারুলেরা এগিয়ে চলেছে।.... শুধু তো পায়ে চলার পথ হলেই কাজ শেষ হল না। রথ চলার পথ চাই যে। সে পথ কে কাটবে কে জানে? সে রথ কারা চালাবে কে জানে?"

শুরু হয়ে গেল কাহিনি।

সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে স্মরণ করি, এই ত্রিলেখ, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'—তিন প্রজন্মের মেয়েদের আলাদা আলাদা লড়াই-এর কাহিনি হলেও পরস্পর-সংযুক্ত। তিনটি উপন্যাসের গ্রন্থ-পরিচিতিতে যে-কথা বলা হয়েছে তা থেকেই পাঠকরা তিনটি বইয়ের মূলকথা জেনে নিতে পারেন। স্মর্তব্য, এই লড়াই

শতাব্দী-ব্যাপী। স্থূল হিসেবে ১৮৪০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর জন্মকালের (১৯০৯) পূর্ব থেকে কাহিনির সূচনা করেছেন, তা ইতঃপূর্বেই লিখেছি। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও গভীর ইতিহাস-অধ্যয়ন সম্বল করে তিনি এগিয়েছেন, কাহিনিতে দিয়েছেন এক ধরনের সামগ্রিকতা, যা স্পর্শ করে যায় ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে বিংশ শতাব্দের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত বাঙালি তথা ভারতীয় নারীসমাজকে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'র পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

"আশাপূর্ণা দেবী বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। ... তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। এই গ্রন্থ রবীন্দ্র-পুরস্কার পাওয়ার বহু পূর্বেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গুণীজ্ঞানী পাঠক-সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অশ্রান্ত অভিনন্দন। এই গ্রন্থের নায়িকা সত্যবতী বিশ্বসাহিত্যেই অতুলনীয়া। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থেই কিন্তু সত্যবতীর জীবনকথা শেষ হয় নি, লেখিকার বক্তব্যও নয়। সেই জন্যেই তিনি 'সুবর্ণলতা' গ্রন্থে সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতাকেই বেছে নিয়েছেন নূতন নায়িকা হিসাবে। সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন—যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায়—এগিয়ে দেয় আবহমান কালের ধারাকে। সে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমানের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহসিত হয়, বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, ভৎ.সনার মালা। তবু এরাই একদিন স্মরণীয়া হয়ে ওঠে—এদের নিয়েই সাহিত্যসৃষ্টি হয়। 'সুবর্ণলতা' একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্য বিগত। যে কাল হয়তো বা আজও আমাদের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। সুবর্ণলতা সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।"

সত্যবতীর কাহিনির বিশদ আলোচনার সূত্রপাতে স্মর্তব্য, সত্যবতীর নারীমুক্তি-সংগ্রামটা একালের তুলনায় ছিল অনেক বেশি দুরূহ। কারণ তখন পুরুষ-শাসিত শাস্ত্র-শাসিত আচার-শাসিত হিন্দুসমাজের শাসন, পীড়ন ও পেষণ ছিল কঠিন।

দুই

সত্যবতীর কাহিনির শুরুতেই ('প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সূচনায়) আমরা সত্যবতীর প্রাথমিক পরিচয় পাই।

নাকে নোলক, কানে 'সারা' মাকড়ি, পায়ে ঝাঁঝা মল, বৃন্দাবনী ছাপের আট হাতি শাড়ি-পরা আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছরখানেক আগে। এখনও ঘরবসত হয়নি। সত্যবতী তার বাবা রামকালী চাটুয্যের প্রথম সন্তান। সে পেয়েছে বাপের অগাধ স্নেহ আর প্রশ্রয়।

লেখিকা জানিয়েছেন, সেকালের পুরুষরা ঘরে বউঝিকে অর্থাৎ মেয়েমানুষ জাতটাকে সমীহ করত না। রামকালীও করতেন না। সত্যবতীর লড়াই শুরু গোড়া থেকেই।

বাপ রামকালী চাটুয্যের মুখের উপর কন্যা সত্যবতী হৃদয়হীন নিষ্ঠুর সমাজের আচার-বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে উপন্যাসের শুরুতেই।

'সবাইকে ভালবেসে থাকাই যদি এত ধম্মো হয়, তা হলে সেঁজুতি বত্ত করতে হয় কেন বাবা?' ('প্রথম প্রতিশ্রুতি', ভাদ্র ১৪০২ সালের ৩৩শ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ)—কন্যা সত্যবতীর এই প্রশ্নে বিরক্তি বোধ করেন কবিরাজ রামকালী চাটুয্যে। (পৃ. ৫৭)। 'সেঁজুতি বত্তর যত মন্তর সব সতীনকাঁটা উদ্ধারের জন্য নয়?' বাপ কন্যার এই প্রশ্নে বিরক্তি থেকে পৌঁছে যান বিস্ময়ে। রামকালী বিবেচনা করেন, সদুপদেশের দ্বারা কন্যার হৃদয়কানন হতে 'সতীন-কণ্টকে'র মূলোৎপাটন করা কর্তব্য। তাই শুধান--'সে মন্তরটা কি?' উত্তরে কন্যা যে-সব মন্তর (শ্লোক) আওড়ে যায় তার প্রত্যেকটিতেই সতীনকাঁটা বিনাশের পরামর্শ রয়েছে। পিতা কন্যাকে এইসব ব্রত পালন করতে নিষেধ করেন। সত্যবতী দমে না গিয়ে জানায়, তাহলে বড়বৌ (রাসুর বৌ)-এর অত কষ্ট হচ্ছে কেন? সে কেবলি কাঁদছে। নতুন বউয়ের (সতীনের) আগমনে চোখের জলেই প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বলেছে, 'অত ধন্দয় কাজ নেই, চাটুয্যে-পুকুরে অনেক জায়গা আছে, তাতেই আমার ঠাঁই হবে।' (পৃ. ৫৯)। রাসুর বউয়ের এই সংবাদ মেয়ের মুখে শুনে রামকালী প্রমাদ গোনেন। সত্যবতীর সমস্ত সহানুভূতি বড় বউয়ের উপর। একথা জেনে পিতা রামকালী হতবাক। ক্রোধে বিস্ময়ে তিনি মেয়েকে সেঁজুতি-ব্রত করতে নিষেধ করেন। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্নে সত্যবতী পিতাকে জর্জরিত করে। বাপের ধমকে কর্ণপাত করে না, উল্টে বাপকে বলে---'কেউ যদি আত্মঘাতী হব বলে প্রিতিজ্ঞে করে, কারুর সাধ্যি আছে আটকাবার?' (পৃ. ৬১)

মেয়েকে বাপ কিছুতেই দমাতে পারেন না। তবে কি ভুল করলাম—এই চিন্তায় আলোড়িত হন রামকালী চাটুয্যে। তবে কি একটা অবোধ শিশুর এলোমেলো কথার উপর এতটা মূল্য আরোপ করে এতখানি বিচলিত হচ্ছেন?

বাপ রামকালীর এই আত্মজিজ্ঞাসা আর মেয়ে সত্যবতীর এই ভয়হীন প্রতিবাদমুখরতার মধ্য দিয়েই লেখিকা সত্যবতীর প্রতিবাদী চরিত্রের প্রথম পরিচয় তুলে ধরেন। (পৃ. ৬২)

সত্যবতীর পিতা রামকালী চাটুয্যে মানুষটি কী রকম?

লেখিকার বয়ানে---''বহুবিধ গুণের সমাবেশে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চরিত্র রামকালীর, পুরুষের আদর্শস্থল, তবু সে চরিত্রের গাঁথনিতে একটু বুঝি খুঁত আছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা আছে তাঁর, শিক্ষা আছে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান সমীহ করবার, কিন্তু সমগ্র 'মেয়েমানুষ' জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ।

''যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত-সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না। রামকালীর অবশ্য আচার-আচরণে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না হয়তো নিজের কাছে—তবু অবজ্ঞাটা মিথ্যা নয়।" (পৃ. ৬২)

তথাপি তার বালিকা কন্যা সত্যবতী তাঁর এই ধারণাকে বদলে দিচ্ছে, তার ইশারা

রামকালীর স্বগত চিন্তায় পাওয়া যায়।

"সম্প্রতি ক্ষুদে একটা মেয়ে যে মাঝে মাঝে তাঁকে ভাবিয়ে তুলছে, চমকে দিচ্ছে, বিচলিত করছে, মেয়েমানুষ সম্পর্কে আর একটু বিবেচনাশীল হওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্নের সৃষ্টি করছে।" (পৃ. ৬৩)

উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের সন্ধিস্থলে বঙ্গসমাজের মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের মনোভাবটা এখানে লেখিকা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সত্যবতী কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটাল সেটাই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের মূল আকর্ষণ।

সত্যবতীর পিসিঠাকুমা কাশীশ্বরীর বিধবা নাতবৌ শঙ্করী (কাটোয়ার বউ) নামক হতভাগিনীকে পুকুরে ডুবে মরার সংকল্প থেকে রামকালী বাঁচান। লেখিকা দেখিয়েছেন, উনিশ বছরের যুবতী বিধবার পোড়াকপালের লাঞ্ছনা। মরতে এসেছিল শঙ্করী, তবু মরতে পারছিল না। মামাঠাকুরের দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে সে উঠে এল জল থেকে। (পৃ. ৬৩-৬৭)

এই একটি ঘটনাই দেখিয়ে দেয় সেকালে বঙ্গের হিন্দু সমাজে মেয়েদের স্থান কোথায়। কতো অপমান লাঞ্ছনা জোটে সধবা বিধবা, দু ধরনের মেয়েদের প্রতি। লেখিকা ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেদিনের বাঙালি সংসারে মেয়েদের ব্যক্তিত্বের প্রতি পুরুষদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তাদের 'মেয়েমানুষ' বলে মনে করা হতো। ঈষৎ পূর্বে উদ্ধৃত অংশটি থেকে তা আমরা বুঝে নিতে পারি।

এমনি পরিবেশে সত্যবতীর সংসার করা। সত্যবতীর জ্যাঠা কুঞ্জর ছেলে রাসু (রাসবিহারী) তার পত্নী সারদার প্রতি যে ব্যবহার করে তাতে নেই কোনো সম্মান, আছে কেবল অবজ্ঞা আর অপমান। তাই সারদা যখন ক্রোধে রাতের আঁধারে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন রাসু শুধু বিচলিত হয়—এই পর্যন্ত।

সত্যবতীর প্রতিবাদী চরিত্রকে তুলে ধরার জন্যই লেখিকা সত্যবতীর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সময়ের চালচিত্রকে এভাবে চিত্রিত করেন।

কবিরাজ রামকালী চাটুয্যে মনে মনে অনুভব করেন, সত্যবতীর মতো দ্বিতীয় আর একটি মেয়ে আর কই দেখলেন। (অধ্যায় ২১)। সেই সত্যবতীকে ঘরবসত করবার জন্য শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে রামকালীর মন কেমন করে, চিন্তা হয়।

সেদিনের সমাজ কী দৃষ্টিতে মেয়েদের দেখত? রামকালীর স্বগত চিন্তায় সে কথা এখানে প্রকাশ পেয়েছে—'ঘরে থাকা মেয়ে মানেই দুর্ভাগা মেয়ে। অথচ মাঝে মাঝে পালাপার্বণে কি ভাত-পৈতে-বিয়ের কুটুম্বের মত যে আসা, সে আসায় মায়ের প্রাণ ভরতে পারে, বাপের ভরে না। অতএব তাতে ইতি হয়ে গেছে।'

শ্বশুরবাড়িতে রণরঙ্গিণী শাশুড়ি এলোকেশীর তর্জন গর্জনে ভয় পায় না ব্যতিক্রমী-পুত্রবধূ সত্যবতী। বউয়ের চুল বাঁধতে বসে তার অবাধ্য কেশরাশি সামলাতে না পেরে পুত্রবধূর পিঠে গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলেন। (অধ্যায় ২০)। সবে একমাস হল শ্বশুরবাড়ি এসেছে সত্যবতী। তারপরই এই কাণ্ড। কিন্তু সত্যবতী সাহসিক প্রতিবাদিনী মেয়ে। 'শাশুড়ির সঙ্গে কথা কওয়া নিষেধ সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দৃপ্তস্বরে বলে উঠল, তুমি আমায় মারলে যে!' (অধ্যায় ২০, পৃ. ১৫২)

তারপর বৌয়ের লাঞ্ছনার আর কিছু বাকি রাখলেন না শাশুড়ি এলোকেশী। অথচ তার স্বামী নবকুমারের এমন সাহস নেই যে তার পত্নীকে মায়ের হাত থেকে বাঁচায়।

নিত্যানন্দপুরের বাড়ি থেকে রামকালী গেছিলেন ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করতে। সেখানে "রানার" গোকুলের হাতে পেলেন একটি পত্র। এক নামধামহীন পত্র। পত্রকার লিখেছেন, 'তাঁর মেয়ে সত্যবতী শ্বশুরবাড়িতে নিত্য লাঞ্ছিতা। শাশুড়ি কর্তৃক প্রহৃতা। আপনার জামাই এই নির্যাতনে অশ্রু বিসর্জন সার করেছে।' (অধ্যায় ২১) (পাঠক পরে জানতে পারেন এই বেনামা পত্র শ্বশুরকে পাঠিয়েছে তার জামাতা; এর বেশি সাহস তার নেই।)

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. শ্রীমতী উমা মাজি মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-অধ্যয়ন' গ্রন্থে (দে'জ, অক্টোবর ২০০৫, 'আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারীমুক্তি' প্রবন্ধে, পৃ. ১৩২-১৩৮)। তার শেষাংশ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করি। যেহেতু এই বিচারে আমার সায় আছে।

"রামকালীর মাথা ঘুরে যায়—শ্বশুর-শাশুড়ি আছে। সত্যবতীর ওপর নির্যাতন কেন চলবে। মেয়েকে শ্বশুরঘর করতে পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে ঘরবসত হিসাবে প্রচুর সামগ্রী পাঠিয়েছেন, যাতে অন্তত শাশুড়ির মন ভোলে। তবু কেন এই নির্যাতন? তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সত্যবতীর দৃপ্ত মুখচ্ছবি। সত্যবতী তো পত্র লিখতে পারে। সে লেখেনি। তবে কি পত্র লেখার সুযোগ তার নেই? রামকালী পাল্কি করে বারুইপুরে বেয়াই-বাড়ি গেলেন সংবাদ নিতে। সত্যবতী যে সুখে নেই তা বুঝতে পেরেও তাকে নিয়ে আসতে পারলেন না। বুদ্ধির খেলায় তিনি মেয়ের কাছে হেরে গেলেন। জীবনের বিনিময়েও বাপের শান্তি বজায় রাখল সত্যবতী। রণরঙ্গিণী শাশুড়ি এলোকেশীর রণহুঙ্কারকে পরাস্ত করে সত্যবতী। সত্যবতী নবকুমারকে ধিক্কার দেয়, কে গোপনপত্র লিখেছিল তা জানতে চায় এবং নবকুমারকে শেখায় কীভাবে সংসারধর্ম পালন করতে হয়। এই প্রথম পত্নীর পতি-সম্ভাষণে (পৃ. ১৭৬-৭৭) নবকুমার হতবাক হয়ে যায় (অধ্যায় ২২)। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে সত্যবতীর মানসিক দৃঢ়তা, ও দৃপ্ত অথচ আবৃত ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে শাশুড়ি এলোকেশীর রণহুঙ্কার থেমে যায়। সত্যবতীর মনের মধ্যে সমুদ্রের আলোড়ন, তবু তা চাপা থাকে। একবার মাত্র এলোকেশীর ভাগ্নী সতুর সামনে প্রকাশ পেয়েছিল (অধ্যায় ২৩)। এবং সত্যবতীর শ্বশুর নীলাম্বর যে প্রতি সন্ধ্যায় উল্লাসী বাগদিনীর (রক্ষিতা) কাছে যায়, একথা জেনে স্বামী নবকুমারকে ধিক্কার দেয়। এবং এমন ঘরে তার পিতা বিয়ে দিয়েছিলেন বলে কাঁদে। ধীরে ধীরে সত্যবতী সব কিছু জানছে, মানসিকভাবে ঋদ্ধ হচ্ছে, সংসার যে কী বিচিত্র স্থল, তা জানছে। মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছরেই সত্যবতী হয়ে উঠেছে সংসার-অভিজ্ঞ। সে অনুভব করে—বারুইপুরে এই শ্বশুরবাড়িতে তার কোনো মুক্তি নেই। অথচ মুক্তি তাকে পেতেই হবে।

"মুক্তি ঘটল যখন সে কলকাতায় গেল, স্বামী নবকুমার (ইংরেজি-জানা যুবক) কলকাতায় চাকরি করতে এলো। শ্বশুর-শাশুড়ির সমস্ত বাধা ঠেলে সে চলে এলো। দুই ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে সে এতদিনে আত্মনির্ভর হল। প্রতি পদে অধীনতা থেকে মুক্তি

পেল। এমনকি স্বামীর মাস্টারমশায় ভবতোষবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার অধিকার অর্জন করল। সময়টা তখন ১৮৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতায় তখন ঘোড়াটানা ট্রামগাড়ি চলতে শুরু করেছে।

"সত্যবতী লেখাপড়া জানে, চিঠি লেখে, পদ্য লেখে—একথা জেনে একদা সত্যবতীর দুই মাসী নিভাননী সুকুমারী বিস্মিত হয়েছিল। সত্যবতীর মা ভুবনেশ্বরীও অবাক হয়েছিলেন। সেই সত্যবতী আজ কলকাতায় তার দৃপ্ত ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে।

"সে লিখতে পারে, পড়তে পারে, বইয়ের জগৎ থেকে প্রেরণা পেতে পারে,—এই ঘটনায় সেদিনের (তখন কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি চলে) বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ অবাক হয়ে যায়। সত্যবতী কলকাতায় এসেছিল দুই পুত্রসন্তান সাধন আর সরলকে (ডাকনাম তুড়ু, আর খোকা) নিয়ে। কলকাতায় সত্যবতীর তৃতীয় সন্তান—এবার মেয়ে—সুবর্ণলতার জন্ম হয় দাইয়ের হাতে। কেরাসিন তেল কাঠ দিয়ে যে রান্না করা যায় তা কলকাতায় এসে শিখেছে সত্যবতী। তার চেয়ে বড় কথা সে আত্মনির্ভর হয়েছে, নারীমুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে।"

সত্যবতী একটার পর একটা সাহসিক কাজ করেছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে ছি-ছি করেছে। স্বামীর অসুখে নিজের গহনা বিক্রি করে সাহেব-ডাক্তার এনে স্বামীকে বাঁচিয়েছে, স্বামীর মাস্টারমশাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর বাড়ি গিয়ে ইংরেজি শিখেছে, দুই ছেলেকে স্কুলে পড়িয়েছে—তাদের উকিল ডাক্তার বানাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়েছে।

যে সত্যবতী একদিন শাশুড়ি এলোকেশীর সামনে মুখ তুলে চাইত না, শত গালাগালি নিঃশব্দে শুনত, প্রহৃতা হলেও চুপ করে থাকত, সেই সত্যবতী একদিন শাশুড়ি এলোকেশীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে (অধ্যায় ২০)। এই দৃশ্য দেখে সত্যবতীর স্বামী নবকুমার হতবাক হয়েছে—"সহস্র সাপের ফণার মত একরাশ চুলের ফণায় ঘেরা সম্পূর্ণ খোলামুখ এলোকেশীর মুখোমুখি অগ্নিবর্ষী দুই চোখে সোজা তাকিয়ে তাকিয়ে যে মেয়েটা দাঁড়িয়েছে, ও কে?" নবকুমার হতবাক হয়ে দেখে সে তার সত্যবতী। আর শাশুড়ি এলোকেশী? "সহসা যেন নিথর হয়ে গেলেন তিনি, সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন সেই দুঃসাহসের প্রতিমূর্তির দিকে।" (তদেব) সেদিনই শাশুড়ি এলোকেশীর পরাজয়ের সূত্রপাত। শত প্রচেষ্টায় তিনি সত্যবতীকে হার মানাতে পারেন নি।

তারপর সত্যবতী-নবকুমারের কলকাতায় যাওয়া কে ঠেকাবে? কলকাতায় এসে সত্যবতী নতুন জীবন পেল, দীপ্ত ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঈষৎপূর্বে সে-কথাই লিখেছি। কলকাতায় এসে সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে বিকশিত হতে লাগল। নারীমুক্তির একটা সামগ্রিক প্রয়াস পাঠক সত্যবতীর জীবনকাহিনিতে অবলোকন করে। তার সাহসিকতায় সেদিনের বাঙালি সমাজ অবাক হয়ে যায়।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে লেখিকা সত্যবতীর জীবনকাহিনি মারফত বাংলার সমাজ ও সংসারের অন্তঃপুরে শতবর্ষে যে অভাবনীয় ও অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, তার প্রথম অধ্যায়টি দেখিয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে সত্যবতীর মতো বহু

অসমসাহসিকা বীরাঙ্গনা বাঙালির সমাজে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। পুরুষ-শাসিত, আচার-শাসিত, শাস্ত্র-শাসিত, প্রথা-শাসিত সংসারের অবরোধ ভেঙে সত্যবতীরা মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে। "বাঙালির সংসারজীবনের উপরকার বর্ণাঢ্য মোহজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তার সত্যকার রূপ" দেখিয়েছেন লেখিকা।

কলকাতায় সত্যবতীর সংসার সুখেদুঃখে চলছিল। সে একটার পর একটা অবরোধ ভেঙে তার সংসারটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের শেষাংশে সত্যবতী একটা ধাক্কা খেয়েছে। তাকে না জানিয়ে তার শাশুড়ি এলোকেশী গ্রামের বাড়িতেই সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন, গৌরীদান করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই, সত্যবতীকে শিক্ষা দিতেই তিনি এই কাজ করেছেন। সত্যবতী বারুইপুরে পৌঁছবার পূর্ব দিনই ঘটে গেছে সুবর্ণলতার বিবাহ।

এ ঘটনা জেনে সত্যবতী সিদ্ধান্ত করেছে, সে আর সংসারে থাকবে না। কাশী চলে যাবে। তার পিতা রামকালী চাটুয্যে অনেকদিন আগেই কাশীবাসী হয়েছেন, তা আমরা জানি। সত্যবতী কাশী যাচ্ছে, তার বাপের গলগ্রহ হবে না, সেখানে একটা পাঠশালা খুলে অন্নসংস্থান করবে। সদু (সৌদামিনী, এলোকেশীর ভাগ্নী) কাশীযাত্রায় সত্যবতীর একমাত্র সঙ্গী।

তাকে না জানিয়ে তারই মেয়ের বিবাহ দেবার এই কূটকৌশল দেখে সত্যবতী জানায় সে আজই কাশীযাত্রা করছে। শাশুড়ি এলোকেশী বলেছিলেন, "আমি শাশুড়ি হয়ে তোমার কাছে হাত জোড় করে ঘাট মানছি বৌমা, অপরাধ মাজ্জনা করো, অন্যাই হয়েছে আমার, একশোবার অন্যাই হয়েছে, স্বীকার পাচ্ছি সে কথা। বুঝতে পারিনি মেয়ে নবার (নবকুমারের) নয়, একা তোমার, না বুঝে তাই ঠাক্‌মাগিরি করে ওর উব্‌গার করতে গিয়েছিলাম।" সত্যবতী স্থির হয়ে গরুর গাড়িতেই বসেছিল, শাশুড়ির কথার উত্তর দেয় নি। আর এলোকেশীর ছেলে, তার স্বামী নবকুমার? সে হাত জোড় করে বলেছিল, 'যা হয়ে গেছে তার তো চারা নেই, তবে কেন—'। সত্য উত্তর দিয়েছিল, 'চারা আছে কিনা সেইটাই শুধু ভাববো বসে বসে বাকি জীবনটা ধরে।' সত্য আরো বলে—'সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কিনা, সব গাঁটছাড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কিনা—এই প্রশ্ন নিয়ে (কাশীতে) বাবার কাছে যাচ্ছি, ঠাকুরঝি।' নবকুমার হতবাক হয়ে যায়। সত্যবতী জানায়, তার তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবন এখানেই শেষ হয়ে গেল, কারুর সাহায্য দরকার নেই। সে একাই কাশী যেতে পারবে। সত্যবতীর শেষ কথা—'হ্যাঁ, যাবো কাশীতে বাবার কাছে। সারা.জীবন ধরে অনেক প্রশ্ন জমিয়ে রেখেছি, তার উত্তর চাইতে যাবো।'

এখানেই নারীমুক্তির সূচনা।

তিন

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রিলেখ নিয়ে একটা গোটা আলোচনার সূত্রপাতে লক্ষ করলাম, তাঁর প্রখর সময়-হিসেব। প্রায় এক শতাব্দী প্রসারিত তিন প্রজন্মের কাহিনির পটভূমিটি গভীর ইতিহাসবোধ ও সামাজিক আর আর্থিক পালাবদলের প্রেক্ষিতে চিত্রিত। স্থূল বিচারে, ১৮৪০ থেকে ১৯৪০ সাল—এই সময়সীমায় বিধৃত ত্রিলেখ।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র পরবর্তী খণ্ড 'সুবর্ণলতা' (প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৩/১৯৬৬, আমার অবলম্বন ২১শ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০২/১৯৯৫)।

এই খণ্ডে ভূমিকাচ্ছলে রচিত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনি, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। 'সুবর্ণলতা' একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে-কাল সদ্য-বিগত, যে কাল হয়তো আজও বা সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব'কে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।

সমাজবিজ্ঞানী লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।"

মনে পড়ে যায়, এক সমাজবিজ্ঞানীর কথা—যদি কোনো বিশেষ কাল-পর্বের ইতিহাস-উপাদানের অভাব ঘটে, তবে ওই সময়ের পটভূমিতে রচিত সামাজিক উপন্যাসে তা পাওয়া যাবে।

উপন্যাসের শুরুতে কলকাতায় প্লেগ, স্বদেশী আন্দোলন, বিলাতী বস্ত্র বর্জন (পৃ. ৩৩৭), হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি-প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিনের কলকাতায় পালকি, ঘোড়ার গাড়ি দুই-ই চলত (পৃ. ২৩৪, ২৪৬)। গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের কথা (পৃ. ৩৩৪-৩৫), চরকায় সুতো কাটার ঢেউ—এইসবের উল্লেখ তৈরি করে তুলেছিল অস্থির আন্দোলিত সমাজ-পরিবেশকে।

এই পরিবেশেই শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছেছিল সুবর্ণলতা। তার মা সত্যবতী কলকাতায় থাকাকালীন সত্যবতীর শাশুড়ি সুযোগ পেয়ে ন' বছরের নাতনী সুবর্ণলতার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। সংবাদ পেয়ে সত্যবতী যেদিন বারুইপুরে ফিরে এলো তার পূর্বদিনই সুবর্ণলতার বিবাহ দেওয়া হয়ে গেছে। এই ছলনার প্রতিবাদে সত্যবতী কাশীতে তার বৃদ্ধ বাপের কাছে চলে গিয়েছিল।

ন'বছরের সুবর্ণলতা চোদ্দ বছর বয়সে স্বামীর ঘর করতে এসেছিল। তার মধ্যেও ছিল তার মায়ের প্রতিবাদের বীজ। তাই শাশুড়ি মুক্তকেশীর শাসন-পীড়ন-তর্জনে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত না থেকে প্রতিবাদ করত।

সে-কথা লেখিকার জবানীতে পাই। "সুবর্ণলতার জীবনটা নিরীক্ষণ করে দেখলে

আগাগোড়াই তো শুধু ওই খণ্ড প্রলয়। সুবর্ণলতা একটা কিছু বেফাঁস কথা বলে ব'লে, তার সংসারে তুমুল কাণ্ড ঘটে। (অধ্যায় ৭, পৃ. ৪৭) শাশুড়ি মুক্তকেশী চিৎকার করে মেজবৌমাকে গাল পাড়ে, কিন্তু সুবর্ণলতা গ্রাহ্য করে না।' দেখা যায়, সুবর্ণলতা তার দীর্ঘ সুন্দর দেহটা নিয়ে সংসারে চরে বেড়াচ্ছে। কাজ করছে, কর্তব্য করছে।" (পৃ. ৪৭)

শাশুড়ি মুক্তকেশী উঠতে বসতে মেজবউয়ের নিন্দা করেন।

"মেজবৌ একেলে হাওয়া ঢোকালো বাড়িতে। মেজবৌয়ের এ বদনাম উঠতে বসতে। মেজবৌ বাড়িতে খবরের কাগজ আসার পত্তন করেছে, মেজবৌ বাড়িতেও গায়ে সেমিজ দেওয়ার পত্তন করেছে, মেজবৌ আঁতুরঘরে ফর্সা বিছানা-কাপড়ের প্রথা প্রবর্তন করেছে। মেজবৌ মেয়েগুলোকে সুদ্ধু ধরে ধরে 'পড়তে বসা'র শাসননীতি প্রয়োগ করেছে। এমন আরো অনেক কিছুই করেছে। ধিক্কৃত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত হয়েছে। তবু জেদ ছাড়ে নি। শেষ পর্যন্ত করে ছেড়েছে।" (পৃ. ৫৯)

মেজবউ ছাদে কাপড় মেলে দেওয়া শুরু করেছে, তার পিতার বয়সী প্রবীণ বড় ঠাকুরজামাই কেদারনাথের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে। পরবর্তী আরও দুটো বৌ এ সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছে। ননদের বিয়েতে নিজের গহনা দিয়েছে, সেইসব গহনা লুকিয়ে রাখার জন্য স্বামী প্রবোধকে ধিক্কার দিয়েছে, দিবালোকে সকলের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে অভিযুক্ত করেছে। আর তার স্বামীর স্ত্রী সম্পর্কে অভিমত—"যে স্ত্রীলোক আঁতুড়ে যেতে ভয় পায়, সে স্ত্রীলোককে অসতী ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নয় প্রবোধ।" (পৃ. ৪৯)

শাশুড়ি শ্রীক্ষেত্র পুরীতে পূর্বে গেছেন, দ্বিতীয়বার যাবার উদ্যোগ করছেন। সুবর্ণলতা শ্রীক্ষেত্র আর সমুদ্র দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কেদারনাথের কাছে—এই অভিযোগে মুক্তকেশী মেজবউয়ের বিচার করতে চেয়েছেন। আর স্বামী প্রবোধ তাকে প্রহার করেছে।

তার মায়ের মুখের ওপর কথা বলেছে বলে প্রবোধ সুবর্ণলতাকে হুকুম করেছে মায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে। সুবর্ণলতা তা করে নি বলে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে স্ত্রীকে জোর করে গাড়িতে তুলে তার বাপ নবকুমারের কাছে রেখেই চলে এসেছে। বাপ নবকুমার তাকে দেখে হতবাক। মেয়েকে প্রসন্ন মনে অভ্যর্থনা করেনি। আকস্মিক কন্যার এই আবির্ভাবে ভীত-ত্রস্ত-আতঙ্কিত নবকুমার দিদি সৌদামিনীর বাড়ি ছুটল পরামর্শ নিতে। আর বিকালে বাড়ি ফিরে ভাই সাধনও বোনের আকস্মিক আগমনে শঙ্কিত হয়। (অধ্যায় ১০)। অবশ্য সাধনের বউ সুধীরাবালা বড় ননদকে অবহেলা করেনি।

নবকুমার মেয়ের কাছে জানতে চান ব্যাপারটা কী? সুবর্ণলতা জানাল, তার শাশুড়ি আর স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিল। নবকুমার তাকে বোঝাতে গিয়ে বিফল হন আর চমকে ওঠেন মেয়ের ধাতব কণ্ঠস্বরে। 'এ কী স্বর! কী ভয়ানক! এ স্বর যে বড্ড পরিচিত নবকুমারের।' (পৃ. ৮৪) কতোকাল পরে শুনলেন এই কঠিন ধাতব কণ্ঠস্বর। মনে পড়ে গেল তার স্ত্রী সত্যবতীকে, যে এক কথায় সব পিছনে ফেলে কাশী চলে গিয়েছে। দাদা সাধনের কথায় আন্তরিকতার পরিচয় না পেয়ে সুবর্ণলতা বোঝে, এই বাপের বাড়িতে তার বাপ-ভাই তাকে চায় না। তাই সে তখন বিদায় নিতে চায়।

"আচম্‌কা বসে পড়ে নিজের কপালটা ঠাঁই ঠাঁই করে দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? কেন? কেন?' ভিতরের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার আর কোনো ভাষা খুঁজে পায় না বলেই সুবর্ণলতা ওর এই এতদিনকার বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নকে এই একটিমাত্র শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে চায়।" (অধ্যায় ১০, পৃ. ৮৬)

তারপরই আমরা শুনতে পাই লেখিকার কণ্ঠস্বর—"হয়তো বা শুধু তাও নয়, সমস্ত অবরুদ্ধ নারীসমাজের নিরুদ্ধ প্রশ্নকে মুক্তি দেবার দুর্দমনীয় বাসনা এটা, যা সত্যতার কোনো পথ না পেয়ে এমন উন্মত্ত চেষ্টায় মাথা কুটে মরে।

হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সভ্যতা আর প্রগতির চোখঝলসানো আলোক সামনে সাজিয়ে রাখা রঙচঙে পুতুল-মেয়েদের পিছনের অন্ধকারে আজও কোটি কোটি মেয়ে এমনিভাবে মাথা কুটে কুটে প্রশ্ন করছে—কেন? কেন?" (পৃ. ৮৬)

এখানেই লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী হয়ে ওঠেন প্রতিবাদের শিল্পী, বহুযুগ পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারিণী। তাই আমরা শুনি লেখিকার তীব্র কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন—

"সুবর্ণলতার যুগ কি শেষ হয়ে গেছে?

কোনো যুগই কি কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে শেষ হয়ে যায়?

হয়তো যায় না!

হয়তো বৃদ্ধ পৃথিবীর শীর্ণ পাঁজরের খাঁজে খাঁজে কোথাও কোনোখানে আটকে থাকে ফুরিয়ে যাওয়া যুগের অবশিষ্টাংশ, এখানে ওখানে উঁকি দিলে তার সন্ধান মেলে। যেখানে মাথাকোটার প্রতিকার নেই, সেখানে লক্ষ লক্ষ 'কেন' ছুটোছুটি করে মরছে।" (পৃ. ৮৬)

এখানেই সুবর্ণলতার কাহিনি শেষ হয়ে যায় নি। বাবা নবকুমারের সঙ্গে সেই রাতেই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে দর্জিপাড়ার সেই বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল যেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাতৃভক্ত ছেলে প্রবোধ সদর দরজা আটকে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খাণ্ডারনী শাশুড়ি মুক্তকেশী এসে বলেছিলেন—'দোর ছাড় পেবো, লোক হাসাস্ নে। মেজবৌমা, যাও বাছা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ো, আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না।' সুবর্ণলতা সে রাতে উত্তরে বলতে পারত, কিন্তু বলেনি—'কেলেঙ্কারিটি তো ঘটালেন আপনিই।' (অধ্যায় ১১, পৃ. ৮৮)

সে রাতেই সুবর্ণলতা শাশুড়ির আফিমের কৌটা চুরি করে আফিম খেয়ে মরবার চেষ্টাই করেছিল। ডাক্তার আনতে হলো মাঝরাতে, আর থানা-পুলিশের হয়ে ডাক্তারকে দর্শনীর উপর আবার ঘুষ দিতে হলো। সুবর্ণলতা তারপরও মরবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিফল হয়েছে।

বহির্জগতে তখন স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ চলেছে। সুরেন বাঁড়ুয্যে বিপিন পাল উত্তেজক ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বহির্জগতের সব সংবাদ সুবর্ণলতাকে এনে দিত খ্যাপাটে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনা দুলো। সে-ই মল্লিকবাড়ি থেকে স্বদেশির বই এনে দিত আর আন্দোলন আলোড়নের সংবাদ পৌঁছে দিত। সে-ই একরত্তি চেহারা মল্লিকবাবুকে ডেকে এনেছিল, তার ফলে সুবর্ণলতার ভাশুর আর পাড়ার লোকের হাতে মার খেয়েছিল আর

সবচেয়ে আশ্চর্য—সুবর্ণলতা পথে নেমে সেই আধ-মরা ছেলেটাকে উদ্ধার করে এনেছিল। ও-বাড়ির মেজবউ যে 'সতীলক্ষ্মী' নয়, তেজি পাজি হারামজাদী—এ সংবাদ পাড়ায় রটে গিয়েছিল। তবু তাকে মুক্তকেশী তাড়াতে পারেন নি। আকস্মিকভাবেই তিনি স্বদেশিদের উপর খাপ্পা হয়ে ওঠেন।

ঘটনার পর ঘটনার স্রোত চলে। সুবর্ণলতা বারবার শ্বশুরবাড়ির বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে চলে। এদিকে শহর কলকাতায় দেখা দেয় প্লেগ। কয়েক বছর পূর্বে প্লেগ দেখা দিয়েছিল কলকাতায় (১৮৯৮)। আবার সেই প্লেগ। যে যেখানে পারে পালাতে লাগল। সব বউ-ঝিরা পালালো। শুধু সুবর্ণলতা-ই পালালো না। কারণ পালাবার জায়গা তার নেই। কোলে কাঁখে পাঁচটা আর জঠরে একটাকে নিয়ে পুরুষের পায়ে বেড়ি হয়ে পড়ে আছে সুবর্ণলতা। কোথায় সে পালাবে? খবর এনে দিল ভাশুর সুবোধ। তাদের বোন সুবালার বাড়ি চাঁপড়া। স্বামীর সঙ্গে সুবর্ণলতা বাধ্য হয়ে প্রায় অপরিচিত ননদ সুবালার বাড়ির উদ্দেশে ট্রেনে চড়ে চলে গেল। সেখানে পেল সমাদর, অনাদর নয়। এ শ্যামল সবুজ পাড়াগাঁয়ে এসে সুবর্ণলতার মন জুড়িয়ে গেল। তার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। দর্জিপাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে যে স্নেহ-সমাদর পায় নি, তাই পেল চাঁপড়ায়। সেখানে দেখা মিলল এক স্বদেশি-করা ছেলের। চমকে ওঠে প্রবোধ, কিন্তু উপায় নেই। সেখানেই সুবর্ণলতাদের রেখে কলকাতায় চলে আসে। সুবর্ণলতার জীবনে এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে যায়। স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক নতুন জগৎকে সে দেখে। 'অন্য ভুবন। সুবর্ণলতার কাছে এ এক আশ্চর্য নতুন ভুবন।' (অধ্যায় ১৯) সুবালার সংসার আর স্বদেশির সংবাদ, দুয়ে মিলে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সুবর্ণলতা অম্বিকা নামক ছেলেটির কাছে এক নতুন বাণী শোনে। তা দেশের বাণী। অধ্যায় ২১-এ সুবর্ণলতার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সংবাদ পাঠক পেয়ে যায়। কেবল অম্বিকার মুখে নয়, তার এনে দেওয়া বই পত্রিকায় স্বদেশির কবিতা পড়ে সুবর্ণলতার যেন জন্মান্তর ঘটে।

ধীরে ধীরে সুবর্ণলতার জাগতিক ও মানসিক পরিবেশ বদলে যেতে থাকে। সুবালা অবাক হতে থাকে মেজদি সুবর্ণলতাকে দেখে। ১৩ অধ্যায়ে সুবর্ণলতার সেই জন্মান্তরের কথা। জীবনে 'পূর্ণতা' কাকে বলে, তার প্রথম পরিচয় পায় সুবর্ণলতা। মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর ছেলের বউ ঘরে আনাও যে জীবনে এক ধরনের আনন্দ আর পূর্ণতা আনতে পারে তা অনুভব করল। তার ইচ্ছে হলো তার জীবনের এই নতুন অনুভূতি খাতার পাতায় লিখে রাখতে। ১৩ অধ্যায়ে সুবর্ণলতা তার সমগ্র জীবনটাকে একবার ফিরে দেখে। সেই কবে মুক্তকেশী একটি ক্রন্দনাকুলা ন'বছরের মেয়ে সুবর্ণলতাকে শ্বশুরবাড়িতে এনেছিল, সেদিনই কি জীবনের সত্যিকারের যাত্রা শুরু। বিয়ের পর থেকে সে মা-ছাড়া। তারপর সুখদুঃখে ভরা সংসার। কতো অত্যাচার, কতো পীড়ন, মা হবার এক নতুন অভিজ্ঞতা—সবকিছু তাকে কি বদলে দিয়েছিল? অথবা অত্যাচারী শাশুড়ি মুক্তকেশীর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ—সেদিনই কি তার জীবনে এনেছিল নতুন অধ্যায়? নাকি বিতাড়িত হয়ে বাপ ভায়ের কাছে গিয়ে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ফিরে আসাটাই নতুন করে যাত্রা? কি চাঁপড়ায় সুবালার বাড়িতে আসার ফলেই জীবনে এক নতুনধারা বইতে শুরু করল?

নাকি ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দিয়ে এক নতুন অনুভবের সূত্রপাত? নাকি উনআশি বছরে মুক্তকেশীর মৃত্যু কি তার জীবনে নতুন কোনো অনুভূতি নিয়ে এলো? (অধ্যায় ১৪-১৫) নাকি তার লেখা মুদ্রণের সম্ভাবনায় (অধ্যায় ১৬) সুবর্ণলতার জীবনে এক নতুনতর অভিজ্ঞতা নিয়ে এলো? সুবর্ণলতা জীবনের তিনভাগ কাটিয়ে এসে (অধ্যায় ১৭) শুনল সে গুণবতী, তার লেখা খাতার মুদ্রাকর জগন্নাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সে বিহ্বল হল। (পৃ. ৩০৭)। সম্পর্কে বড়-ঠাকুর জগন্নাথবাবুর কৃপায় তার আত্মকথা শস্তা কাগজে বড় টাইপে শস্তা বাঁধাইয়ে উপস্থিত হল সুবর্ণলতার কাছে। কিন্তু বাড়ির সকলের হাস্য বিদ্রূপে বিদ্ধ হয়ে সে ওই বইয়ের বাণ্ডিল ছাদে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

কিন্তু যে পরিবারে সুবর্ণলতার বিয়ে হয়েছে তারা বিদ্যাবতী গুণবতী বউ চায় না। সুবর্ণলতার জীবনে কোনো সাধই পূর্ণ হয় নি। আজীবন তো একটু-আধটু লেখার সাধ ছিল। কতো সঙ্গোপনে সাবধানে রাতের সামান্য অবকাশে নিভৃতে সে লিখেছে। কিন্তু স্বামী প্রবোধ যদি দেখে ফেলল শুরু হল ব্যঙ্গ তিরস্কার, জোটে কটূক্তি। স্বামীর উক্তি—'হবেই তো, বাড়ির গিন্নি যদি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে খাতা-কলম নিয়ে পড়ে থাকে, হবেই নষ্ট, অপচয়, অবিলি, বে-বন্দোবস্ত।' সুবর্ণ জবাব দেয় না। সুবর্ণলতার 'স্মৃতিকথা' সুবর্ণলতার জবানবন্দী। সেই জবানবন্দীকে মুক্তি দিতে পারছে, মুক্তি দিতে পারছে খাতার কারাগার থেকে আলোভরা রাজরাস্তায়।' (পৃ. ৩০৮) অথচ তার কী গতি হল। সকলের ব্যঙ্গে উপহাসে তা অগ্নিতে ভস্মীভূত হল। এই তুচ্ছ সংসারের বিরূপতা আর প্রসন্নতার মধ্যে নিজের মূল্য খুঁজে এসেছে সুবর্ণলতা। তা ভুল। কারণ সুবর্ণলতার নিজের মুঠোর মধ্যে রয়েছে রাজার ঐশ্বর্য। সে তার খাতার পাতায় নিজেকে মুক্তি দিতে পেরেছে। এটাই তার আনন্দ, তার কাছে সাংসারিক দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা তুচ্ছ।

জীবনসায়াহ্নে এসে সুবর্ণলতা জীবনের আনন্দ খুঁজে পায়। স্বদেশি আমলে, ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধে (প্রথম বিশ্বসমর), স্বরাজ আন্দোলনে সুবর্ণলতার মুখের রেখায় আহ্লাদের জ্যোতি ফুটে উঠত। আজ সেই জ্যোতি দেখা যাচ্ছে তার আনন্দে, কারণ সে তার খাতায় আত্মকথা লিখে নিজেকে মুক্তি দিতে পেরেছে। কিন্তু তার সংসার সে আনন্দের অংশীদার হয় না। সুবর্ণলতা কতদিন ভেবেছে এ সংসার থেকে সে পালাবে। কিন্তু তা হয়ে ওঠে না। জীবনভর পারল না। দেখেছে পালানোটাকে যত সোজা ভেবেছিল তত কঠিন। (পৃ. ৩১৪)

দাম্পত্যে সুবর্ণলতা কোনোদিন সুখ পায় নি। স্বামীর সম্পর্কে সুবর্ণলতার স্বগতোক্তি—'ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালবাসে, তাই সব সময় বলে। আমি ওকে ভালবাসি না। ওকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব।' (পৃ. ৩১৫)

রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীত' তাকে উপহার দিয়েছিল জয়াদি। সে কাব্য পড়ে সুবর্ণলতা অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু তার সংসার তাকে সে আনন্দ ধরে রাখতে দেয়নি। 'সুবর্ণর স্বামী রূঢ়, রুক্ষ, সুবর্ণ জানে সে কথা, কিন্তু সে যে এত বেশি নিরেট নির্বোধ, এত বেশি ক্রূর, সে কথা বুঝি জানতো না তখনো।' (পৃ. ৩১৭) তার স্বামী সেই কাব্যগ্রন্থ

তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। ফুঁ দিয়ে ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সুবর্ণর মনের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। (পৃ. ৩১৯)

ভালবাসাহীন দাম্পত্যজীবনে সুবর্ণলতা জন্ম দিয়েছে ভানু, কানু, মানু, পারুল, বকুল আর সুবলের। কিন্তু তারা কি সুবর্ণকে জীবনের আলো দেখিয়েছিল? না। ব্যতিক্রম—দুই মেয়ে—পারুল আর বকুল। কিন্তু পারুলের বিয়ে হয়ে গেল, সে কি তার স্বপ্ন ধরে রাখতে পারবে? মনে হয় না। তাই একমাত্র ভরসা বকুল।

সুবর্ণলতা তার দাম্পত্যজীবন ও সংসার সম্পর্কে যে-সব স্বগতোক্তি করেছে, তাদের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যেমন,

'দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয্যায় শুয়েছি, এক ডিবেয় পান খেয়েছি, কথা কয়েছি, গল্প করেছি, হেসেওছি।... পরস্পরকে ছোবল দেবার চেষ্টা করেছি। অদ্ভুত এই সম্পর্ক, অদ্ভুত এই জীবন।' (পৃ. ৩২৪)

সুবর্ণলতার স্মৃতিকথায় নেই কোনো ধারাবাহিকতা, উল্টোপাল্টা ভাবে, সময়ের স্রোতের বিপরীতে ভরা তার স্মৃতিকথা।

"ভেবেছিলাম এই অপমানিত জীবনটার শেষ করে দিয়ে এ জন্মের দেনা শোধ করে দিয়ে চলে যাবো। হল না। ভগবান আর যম আমাকে অপমান করে ঠাট্টা করলো।" (পৃ. ৩২৫)

সপরিবারে বাড়ির সব বউরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, নিয়ে গিয়েছিল সুবর্ণর স্বামী প্রবোধ। কিন্তু সে সুখ এক চমকের। তাতে মুক্তি ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' 'সোনার তরী'র কবিতা পড়ে তার যে সুখ, সে সুখের ভাগীদার নয় তার জায়েরা, স্বামী ভাশুর দেবররা। স্বামী প্রবোধ উল্টে তাকে ব্যঙ্গ করে। তার ছেলে কানুর কথায় সে সায় দেয়নি। চরকা কাটলেই স্বরাজ আসে বলে সুবর্ণলতা বিশ্বাস করেনি।

জীবনের শেষ বেলায় সুবর্ণলতা খাতার পাতায় বা মনের পাতায় লিখে রাখে আত্মকথা—তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনার কথা, স্বপ্ন দেখার আনন্দের কথা। এই শ্বশুরবাড়িতে তার নেই কোনো আনন্দ, নেই কোনো মুক্তি। সুবর্ণলতার 'স্মৃতিকথা' পড়ে বাড়ির সবাই ব্যঙ্গ করে, তাই এক বান্ডিল বই ছাদে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। 'ধ্বংস হয়ে গেল আজীবনের সঞ্চয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের গোপন ভালবাসার ধনগুলি।' (পৃ. ৩৪১) কাগজ-পোড়া-গন্ধে আশঙ্কিত হয়ে প্রবোধ ছাদে উঠে এসে সুবর্ণর মুখে আগুনের আভা দেখে চমকে যায়, তাকে অচেনা মনে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে যায়। (পৃ. ৩৪৩)। ও বাড়ির নতুন বট্ঠাকুরের বউ জয়াবতী। দিদির সঙ্গে সুবর্ণলতা কেদার বদরী যেতে চেয়েছিল কিন্তু তা হল না। তখন হাতজোড় করে সুবর্ণ প্রবোধকে বলে—'তোমার কাছে হাতজোড় করে কটা দিন ছুটি চাইছি। সেটুকু দাও তুমি আমাকে। সব চাকরিরই তো কিছু না কিছু ছুটি পাওনা, তোমার সংসারে এই ছত্রিশ বছর দাসত্ব করছি আমি, দুটো মাসও কি ছুটি পাওনা হয়নি আমার!' (পৃ. ৩৪৬) কিন্তু যাওয়া হল না, যাত্রামুহূর্তে খবর এলো সুবর্ণর স্বামী প্রবোধের কলেরা হয়েছে। বাড়ি এসে শয্যাশায়ী প্রবোধকে সে কেবল শুধিয়েছিল—'ক'

আউন্স ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছিলে?' বাড়ির সবাই প্রবোধের কারসাজি ধরে ফেলেছিল। সুবর্ণলতার এখন মৃত্যু ছাড়া মুক্তি নেই। চলে যাবার পূর্বে তার ভরসা বকুল—তার মেয়ে বকুল, যে লেখাপড়া করতে চায়, মানুষ হতে চায়।

এই ক্ষমাহীন সংসারে নিষ্ঠুর স্বামী-শাশুড়ির ব্যবহারের প্রতিবাদে, কয়েদখানা থেকে মুক্তির জন্য তার শেষ প্রতিবাদ—দক্ষিণের বারান্দায় চিকফেলা অংশে সুবর্ণলতার জীবনের শেষ প্রহরগুলি উদ্যাপন। কবিরাজকে বিদায় করল, ওষুধের বড়ি ফেলে দিল। শেষ প্রলাপের মধ্যেও তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হল—'বলেছিলাম আর চাই না। যাবার সময় বলে যাচ্ছি, চাই। এই দেশেই, মেয়েমানুষ হয়েই!.... শোধ নিতে হবে না?' (পৃ. ৩৮৪)

রাত্রিশেষে 'ছড়িয়ে পড়ল ভোরের আলো। তুলে দেওয়া হলো বারান্দা ঘেরা ত্রিপল আর চিক্। দক্ষিণের বারান্দায় পূর্ব কোণ থেকে আলোর রেখা এসে পড়লো বিছানার ধারে। মৃত্যুর কালিমার উপর যেন সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে দিল।' (পৃ. ৩৮৪)

এখানেই সুবর্ণলতার প্রতিবাদী চরিত্রের কাহিনি শেষ। তার আশা রেখে গেল, তার মেয়ে বকুল তার জীবনের অপূর্ণ সংকল্প নিজ জীবনে সফল করে তুলবে।

চার

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ীর শেষ খণ্ড 'বকুল-কথা' (১৯৭৩/১৬শ মুদ্রণ ১৯৭৫)। এর 'পরিচিতি'তে লেখা আছে—"যখন আমাদের সমাজে অন্তঃপুর ছিল অবহেলিত, যখন সেখানকার প্রাণীরা পুরোপুরি আস্ত মানুষের সম্মান কখনো পেত না, তখন সামান্য ক'টি মেয়ে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে, সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর আলো এনে দেবার সুযোগ করে দেয় অন্তঃপুরে। সত্যবতী ছিল সেই সামান্য ক'জন মেয়ের অন্যতম। সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা সত্যবতীর মতো তেজ না পেলেও নীরবে সেই নারীমুক্তিরই আকাঙ্ক্ষাকে লালিত করে গেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়েছে সুবর্ণলতার মেয়ে বকুলের জীবনে, যে যশস্বী লেখিকা হয়েছে অনামিকা দেবী নামে। কিন্তু বকুল তথা অনামিকা কি তার সমাজের নতুন রূপে মা ও দিদিমার সাধনার সাফল্য দেখতে পাচ্ছে?

না, দেখছে শেকল-ছেঁড়ার এক ভয়াবহ উন্মাদনায় নারী-প্রগতির নামে চলছে স্বেচ্ছাচার। এই জিজ্ঞাসাই বকুল বা অনামিকা দেবীকে বারেবারেই উন্মনা করে তুলেছে। আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী ট্রিলজির এই শেষ খণ্ডে এই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে—স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এই দুইটির সীমারেখা কোথায়? সে সীমারেখার অন্বেষাই বকুলকথা উপন্যাসের মূল উপজীব্য।"

একটু পিছন ফিরে দেখি বকুলের মা সুবর্ণলতার জীবন। চৌত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সে কী পেয়েছিল? শাশুড়ির হাতে পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, স্বামীর হাতে প্রহার ও ধর্ষণ (অনিচ্ছায় স্বামীর ইচ্ছা মেটাতে প্রায় প্রতি রাতে দেহদান), আর আটটি ছেলেমেয়ের জন্মদান। সুবর্ণলতা গোপনে লেখালেখি করত, লিখেছিল সুবর্ণলতার আত্মকথা। দূর-সম্পর্কীয় বট্‌ঠাকুর ছাপাখানার মালিক জগন্নাথবাবুর আগ্রহে শস্তা কাগজে বড় বড়

হরফে ছাপা শ্রীহীন বাঁধানো বই তার আত্মকথা। জগন্নাথবাবুর বাড়ি বয়ে দিয়ে যাওয়া সেই বইয়ের বাণ্ডিলের জন্য শ্বশুরবাড়িতে তীব্র উপহাস। তারই প্রতিবাদে ছাদে গিয়ে দুপুর-রোদে সেই বইগুলি সে পুড়িয়ে ফেলেছিল। এটাই সুবর্ণলতার প্রতিবাদ। বস্তুত সারা জীবনই সে প্রতিবাদ জানিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। দর্জিপাড়ার এই বাড়ি তার কাছে হয়ে উঠেছিল কারাগার। সেই কারাগার থেকে মুক্তির জন্য সুবর্ণলতা শেষ শয্যা পেতেছিল দক্ষিণের বারান্দায় চিক্-ফেলা অংশে। সে বারবার এই বাড়ির অনেক বন্ধনের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েছে। শেষের দিকে প্রতিবাদ মেয়ে বকুলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা। যে বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ, সে বাড়ি থেকেই মেয়ে পারুল ও বকুলকে স্কুলে পাঠিয়েছে, গৃহশিক্ষক রেখে তাদের শিক্ষার পথ সুগম করতে চেয়েছে।

ফ্ল্যাশব্যাকে উপন্যাসের সূচনা। আর্থিক ও সাংসারিক স্বাধীনতা অর্জন করেছেন অনামিকা দেবী। তিনি ফিরে ফিরে দেখছেন তার জীবনকে, বকুলের জীবনকে। বকুলের ভাইরা তাদের স্ত্রীদেরকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছে। "অনামিকা দেবীর মেজ বৌদি আর সেজ বৌদি প্রথম দিকে ভাসুরপো-বউয়ের অনেক সমালোচনা করেছিলেন, অনেক বিদ্রূপের ফুলঝুরি ছড়িয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমশ নিজেরাই ওই আধুনিকতার সুবিধেগুলো অনুধাবন করছেন এবং কখন অলক্ষে সেগুলির প্রবর্তনও করেছেন। এখন ওঁরা পুরুষদের অন্তত টেবিলে খেতে দেওয়াটা বেশ ভালো মনে করেন।" (পৃ. ১১)

"অনামিকা দেবীকে কেউ কিছু শোনাতে আসেন না। যে যা শোনান নিজ নিজ স্বামী-পুত্রকে অথবা ভগবানের বাতাসকে।" (পৃ. ১১)

এ বাড়ির পিসি অনামিকা দেবী পিছন ফিরে নিজের জীবনকে দেখেছেন। কিশোরী বকুল—শাড়িটা চাবিবাঁধা আঁচলের ধরনে ঘরোয়া করে পরা, চুলের রাশ টান টান করে আঁচড়ে তালের মত একটা খোঁপা বাঁধা, খালি পা। হাতে রবি ঠাকুরের পদ্যের বই, পাশের বাড়িতে সে বই ফেরত দিতে যাচ্ছে। ধিঙ্গী মেয়ে, যেতে হবে না বলে ধমক দিচ্ছে গুরুজন।

মৃত্যুকালে প্রবোধচন্দ্র তাঁর পুরনো বাড়ির নবনির্মিত তিনতলার ঘর বারান্দা ছাদ কেন যে তাঁর চির বিরক্তিভাজন হাড়জ্বালানী ছোট মেয়ের (বকুল) নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন তা এক রহস্য। তাঁর পুত্রদের চমকিত বিচলিত ও গোত্রান্তরিতা কন্যাদের ঈর্ষিতা করে ছোটমেয়েকেই তিন তলাটা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের চার মেয়ে চার ছেলের মধ্যে সাত-সাতটাই তো হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ছেলেদের মধ্যে তিনটিকে (ভানু কানু মানু) দখল করে নিয়েছিল পুত্রবধূরা অর্থাৎ পরের মেয়েরা। ছোট ছেলে সুবলকে কেউ দখল করে নিতে পারেনি, ভগবানই তাকে নিয়েছিলেন। তিন মেয়েকে (চাঁপা চন্দন পারুল) হাতিয়ে নিয়েছিল পরের ছেলেরা অর্থাৎ জামাইরা। প্রবোধচন্দ্রের শেষ জীবনে শেষ ভরসা ছিল ছোট মেয়ে বকুল। তাকে হাতছাড়া করার ভয়ে বিবাহের উদ্যোগ করা হয়ে ওঠে নি, তার পূর্বেই প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যু। প্রবোধ-সুবর্ণলতার শেষ মেয়ে বকুল। এই শান্ত নম্র নিরীহ মেয়েটা ঝলসে উঠল অন্য নামে—অনামিকা দেবী (লেখিকা)। তার নামেই

বাবা তিন তলাটা লিখে দিয়েছিলেন বলে ভাইরা তাকে আর তাড়াতে পারেনি।

"বকুল রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের এই বাড়িটায় শেকড় গেড়ে বসে থেকে চোখ খুলে দেখে চলেছে কেমন করে বাড়ির চারপাশের উদার শূন্যতা সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আর সমাজের বন্ধ সংকীর্ণতা উদার হয়ে যাচ্ছে।" (পৃ. ৪৩)

সুবর্ণলতার প্রবল কর্তব্যবোধটাই প্রবোধচন্দ্রকে চিরকাল জব্দ করে রেখেছিল। প্রবোধচন্দ্র বুঝে উঠতে পারতেন না, কর্তব্যবোধ নামক বস্তুটার জন্যে মানুষ লড়াই দেয় কেন? তার সঙ্গেই তো আসে যতো রাজ্যের চিন্তা আর অসুবিধা। প্রবোধচন্দ্রের এই মতবাদের সঙ্গে চিরকাল লড়ালড়ি ছিল সুবর্ণলতার। কিন্তু শেষ জীবনে সুবর্ণলতা হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে যুদ্ধবিরতির অন্ধকার শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটাই সুবর্ণলতার শেষ প্রতিবাদ। "মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই সুবর্ণলতা যেন এ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে নিজেকে মৃতের পর্যায়ে রেখে দিয়েছিলেন। সেই মৃত্যুর শীতলতার মধ্যে কেটেছে বকুলের কৈশোরকাল। তবু আশ্চর্য, সেই শীতলতার মধ্যেই ফুটেছে ফুল, জ্বলেছে আলো।" (পৃ. ৪৫, অধ্যায় ৮)

বকুলের সেজদি পারুল অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছিল। তখন বাবা নেই। দোতলা একতলায় দাদাদের সংসার, তিনতলায় একা বকুল। পারুল যদিচ স্বামী অমলের সঙ্গে থাকে, বদলির চাকরিতে তার বরের সঙ্গেই ঘোরে, তবু ছোট বোন বকুলকে বলে—'কিছুতেই নিজেকে 'হিন্দুনারী'র খোলসে ঢুকিয়ে ফেলতে পারছি না, অথচ খোলসটা বয়েও মরছি। হয়তো মরণকাল অবধিই বয়ে মরবো।' (পৃ. ৪৭) বকুল তার সেজদি পারুলের এই উক্তি ঠিক বুঝতে পারে না। হয়ত তাদের মা সুবর্ণলতার বিদ্রোহের একটি স্ফুলিঙ্গ পারুলের মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। বকুলের মতো সাহসী না হলেও পারুল বাপের মুখোমুখি হয়ে বলেছিল—বকুলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব প্রবোধচন্দ্রের কাছে ছিল না, হয়তো বিপত্নীক বৃদ্ধের সবচেয়ে বড় স্বার্থ প্রাণরক্ষার তাগিদেই ছোট মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে চায় নি। ছোট মেয়েকে তিন তলার ঘর বারান্দা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। আজ তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে অনামিকা দেবী (বকুল) খোলা আকাশ দেখেন। পাশের বাড়ির ছেলে নির্মলকে হয়তো পছন্দ ছিল, কিন্তু ভীরু নির্মল সাহস দেখায়নি।

অনামিকা দেবী বারবার ফিরে দেখেন ফেলে আসা জীবনটাকে। তার মা (সুবর্ণলতা) বড় বেশি আবেগপ্রবণ ছিলেন, বড় বেশি স্পর্শকাতর। সংসারের অন্য সকলে যা অনায়াসে সয়ে নিতে পারে মা তার মধ্যে কুশ্রীতা, রুচিহীনতা দেখে পীড়িত বোধ করতেন। আজ অনামিকা দেবীর মনে হয় যখন তার মা মারা যায় তখন তার বয়স ছিল অল্প। তখন মায়ের জন্য করুণা বোধ করতেন। পরে বুঝেছেন, মানুষ সম্পর্কে মার বড় বেশি মূল্যবোধ ছিল বলেই এত দুঃখ বোধ করতেন।

"এই ভুল অঙ্কটা কষতে বসে জীবনের-পরীক্ষায় শুধু ব্যর্থই হয়েছিলেন মহিলা, আর পৃথিবীর আঘাতে, চূর্ণ হয়ে যাওয়া সেই প্রত্যাশার পাত্রখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে

নিজেও চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। মাকে বুঝতে পেরেছিলেন অনামিকা।" (অধ্যায় ১০)

অনামিকার পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েরা—তার ভাইদের মেয়েরা তিনতলায় উঠে এসে পিসিকে তাদের নিজেদের কথা বলে, তখন অনামিকার মনে হয় এদেরও তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। এ তো আমাদের চেনাকালের কাহিনি। তাঁর মনে হয় আজ শেকল ছেঁড়ার ভয়াবহ উন্মাদনা অনামিকাকে উন্মনা করে তোলে। তাঁর নিজের ফেলে আসা অল্প বয়সের কথা ভাবলে মনে হয়, সেদিন তিনি তাঁর মাকে বুঝতে পারেন নি। এই দুই কালের মাঝখানে অনামিকা সেতুস্বরূপ। আজ তিনি স্বাধীন, মায়ের মতো পরাধীন নয়, লেখা তাঁকে দিয়েছে আর্থিক স্বাধীনতা। আর এই তিনতলার বাসা তাঁকে দিয়েছে সামাজিক স্বাধীনতা। তবু কি তিনি সুখী? তিনি নিজের ভাবনায় হারিয়ে যান।

"শুধুই কি মায়ের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত থেকেই অনামিকার প্রকৃতির গঠন?

বকুলের কাছ থেকেও কি নয়? বকুলের মধ্যেও কি আলো ছিল না? ছিল না মোহ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা? মা'র মতো তীব্রভাবে না হোক, সুষমার মূর্তিতে? বকুলের সে মোহ, সে বিশ্বাস টেঁকেনি?" (পৃ. ৬৩)

পারুল বকুলের জন্য পাশের বাড়ির ছেলে নির্মলদার বিবাহের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

লেখিকা অনামিকা দেবী বসে বসে ভাবেন। কেবল নিজের ফেলে-আসা জীবনটা দেখেন না, সেই সঙ্গে এই মুহূর্তেই জীবনস্রোতের তরঙ্গ-ভঙ্গ লক্ষ করেন। তাঁর সনৎকাকার সঙ্গে পৌষমেলায় বেড়াতে যাওয়া নিয়ে তাঁর বাড়িতে অনেক কদর্থ করা হয়েছিল। তা তিনি গ্রাহ্য করেননি। তাঁর পড়শী নির্মল সাহস না পাওয়াতে তাকে বিবাহ করতে পারেন নি। অথচ দূরের শহর থেকে সেই নির্মলদার স্ত্রী মাধুরী তাঁকে চিঠি লেখে, তাঁর স্বামীর ভীরুতার সমালোচনা করে অনামিকা দেবীকেই চিঠি লেখে। অনামিকা কোনো উত্তর দেন না, মাধুরী উত্তর চায় না। সেই সনৎকাকা এতদিন পর দিল্লি থেকে সপুত্র ও তাঁর পরিবার নিয়ে ফিরে আসেন। অনামিকা তাঁকে দেখতে যায়। তাঁর পুত্র বকুলের (অনামিকা) লেখক-খ্যাতির কথা বলে। একই সঙ্গে তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রশংসা করে, আবার তাঁরই কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নিন্দা করে। একালের সমাজকে যে সিনেমাওয়ালারা উচ্ছন্নে দিচ্ছে সে কথাও বলে। আর তাঁর ভাইঝি শম্পা যে পিসির কাছে তার নানা প্রেমের কাহিনি বলে, সেই শম্পা যেদিন নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করে, সেদিন বকুলের ভাইরা ভাইবৌরা তাকেই ধিক্কার দেয়। (অধ্যায় ১৫) আর তার সেজদি পারুল? (অধ্যায় ১৬) সে আজ প্রবীণা, নিঃসঙ্গ। "তবু যেন পারুলকে ঘিরে এক অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ। নিঃসঙ্গ পারুল শুধু ওই জলের দিকে তাকিয়েই যেন অফুরন্ত সঙ্গের স্বাদ পায়, যেন অনন্ত প্রাণের স্পর্শ পায়।" (পৃ. ১২৮) আর অনামিকা দেবীর অনুভব হয়—"জীবন নিয়েই সাহিত্য, চরিত্র নিয়েই কল্পনা। আদ্যিকালেও যা ছিল, আজও কি তাই নেই? যেটা অন্যরকম সেটা তো পরিবেশ, তার খাঁজে খাঁজে ওই জীবনটাকে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। আজকের পরিবেশ যদি খাপছাড়া, পালছেঁড়া হয়, সাহিত্যই বা তার প্রতিফলন হবে না কেন?" (পৃ. ১২৮)

পারুল আজ নিঃসঙ্গ। তার স্বামী অমল দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত। মোহনলাল ও শোভনলাল নামে তার দুই পুত্র ক্লাস ওয়ান অফিসার।—এই সবকিছু আজ আর পারুলকে প্রভাবিত করে না। "পারুল একটা সত্তার নাম, সেই কথাটাই অনুভব করে পারুল। আর তেমনি এক অনুভবের মুহূর্তে মাকে (সুবর্ণলতাকে) মনে পড়ে পারুলের। আগে পারুল মাকে বুঝতে পারতো না। পারুল তার মা'র সদা উত্তেজিত স্বভাবপ্রকৃতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, পারুল তার মা'র ওই ডজনখানেক ছেলেমেয়ে বরদাস্ত করতে পারতো না। কিন্তু এখন পারুল যেন দর্শকের ভূমিকায় বসে মাকে দেখতে পায়। পারুলের একটা নিঃশ্বাস পড়ে। পারুল ভাবে মা যদি খুব অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যেতো, তাহলে হয়তো মা বেঁচে যেতো। হয়তো বকুলই পারুলকে এই দৃষ্টিটা দিয়েছে। বকুলই তার মা'র অপরিসীম নিরুপায়তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে কাল্পনিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সেই অবরোধের অসহায় যুগে প্রায় সব বাঙালি মেয়ের জীবনই তো বকুল-পারুলের মায়ের জীবনের ছায়ার প্রতিফলন।" (অধ্যায় ১৬, পৃ. ১২৯)

বকুলের দিদি পারুলের এই উপলব্ধি এই উপন্যাসে এক পরম প্রাপ্তি।

"পারুল এক এক সময় যেন মাকে এই গঙ্গার উপরকার বারান্দায় এনে বসায়, তারপর গভীর একটা নিঃশ্বাস উৎসর্গ করে মুক্তির কাঙাল সেই মানুষটার উদ্দেশে। পারুলের বিধাতা পারুলের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন বৈকি, তাই পারুলকে দীর্ঘদিন ধরে একটা স্থূল পুরুষচরিত্রের ক্লেদাক্ত আসক্তির শিকার হয়ে পড়ে থাকতে হয়নি, যে আসক্তি একটা চটচটে লালার মতো আবিল করে রাখে, যে আসক্তি কোথাও কোনোদিকে মুক্তির জানালা খুলতে দেয় না।" (পৃ. ১২৯-১৩০)

আশাপূর্ণা দেবীর কলমে এই সাহসিক উক্তি নারীমুক্তির প্রবল সমর্থক এক লেখিকাকে আমাদের কাছে উপস্থিত করে। আমাদের পুরুষশাসিত শাস্ত্রশাসিত আচারশাসিত সমাজকে এই তীক্ষ্ণ সমালোচনা-অঙ্কুশে লেখিকা আঘাত করেন।

চন্দননগরে প্রবীণা পারুলের জীবনে হঠাৎই একটি ঘটনা ঘটে। তার শান্ত নিস্পৃহ বৈরাগী জীবনে বিপ্লব ঘটে যায়। তার না-দেখা এক ভাইঝি শম্পা তার অপর পিসিকে (বকুলকে) লেখা পত্রে তার ঠিকানা পেয়ে এসেছে, আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, সঙ্গে তার স্বনির্বাচিত জীবন-সঙ্গী সত্যবান দাস। ব্রাহ্মণ সন্তান নয়, ভদ্রলোক নয়, কুলিমজুর মাত্র। তাকেই সে বিবাহ করছে। বকুলের ছোড়দা (শম্পার বাবা) তাকে শাসিয়েছে—ওই হতভাগাটার সঙ্গে মিশলে এবাড়িতে থাকা চলবে না। তা তোমার কাছেই এলাম। ছোট পিসি (বকুল) তো পৈতৃক বাড়িতে, তাই চলে এলাম তোমার কাছেই। (পৃ. ১৩১-১৩২, অধ্যায় ১৬)

চন্দননগরে পারুল তাদের দুজনকে আশ্রয় দেয়। এবং বহুদিনের পর তার ভাইদের বাড়িতে দৌত্য করতে আসে। তার আগমনটা ভাইদের কাছে অপ্রত্যাশিত। তার কাছেই বকুল আর ভাইয়েরা শম্পার বৃত্তান্ত জানতে পারে।

'বকুল-কথা' উপন্যাসের বাকি অংশ (অধ্যায় ১৭-৩১) একদিনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যাওয়ার ও পরের পর এক একটি ঘটনার ঢেউয়ে এক রক্ষণশীল পরিবারের ভেঙে যাওয়ার

কাহিনি। শম্পা তার স্বনির্বাচিত বর সত্যবানকে নিয়ে পারুল-পিসির চন্দননগরের বাড়িতে ওঠার পর থেকে কাহিনি দ্রুত বেগে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক মাঠকোঠায় গিয়ে ওঠে শম্পা। তার বর সত্যবান কারখানায় দুর্ঘটনায় দুই পা হাঁটু থেকে কাটা পড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাড়িতে তাকে নিয়ে পৌঁছে যাওয়া ও আশ্রয় পাওয়ার মধ্যে অনেক বাধা টপকাতে হয়েছে। সেভাবেই বকুলদের বাড়িতে তার ভাইরা ও তাদের বউরা এক এক করে অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বদলাতে থাকে। এরই মধ্যে জলপাইগুড়ি থেকে এক স্বামী-পরিত্যক্তা বধূ নমিতার আকস্মিক আগমনে বকুলের হতচকিত অবস্থা। নমিতা নিজের ভাগ্য নিজে গড়ার জন্যই জলপাইগুড়ির শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসেছে, শেষ পর্যন্ত নাম বদলেছে, অভিনেত্রী হয়েছে বোম্বাই গিয়ে, আর সেখানেই নিজের নতুন নামকরণ করেছে। শেষে অপঘাতে মৃত্যু বরণ করেছে। এ ঘটনাও বকুলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে একটুকু ভালবাসার কাঙাল নমিতা কলকাতা হয়ে বোম্বাই চলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে এবং মৃত্যুতেই তার ভালবাসার সন্ধান শেষ হয়ে গেছে।

সদ্যজাগ্রত অধিকারবোধের চেতনা ও স্বাধীনতার চেতনা শম্পাকে বদলেছে। নমিতাকে বদলেছে। বকুল তাকিয়ে দেখে তার চারপাশের সমাজ এই দুই চেতনায় ও দাবিতে ভাঙছে। সেই ভাঙনের ঢেউ তাদের সংরক্ষণশীল সংস্কারবদ্ধ বাড়িতেও আছড়ে পড়েছে।

সেদিন কলকাতা জ্বলছে। 'রক্তের বদলে রক্ত চাই', 'খুনের বদলে লাল খুন', 'জুলুমবাজি বন্ধ করো',—'নিপাত যাও, নিপাত যাও'। অজগরের মতো দীর্ঘ মিছিলে আটকে পড়েন অনামিকা দেবী। ভেঙে-যাওয়া সভাস্থলে পৌঁছে সে-কথাই শোনেন উদ্যোক্তাদের মুখে। ওই মিছিলকারী বেকার যুবকদের সামনে আশা নেই, ভরসা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। শম্পার চিঠি পড়ে জানলেন শম্পা আজ সত্যবানকে নিয়ে চন্দননগরে তার বোন পারুলের আশ্রয় নিয়েছে। শম্পার বিদ্রোহ ও ভালোবাসা-ভরা চিঠি পড়ে অনামিকা দেবীর মনে হল 'অনেকদিনের অনাবৃষ্টির পর সুন্দর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।' (পৃ. ১৯১-১৯২) ওদিকে বাড়িতে ভাইদের নিজ নিজ পরিবারেও এই ভাঙনের স্পর্শ লেগেছে। তারাও বদলাচ্ছে। এ বাড়ির মেয়ে সত্যভামা হোটেলে ক্যাবারে নাচছে, তার পূর্বে এয়ার-হস্টেসের চাকরি নিয়েছে। এই সংবাদ প্রয়াত প্রবোধচন্দ্রের ভিটের সংসারভূমিতে যখন আড়ছে পড়েছিল তখনই এই সংসারে ভিত্তিমূল দুর্বল হয়েছিল (পৃ. ১৯৬)। গৃহত্যাগিনী শম্পাকে তার বাপ-মা তার দু-পা কাটা বরের সঙ্গে ঘরে বরণ করে নেবেন—এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারও এই পরিবারে ঘটল।

বকুল অনেকদিন পরে চন্দননগরে তার বোন পারুলের কাছে গেল। ভাগ্যের হাতে চড় খেতে খেতে বকুল আজ তার দিদির মুখোমুখি হয়েছে। গঙ্গাতীরে সেই বাড়িতে বসে দুই বোনের আলাপচারিতায় উঠে এলো সামাজিক পরিবর্তন, দ্রুত পরিবর্তনের নানা ঘটনা (অধ্যায় ১৮)। এটাই এই উপন্যাস তথা ত্রিলেখের সমাপ্তিরেখা টানার সূচনা। বকুল বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার দাদারা তাদের বউয়েরা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। একদিকে ছোটবৌদির কান্না, অপরদিকে পড়শী নির্মলের বউ মাধুরী-বউ আর তার ছেলেদের উল্টা-পাল্টা জীবনযাত্রা আবারও নাড়িয়ে দেয় অনামিকা দেবীকে, তার মধ্যে বড় হয়ে

ওঠে বকুল। ওদিকে পারুলও বিপর্যস্ত হয়ে যায় যখন তার ছেলে শোভনলাল এসে জানায় তার বউয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাবার সংবাদ। বকুল আর তার সেজদি পারুলের আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে লেখিকা সমাজে ভাঙনের ব্যাপক পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নতুন জীবন গড়ার সংকেতও দিয়েছেন, যা চিত্রিত হয়েছে শম্পা-সত্যবানের জীবনে। অনামিকা দেবীর চিন্তাস্রোতে ভেসে আসে অনেক ঘটনা, মনের আয়নায় ধরা দেয় অনেক নতুন মুখ। অনামিকা দেবীর এখন ভক্ত-পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে, তারা জানতে চায় অনামিকার সৃষ্ট উপন্যাস চরিত্রের মধ্যে কোনটা বকুল-চরিত্র। অনামিকা তা নিজেও জানেন না। অনামিকা দেবী বকুলকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি আরো খুঁজছেন একটি প্রশ্নের উত্তর—তাঁর জানা জগতের সমাজে আর জীবনে এত বেদনা, এত অবিচার, এত নিরুপায়তা কেন? (পৃ. ২৫৭) পারুলেরও একই উপলব্ধি—ভাঙা সমাজে কেন ডিভোর্সের এত ছড়াছড়ি, কেন একটি দাম্পত্য-ভাঙা জীবনের টানাপোড়েনে একটি কিশোর বাড়িতে না থেকে বোর্ডিং-এ চলে যেতে চায়। পারুলের ছেলে শোভনলালের জীবনের ভাঙন ও শূন্যতা পারুলকেও আঘাত করে। দুই বোন পারুল আর বকুলের জীবনের সত্য-অন্বেষণেই এ উপন্যাসের সমাপ্তি। দুই বোনে গঙ্গাতীরে বসে ভাবে তাদের মাতামহী সত্যবতীর সংগ্রামের কথা।

চিত্তরঞ্জন মাইতির ট্রিলজি

আমাদের চেনাকালের যে পাঁচ ঔপন্যাসিক ট্রিলজি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি (১৯২৬)। বাকি চারজন হলেন শংকর, শ্রীপ্রফুল্ল রায়, শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমরেশ মজুমদার।

আমাদের চেনা জগতের বাইরে—অনেক দূরে হিমালয়ের কোলে কুলু উপত্যকায় চিত্তরঞ্জন পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরে তিনি চারবার কুলু উপত্যকায় গেছেন। সেখানকার মেষ-চরানো গদ্দী সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন ; জেনেছেন তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন।

কুলুর উপত্যকা সৌন্দর্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। হিমালয়ের পশ্চাৎপটে কুলু উপত্যকার রমণীয় দৃশ্যাবলী বছরের তিন ঋতুতে দেশবিদেশের পর্যটকের মনোহরণ করে। কুলু উপত্যকার ফল ও ফুল ভ্রমণকারীর উদর ও চিত্তকে অনবরত ডাক দেয়।

কুলু উপত্যকার অর্চার্ডসমূহ (বাগিচা) ফলের জন্য জগদ্বিখ্যাত। মানালীতে ৬৪০০ ফুট উচ্চতার অবস্থানে উত্তর বিয়াস উপত্যকার অর্চার্ডগুলি দেশবিদেশের মানুষকে ডাকে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন বেনন গড়ে তোলেন বিখ্যাত 'সানশাইন অর্চার্ড'। বিলাতের আপেল ভুট্টা মকাই-এর তুলনায় কুলু উপত্যকার আপেল ভুট্টা মকাই রঙে গন্ধে আকারে উন্নততর।

কুলু উপত্যকা আর-এক কারণে বিখ্যাত। রাশিয়ান চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ কুলু উপত্যকায় বাসা বেঁধেছিলেন। তিনি ভারতের প্রেমে পড়েছিলেন, ভারতকে তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে মনে করতেন। রোয়েরিখের আঁকা চিত্রাবলী দুনিয়ার একাধিক উন্নত দেশের চিত্র-সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ভারতের দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রমে ও কুলু উপত্যকায় জগ্‌গরে তাঁর চিত্র-সংগ্রহশালা আছে। তাঁর পুত্র মাইকেল রোয়েরিখও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি ভারতীয় ছায়াচিত্রের প্রখ্যাত নায়িকা দেবিকারানির সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন।

শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ কেবলমাত্র চিত্রশিল্পী ছিলেন না, প্রত্নতাত্ত্বিকও ছিলেন। মধ্য এশিয়ায় খননকার্য চালিয়ে তিনি একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেন।

রোয়েরিখ একসময় তাঁর খননকার্য শেষ করে ফেরার পথে কুলু উপত্যকায় উপস্থিত হন। নাগ্‌গরের সৌন্দর্য তাঁর শিল্পী-চিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তিনি নাগ্‌গরের পাহাড়-চূড়ায় অরণ্যবেষ্টিত একটি স্থান ক্রয় করেন। সেখানেই স্থাপন করেন তাঁর চিত্রশালা। সপরিবারে বসবাসও করতে থাকেন সেখানে।

এই চিত্রশালার কেয়ার-টেকার গাইড ছিল চিত্তরঞ্জনের কুলু ট্রিলজির নায়িকা ঝিন্নি।

নাগ্‌গর-চূড়া থেকে দুটি ফার গাছের ফাঁকে নিচে কুলু উপত্যকায় অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। খেপে খেপে সবুজ হলুদ ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সাদা উপবীতের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে চলে বিপাশা (বিয়াস্)। দূরে পাহাড়ের সারি। তার পেছনে পীরপাঞ্জালের তুষারশৃঙ্গ। উপরে নীলকাশ।

রোয়েরিখ 'রামায়ণের জন্ম' নামে অসাধারণ একটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। সেটি আছে নাগ্‌গর চিত্রশালায়—

স্বপ্নালু এক কবির দূরপ্রসারী দৃষ্টি। দূর শুভ্র কুয়াশার আচ্ছাদনের ভেতর থেকে অস্পষ্ট মহানগরী অযোধ্যার ছবি ফুটে উঠেছে।

বিশ্ববন্দিত চিত্রশিল্পী রোয়েরিখের সঙ্গে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ হয়েছিল বিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশকে। যদিও চাক্ষুষ দর্শন কোনো দিন হয়নি তাঁদের। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন দর্শনের জন্য এই দার্শনিক-চিত্রশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শিল্পী রোয়েরিখও তাঁর স্বপ্নের রাজ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন কবিকে। কিন্তু আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও দু'জনের কেউই তা রক্ষা করতে পারেননি।

শিল্পী রোয়েরিখের স্ত্রী ছিলেন তাঁর প্রেরণা। মৃত্যুকালে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শিল্পীকে বাইরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসানো হয়েছিল। তিনি তাঁর শিল্পজগতকে দেখতে দেখতে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন (জন্ম সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া ১৮৭৪. মৃত্যু কুলু ১৯৪৭ খ্রি.)।

নাগ্‌গর থেকে একটু দূরে মানালী শহর। সেখানেই প্র্যাকটিস করতেন ট্রিলজির নায়ক ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি। একটু নিচে কুলু গ্রাম। সেখানে অর্চার্ড তৈরি করেছিলেন ডাক্তারের পিতা আর এক মুখার্জি। সেই বিপত্নীক মুখার্জির বাগিচা দেখভাল করতে নরসিংলালজী। তারই কন্যা ঝিন্নি। ট্রিলজির নায়িকা। ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি ডাক্তারি পড়া শেষ করে সার্জন হয়ে কলকাতা থেকে চলে এসেছিল কুলুতে। সেখানেই তাঁর প্রয়াত পিতার বাগিচা ও বাংলো দেখেছিল। নরসিংলালজী এতদিন যত্নের সঙ্গে বাংলো রক্ষা ও বাগিচা পরিচর্যায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। আজ তার সামনে তরুণ ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি—তাকে সে তার ভাতিজা (ভাইপো) বলে মনে করে। তার কাছ থেকে নায়ক ডাক্তার শোনে এই কথা—'মেহেরবানী করে মুখার্জি সাব আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি আজ নেই, তা বলে চাচা তো ভাতিজার সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না।' শুরু হল তরুণ ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জির জীবনে এক নতুন অধ্যায়। এখানেই ট্রিলজির সূচনা। কাল—বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক।

ট্রিলজির প্রথম পর্ব 'নির্জনে খেলা' (পৌষ ১৩৮২), দ্বিতীয় পর্ব 'নির্ঝরের গান' (মাঘ ১৩৯৩), তৃতীয় পর্ব 'তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি' (জানুয়ারি, ১৯৯৬/১৪০২)। তিনটি উপন্যাস কয়েকটি সংস্করণ পেরিয়ে একত্রে গ্রথিত হয়েছে চিত্তরঞ্জন মাইতির 'মধুমাধবী' শীর্ষক প্রেমের উপন্যাস সংকলনে (জানুয়ারি ২০০০, মাঘ ১৪০৬, দে'জ)। আমার অবলম্বন এই 'মধুমাধবী' সংকলন।

সুখের বিষয়, এই সংকলনের সূচনায় 'সৃষ্টির চালচিত্র' নামে একটি ভূমিকা লিখেছেন

শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি। ট্রিলজির চুম্বক আছে এই ভূমিকায়।

প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে প্রয়োজনমতো উদ্ধার করি—

"হিমালয়ের কান্তিময়ী কন্যাদের ভেতর কুলু অন্যতমা। কাশ্মীর, কিন্নর, কুলু, কাংড়া এই চার রূপবতী কন্যা পিতৃগৃহ আলো করে মত্ত হয়ে আছে আনন্দলীলায়। আমি আমার প্রথম যৌবনে নবীন সওদাগরের মত হাজির হয়েছিলাম ঐ নন্দনলোকের দ্বারে শুধুমাত্র চোখের কৌতূহল মেটাব বলে। কিন্তু ওদের দর্শনমাত্রেই আমি এক অদৃশ্য যাদুর সুতোয় জড়িয়ে পড়লাম। বারবার ফিরে এসেছি আমার কর্মস্থানে, কিন্তু কাজের মাঝেই টান পড়েছে সেই সম্মোহিনী সুতোয়। অঞ্জলি প্রেমিকার দুর্নিবার আকর্ষণের মত ছুটে গেছি তাদের মাঝখানে। সে দিনগুলো ছিল আমার চোখের উৎসব আর মনের উত্তেজনায় ভরা। ধীরে ধীরে প্রেমিকা একদিন প্রেয়সী হল। সে খুলে দিল আমার প্রেরণার উৎস-মুখ। আমি অনেকগুলি উপন্যাস লিখলাম ঐ আশ্চর্য রূপের জগতগুলিকে স্মরণ করে। 'কন্যা-কাশ্মীর', 'কিন্নরী', 'কালের রাখাল', 'নির্জন নির্ঝর' উপন্যাস" এই চার কন্যার কথাতেই ভরা।

'নির্জন নির্ঝর' উপন্যাসটিতে আমি নববধূর মত সলজ্জ কান্তিময়ী কুলুর অবগুণ্ঠন উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছি।

ঋতু-আবর্তনে কুলুর প্রসাধন-লীলা আমি দেখেছি দুচোখ ভরে। বাক্যহারা বিস্ময়ে নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি পাহাড়ি পথে চীর-পাইন বনে আলোছায়া খুঁজে খুঁজে। কখনো ক্লান্ত হলে বসে পড়েছি পাহাড়ি ছইয়ের (ঝর্ণা) ধারে। নুড়িতে নাড়া দিয়ে এক সুখকর শব্দের সৃষ্টি করে নিচের দিকে নেমে চলেছে সে জলধারা। সামনে বিস্তৃত মানালীর উপত্যকা। ওপারে পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্যের সংসার। ঠিক তার পরেই পীরপাঞ্জালের শুভ্র শৈল-শিখর। একটি পাহাড়ি স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে উপত্যকার বুকের উপর দিয়ে উপবীতের মত। বসন্ত উৎসবের আনন্দ কলরব কানে এসে বাজছে। আপেলের ডাল সাদা আর পিঙ্ক কুসুম স্তবকে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে সুসজ্জিত বন-কন্যারা শাখাবাহু মেলে অচেনা পথচারীদের ডাকছে উৎসবের আনন্দে যোগ দিতে।

তউন্দি বা গরমকালে ছোট ছোট ফিকে সবুজ পেয়ারার মত ফল ধরে আপেলের ডালে। বইতে থাকে গরম হাওয়া। সে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় মিহি পাহাড়িধুলো। মধ্যদিনে মনে হয় পাতলা একটা কাপড়ের পর্দা চোখের সামনে দুলছে। পর্দার ওপারের ছবি অদৃশ্য হয়ে যায়।

বসন্ত থেকে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি অবধি গদ্দী পহালরা ভেড়ার পাল নিয়ে ভ্যালি ছেড়ে ওপরের পাহাড়ে উঠতে থাকে।

সে এক সুদৃশ্য সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা। কোন কোন পালে পাঁচ সাতশো ভেড়া বকরী দেখা যায়। লোমওয়ালা কুকুরগুলো ছুটে ছুটে খ্যাঁকখোঁগ করে লাইনগুলো সিধে রাখে। ওরা জোৎ (পাস) পেরিয়ে নতুন-নতুন বুগিয়ালের (চারণভূমি) সন্ধানে চলতে থাকে।

গদ্দী মেষচারকদের পোশাক ভারী মজার। ঘাড় থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঢাকা একটি চোল। পায়ে নাগরা। মাথায় কুলুর কাজ করা সাদা টোপি। আর বকরীর লোমে তৈরি

একটা কালো লম্বা ডোর (দড়ি) পাকে পাকে কোমরে জড়ানো। ঐ ডোর থেকে পয়সা রাখার কজলু (থলে) আর একটা কুলহারা (কুঠার) ঝুলছে। গরম আর বর্ষা কালটা বৃষ্টিবিহীন বরফ-ছাওয়া পর্বতের কোলে কাটিয়ে ওরা আবার নামতে থাকবে শরতের শুরু থেকে ভ্যালির দিকে।

প্রচলিত প্রবাদে আছে, গদ্দানরা (গদ্দী রমণী) আরাধ্যদেবতা শিবকে ধূপ দিয়েছিল তাই খুশি হয়ে শিব তাদের দিলেন রূপ। গদ্দানদের চোখের দৃষ্টিতে নাকি ভানুমতীর খেলা আছে। তাই বিজ্ঞ মানুষরা সেদিকে তাকাতে বারণ করেন।

আমি কিন্তু বিভিন্ন গদ্দী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করেছি। তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। আমি তাদের যাযাবর সংসারে নারীপুরুষ নির্বিশেষে যে আতিথ্য পেয়েছি তা ভোলার নয়। শিবের বরে গদ্দানরা যথার্থই রূপবতী হয়েছে। তাদের মুখের হাসি চোখের অভিব্যক্তি সুন্দর কিন্তু চাহনিতে কোথাও কুহক-মায়ার ছায়া দেখিনি।

যারা ভুট্টাক্ষেতে, ধান গমের ক্ষেতে কাজ করছে সেসব মেয়েরা ভারী হাসি-খুশি আর রসিক। যারা গান গাইছে আর ধান রুইছে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোনো যুবক যদি হেসে তাকায় অথবা কিছু মন্তব্য করে তাহলে ঐ মেয়ের দল খিলখিল করে হাসি ছড়াবে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেবে তার পোশাক। বেচারী তখন পড়ি কি মরি করে পালাতে পথ পাবে না। ও যত ছুটবে, সারা মাঠের মেয়েরা কাজ ফেলে ওর চলার পথে জলতরঙ্গের মত হাসি ছড়াতে থাকবে।

যেসব মেয়েরা ভোরবেলা বনে কাঠ কুড়োতে যায় অথবা আপেল বাগানে আপেল তুলে ঝুড়ি ভর্তি করে তাদের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, ভোরের সোনালী সূর্যের জলে স্নান সেরে নিয়ে দিনের কাজে নেমেছে দেবকন্যারা।

পাহাড়ি নারী পুরুষের রক্তে এখনও পবিত্রতা সততা প্রবাহিত হচ্ছে। সমতলবাসীদের ধূর্ততা অথবা মালিন্য এখনও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।

এখানে প্রকৃতি আর মানুষ এমন অভিন্ন যোগে যুক্ত যে প্রকৃতিকে মানব-সংসারের একটি চরিত্র বলেই মনে করে।

জুনের মাঝামাঝি থেকে বরসাৎ শুরু হয়। মেঘসজ্জায়, বিদ্যুৎচমকে সে এক দৃষ্টিনন্দন সমারোহ। নালা, নালু, ছুই, কুহল—ছোট বড় সব স্রোতস্বিনী জলের স্পর্শ পেয়ে উতরোলে ধাবিত হয় বিপাশার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

এখানেও মেঘসজ্জা হলে বকের পাঁতি শ্বেতপদ্মের গ্রন্থিহীন মালার মত ভেসে ভেসে যায়। একবার মেঘ-গর্জন হলে বহুক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে সে শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এরই ভেতরে কিন্তু নির্ভীক পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা উপত্যকায় বহমান ছোট্ট নদী থেকে মৎস্য শিকার করে বেড়ায়। মোরি, লাললু, কুনলি, গুলগুলি—আরও কত মিষ্টি মধুর সব মৎস্য নামাবলী।

নীলে সোনায় মাখামাখি হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে কুলু উপত্যকা। শরৎ পায় সোনার সিংহাসনের অধিকার। শুরু হয়ে যায় আপেল বাগিচার কুলুর বিখ্যাত সোনালী আপেল

তোলার কাজ। অক্টোবরে ঘরে ঘরে সদ্য ক্ষেত থেকে তোলা ভুট্টার সে কি শোভা! প্রতিটি ঘরের ছাদ আর বারান্দায় বিছিয়ে দেওয়া হয় সোনালী আর কমলা রঙের ভুট্টার দানা। এক ঝাঁক চিড়ি পাখি 'কুইক্ কুইক্' আওয়াজ তুলে ফর্‌ফর্ পাখা টেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার দানাগুলো লুটে নেবার জন্যে।

এবার সেরা উৎসব দশেরা এসে যায়। কুলুর বিভিন্ন গাঁও থেকে বিপাশার কূলে ঢোল-ময়দানে এসে জড়ো হয় গ্রাম্য দেবতারা। প্রধানত নরসিং দেবতা। ঝকঝকে পেতলের মূর্তি। ভক্তের কাঁধে পালকি-বাহিত হয়ে দেবতারা এসে সম্মিলিত হন। কুলুর রাজা প্রথা মেনে পুরানো দিনের ঝলমলে পোশাক গায়ে চাপিয়ে এসে পৌছন মেলা-প্রাঙ্গণে। তিনি বিপাশার তীর অবধি টেনে নিয়ে যান রথ। শুরু হয়ে যায় উৎসব।

রাতে খোলা আকাশের নিচে বনের কোলে স্টেজ বেঁধে আসর বসে নাচ আর গানের। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে শিল্পীরা সে উৎসবে যোগ দিতে। সেই সম্মিলিত, দ্বৈত আর একক নাচ না দেখলে কলাবতী কুলুকে পুরোপুরি জানা যাবে না। সে নাচ গন্ধর্বলোকেই বুঝি সম্ভব। বিপাশার কূলে অরণ্যের কোলে সামান্য রঙের ছোঁয়া লাগা সাদা পোশাকে নারী আর পুরুষ যথার্থই গন্ধর্ব আর গন্ধর্বী।

নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারির পাশে দুটো ফারগাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি।....আজ কোন একটি উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আর্ট গ্যালারি বন্ধ। এতখানি পাহাড়ের ওপর উঠে এসে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তাই হতাশা।

দ্বাররক্ষী আমাকে এই খবরটুকু জানিয়েই স্থানান্তরে চলে গিয়েছে। আমি এখন ঘুরে ঘুরে শিল্পীর স্থান নির্বাচনের কথা ভাবছি। হঠাৎ মেয়েলি গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

'আসুন, আজ ছুটির দিন, তাই বন্ধ ছিল। এতটা ওপরে উঠে এসে ফিরে যাবেন, দেখে যান।'

টিপিক্যাল কুলুর পোশাক পরা এক তরুণী। গোল্ডেন অ্যাপেলের মত মুখ। লম্বা বিনুনী। শেষ প্রান্তে লাল একটা ট্যাসেল ঝুমকোর মত ঝুলে আছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওকে অনুসরণ করে আর্ট গ্যালারিতে ঢুকলাম। পাশ থেকে দেখলাম, ওর ছোট্ট কানের দুলটা টুলটুল করে নড়ছে। তরুণী আমাকে যত্ন করে সবকটি ছবি দেখাল। ব্যাখ্যা করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বলে চলল।.......

এক সময় বেরিয়ে এলাম বাইরে। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। বাঁক ঘোরার আগে একবার ফিরে তাকালাম পেছন দিকে। তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। হাল্‌কা একখণ্ড কুয়াশা মসলিনের ওড়নার মত দুলছে তার সামনে।

সারা উপত্যকা সেই মুহূর্তে আমার চোখের ওপর একটা স্বরলিপির পাতা মেলে ধরল। আমি মনে মনে গুনগুন করে সুর সাধতে লাগলাম। সেই সুরের ভেতর থেকে জেগে উঠল এক তরুণী। আমার 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের নায়িকা ঝিন্নি।....

কুলুর মোহময় পরিবেশে যখন নায়ক ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি ও নায়িকা ঝিন্নির হৃদয় বিনিময়ের খেলা একটা বিশেষ পর্বে এসে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই এক দরিদ্র পণ্ডিতজীর

মাতৃহারা কন্যা বালুর আবির্ভাব। তরুণী বালুর ভেতর বিশেষ এক ধরনের বিনম্র আবেদন আছে। ডাক্তার মুখার্জি দরিদ্র পরিবারটিকে সাহায্যের জন্য বালুকে তার ডিসপেনসারির কাজে নিযুক্ত করলেন। দূর পাহাড়ি পল্লীতে ডেলিভারি কেসগুলো অ্যাটেন্ড করার জন্য টাটুতে চড়ে যখন ডাক্তার যাত্রা করেন তখন ডাক্তারের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায় বালু। কখনো- বা সে ডাক্তারের কাজে সাহায্য করে। রাতে যখন চাঁদ ওঠে তখন হয়ত দেখা যায় ভ্যালিতে নেমে ডাক্তার হেঁটে আসছে, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বালু।

এ খবরটুকু পৌঁছে যায় নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারিতে ডাক্তারের প্রেমিকা ঝিন্নির কানে। একটা চাপা বেদনা হেমন্তের কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করতে থাকে ঝিন্নির হৃদয়ে।....

তাহলে কি কাহিনির পরিণতি বিয়োগান্ত হবে?...পরিণতিটা এমনভাবে টানলাম, যাতে মিলন বিরহের মাঝখানের ভূমিতে দাঁড়িয়ে রইল আমার নায়ক নায়িকা। তখন নাগগ্‌রে কোলি-রি-দেওয়ালির হাউই উঠছে রাতের আকাশকে ভরে দিয়ে।....

পরিণতিটা কি হবে? পরবর্তী পর্ব 'নির্ঝরের গান' লিখে ঝিন্নি আর ডাক্তার মুখার্জির বিরহ বিধুর প্রেমলীলাকে মিলনমধুর করতে হল। সেখানে ঝিন্নির কোল জুড়ে এল কিশোরী। তৃতীয় পর্বে তারই প্রেম নিয়ে লেখা 'তিন্‌নির রোদ আর বৃষ্টি'। এখানেই প্রেমের ট্রিলজি সম্পূর্ণ হল।"

দুই

'সৃষ্টির চালচিত্র' এই ভূমিকার পরে এবার আমরা কুলুর প্রেমের ট্রিলজির প্রথম পর্ব 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

পুষ্করের প্রয়াত পিতা মুখার্জি যার উপর তাঁর বাগ্‌-বাগিচার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন সেই প্রৌঢ় নরসিংলালজীর সঙ্গেই তরুণ ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি এম. এস. ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় মানালী থেকে নেমে এলো কুলুতে। এখান থেকেই শুরু হল 'নির্জনে খেলা' উপন্যাস। সেখানেই চাচাজী নরসিংলালের মাতৃহারা কন্যা ঝিন্নির সঙ্গে ডাক্তারের প্রথম দেখা। যে কোঠীতে ডাক্তার পৌঁছল সে কোঠী তারই প্রয়াত পিতার। নরসিংলালজী বেইমানি করে না, বলল 'এ কোঠী তুম্‌হারা বাবুজী। এ বাগিচা ভি তুমহারা। মুখার্জি সাব মেহেরবানী করে আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। তিনি আজ নেই, তা বলে চাচা তো ভাতিজার সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না।'

তরুণ ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি কোঠীর যে কামরায় পৌঁছল, সেখানেই থাকতেন তার পিতা। এলো ঝিন্নি, জ্বালাল বিজলী বাত্তী, দিল চা আর খাবার। ডাক্তার আলোয় দেখল ঝিন্নিকে। ঝিন্নি তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলায় ডাক্তার চমকে উঠল। ঝিন্নি জানাল, বাংলা শিখেছে পিতাজির কাছে। আরেকবার আশ্চর্য হল ডাক্তার। ঝিন্নি তারই প্রয়াত পিতাকে বলছে পিতাজী, আর নিজের বাপ নরসিংলালকে বলে, চাচাজী। ডাক্তার জানল, নরসিংলালের প্রয়াত পত্নী ডাক্তারের পিতাকে জিজাজী বলে ডাকত। তারপর দুই বছরের

মধ্যে দুজনেই চলে গেল। পিতার মৃত্যুর বছর দুয়েক পরে ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি চলে এল কুলু উপত্যকায়। চাচাজী নরসিংলালের কাছে শুনল, তার প্রয়াত পিতা কীরকম ভবঘুরে ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। পশমিনা আর আপেলের ব্যবসা করে কীভাবে আয় করেছেন, তার 'গোল্ডেন অর্চার্ড'কে কীভাবে তৈরি করে তুলেছেন। তিনি প্রয়াত পত্নীকে স্মরণ করতেন। তেমনি মাতৃহারা পুত্রকে মানিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে পুষ্করকে সার্জেন ডাক্তার হয়ে ওঠায় সাহায্য করেছেন। নরসিংলালজীর কাছেই পুষ্কর মুখার্জি জেনেছে তার পরদুঃখকাতর পিতার হৃদয়ে পুত্রের জন্য কতো মমতা সঞ্চিত ছিল।

'নির্জনে খেলা' উপন্যাসটি প্রকৃতির ফ্রেমে বাঁধানো। প্রয়াত পিতাকে স্মরণ, নরসিংলালজীর মুখে কুলু উপত্যকার বিবরণ শ্রবণ আর তার পুত্রী ঝিন্নির সাহচর্য পুষ্করকে দিয়েছে এক নতুন জীবনের প্রথম পাঠ।

স্বীকার্য, 'নির্জনে খেলা' প্রেমের উপন্যাস। সে প্রেমের দুটি রূপ; একটি প্রাকৃতিক, আরেকটি মানবিক। শেষ ডিসেম্বরে এসে পুষ্কর আবিষ্কার করে নতুন এক ভুবনকে। একদিকে প্রকৃতির চিত্তহারিণী রূপ তার চিত্তকে ভরে দেয়, অপরদিকে সুন্দরী তরুণী ঝিন্নির খোলামেলা মনোহারিণী রূপ তার মনকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে ভরে দেয়।

মানালী শহরে প্র্যাকটিস শুরু করে পুষ্কর ডাক্তার। তার পূর্বে কুলুতে নরসিংলালজীর কাছে এসে তার প্রয়াত পিতার কোঠী আর আপেল বাগানকে চেনে, অন্যদিকে নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারিতে কেয়ারটেকার ঝিন্নির সাহচর্যে কুলুর কোঠি আর বাগানে পুষ্কর আবিষ্কার করে জীবনের নব রূপকে। সকালে কোঠী থেকে বেরিয়ে কুলুর শান্ত সুন্দর নির্জন পরিবেশে ঘুরে বেড়ায় পুষ্কর আর মনে মনে পরলোকগত পিতৃদেবের স্থান-নির্বাচনকে তারিফ করে। (পৃ ১৪৬)। ঝিন্নিকে সে বলে, 'ঘর থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। পাহাড় ঘুরে একবার এখানে (বিপাশার তীরে) পৌঁছলে মনে হয়, একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করে ফেললাম।' (পৃ ১৪৬)

এভাবেই লেখক পুষ্করের সঙ্গে পাঠককে নিয়ে যান এক নতুন দেশে।

বারেবারেই উঠে আসে অপরূপা সুন্দরী প্রকৃতির ছবি।

"নদীটা বেশখানিক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওপারে পাহাড়। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়ে বরফ ঝকঝক করছে। নীল জলের একটানা স্রোত। কোথাও পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনার তুলো ধুনছে।

বললাম, তোমার দেশের তুলনা নেই ঝিন্নি।

ও বলল, আমার দেশ বলছেন কেন? এ দেশ কি আপনারও নয়?

বললাম, তা ঠিক। এখানে নতুন যা কিছু দেখছি সবই ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে কুলু ভ্যালি ছেড়ে যেদিন চলে যাব, সেদিন সত্যি কষ্ট হবে।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর খানিকটা বিস্ময়মাখা দৃষ্টি ফেলে বলল, চাচাজী (আসলে তার পিতা নরসিংলালজী) তবে কেন বললেন যে আপনি মানালীতেই প্র্যাকটিস করবেন।" (পৃ ১৪৬)

এইসব প্রাথমিক আলাপে পাঠক যে সংকেতটি পায় তা-ই পরে সত্য হয়ে ওঠে। পুষ্কর

ডাক্তার আর কোনদিন কুলু ভ্যালি ছেড়ে যেতে পারবে না। সে ভালবাসতে শুরু করে কুলু উপত্যকাকে। সেইসঙ্গে ঝিন্নিকে।

"যে অতীতকে আমরা কোনদিনও ফিরে পাব না তার জন্যে মনের ভেতর গভীর এক মমতা থাকে। বাইরের হাওয়ায় যখন অতীতের জানালাটা খুলে যায়, তখন ঐ কোমল মমতার গায়ে ছোঁয়া লাগে। আর অমনি ঝিরঝির করে ঝরতে থাকে ব্যথার নদীটা।" (পৃ ১৪৭)

লেখক-কৃত এই মন্তব্যের দিশা-নির্দেশে পাঠক জানতে পারে, একদিন পুষ্কর ডাক্তারের পিতাকে নরসিংলালের পত্নী যত্ন করে খাওয়াতেন, ঠিক তেমনভাবেই আজ ঝিন্নি যত্ন করে পুষ্করকে খাওয়াচ্ছে।

নরসিংলালজী পুষ্করকে সাবধান করে দিলেন। এখানে বনে বনে পাহাড়ের খাঁচ খোঁচে যোর্‌নীরা (ইভিল স্পিরিট) থাকে। তাদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। তাই ঝিন্নি-ই পুষ্করকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে।

পূর্বেই লিখেছি, এই উপন্যাসে লেখক আমাদের এই সুন্দর নিসর্গলোকে বারবার নিয়ে যাচ্ছেন। তাই পাঠক পেয়ে যায় এই ধরনের বর্ণনা—

"আমরা এখন নদীর দিকের পাহাড়টাকে ডাইনে রেখে চলেছি। ঝিন্নি একটু পরেই বাঁ-দিকে বেঁকে একটা অতি সংকীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগল।.....আমরা ক্ষেত পেরিয়ে আসার সময় কাটা ফসলের পরিত্যক্ত অংশগুলো পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নামতে লাগলাম। অনেকটা নিচে নেমে কয়েকটা দেওদারের জটলার ভেতর এসে পড়লাম। ....হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে ছুঁয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিঠে আওয়াজ কানে এসে বাজল। ঝিন্নি এতক্ষণ একটি সোনার হরিণের মত শেষ বেলার রোদ্দুর গায়ে মেখে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল আর আমি সেই রবিঠাকুরের গানের মনোহরণ চপলচরণ হরিণটিকে অনুসরণ করে চলছিলাম। এখন ঝিন্নি থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গলায় আমন্ত্রণের সুর তুলে বলল, এটা একেবারে আমার নিজস্ব জায়গা। আসুন বসা যাক।

বলতে বলতে আরও খানিকটা এগিয়ে দেওদারের জটলার ভেতর ঢুকল ঝিন্নি। আমিও ওর পেছনে পেছনে বনের ভেতর ঢুকলাম। একটুখানি ভেতরে গিয়েই ঝর্ণাটার দেখা পেলাম। দুটো দেওদারের পাশ কাটিয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আধখানা বেড় দিয়ে জলের ধাপে নেমে গেছে। ঝিন্নি বলল, জায়গাটা সুন্দর না? বসা যাক এখানে।

বসলাম। আমার খুব ভালো লাগছিল। ঝিন্নি আমার একটু তফাতে ঐ পাথরের চাঁইটার নিচের ধারায় পা ঝুলিয়ে বসল।

.....বললাম, আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। মনে হচ্ছে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যেন পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছে এখানে।

দেখলাম, আমার কথা শুনেই কেমন যেন চমক লাগলো ঝিন্নির দেহে। সে কিন্তু আমার দিকে চাইল না। মুখটা একবার তুলেই ঝর্ণার দিকে চোখ নামাল।

ঝিন্নি গাঢ় মেরুন রঙের একটা পোশাক পরেছে।.....গাঢ় নীল রঙের একটা ব্ল্যাঙ্কেট ঝিন্নির কোমর জড়িয়ে আছে। বুকের ওপর পড়ে আছে হারখানা। লাপিস লাজুলি পাথর

সেট করা পেন্ডেন্টটা ওর বুকের ওপর জেগে ওঠা দুটি নিটোল স্তূপের মাঝখানের উপত্যকায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

এইমাত্র শেষ বেলার কয়েক টুকরো রোদ ডালপালার ফাঁকে এসে পড়ল ঝর্ণা আর ঝিন্নির ওপর। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ঝিন্নি অসাধারণ। ওর তারুণ্য বেলাশেষের রোদ মেখে ঝর্ণার জলে যেন সোনার বিন্দুর মত গড়িয়ে পড়তে লাগল।" (পৃ ১৪৮১৪৯)

পুষ্করের ঝিন্নিকে এই ভালো লাগা যে কোন একদিন ভালোবাসায় পৌঁছবে, এ হল তারই সূচনা। বস্তুত দুটি তরুণ-তরুণীকে কাছাকাছি আনার সূত্রপাত। ভাষা, জাতপাত, সংস্কার—সব কিছুকে তুচ্ছ করে ভালোবাসার শেষ বিজয়ের ইঙ্গিত এখানে পাই।

কিন্তু জীবন তো সরল রেখায় চলে না, চলে সর্পিল গতিতে। 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই এক এক করে আসে নতুন নতুন চরিত্র।

ঝর্ণার ধারে সেই নির্জন সুন্দর স্থানে বসে পুষ্কর ঝিন্নির সঙ্গে এই প্রথম মন খুলে কথা বলেছে—

"ঝিন্নি তুমি ভাল করেই জানো, মা মারা যাবার পরে আর বাপকে কাছে পাইনি। দশ বছরের ছেলে, থেকেছি মাসির বাড়ি। তারপর আরও পনেরটা বছর কেটে গেছে কলকাতায়। শুধু মাসের প্রথমে মানি অর্ডারের পাতায় ছিল বাবা আর ছেলের যোগাযোগ। সেদিক থেকে তোমরা তাঁর অনেক কাছের মানুষ। অনেক আপনার জন। তাই তাঁর এই কুলু ভ্যালির দু'দুটো সম্পত্তির ওপর তোমাদের দাবীটা আমার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং অনেক বেশি বলেই মনে হয় আমার।" (পৃ ১৪৯)

পুষ্করের এই মন-খোলা কথায় ঝিন্নির প্রতিক্রিয়া চমৎকার।—"হঠাৎ কি হলো ঝিন্নির, চোখ দুটো তার ছলছলিয়ে উঠল। দুটো হাতের পাতায় সে মুখ ঢেকে ফেলল।

বললাম 'কি হল ঝিন্নি, অমন করছ কেন?' ও আমার কথায় আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। এই প্রথম আমি ঝিন্নির মাথায় হাত রেখে নাড়া দিয়ে বললাম, কান্নার কি হল ঝিন্নি. আমি তো তোমায় আঘাত দিয়ে কোন কথা বলি নি।" (পৃ ১৫০)

অনুভবী পাঠক বুঝতে পারেন তরুণী ঝিন্নির হৃদয়ে জন্ম নিচ্ছে ভালোবাসা। কথা বলতে বলতে পুষ্কর আর ঝিন্নি এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে ঝর্ণার জল থেকে রোদের সোনালী উত্তরীয়খানা কখন পাহাড়ের আড়ালে উড়ে চলে গেছে তা দুজনে অনুধাবন করে নি। তবে একটা ভালো লাগা তাদের দুজনের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

তখনি ঝড় উঠল। দুজনে ফিরে এলো বাংলোবাড়িতে। তারপর নরসিংলালজী আর দুই তরুণ-তরুণী ঘরে বসে গল্প করেছে।

এই চিত্তহারী বর্ণনার শেষে পাঠকের মনে যে প্রত্যাশা ঘনিয়ে ওঠে তা কিন্তু অচিরেই সফলতা পায় না।

ঘুমের মধ্যে অনেক রাতে পুষ্কর অনুভব করে তার ঘরে কে যেন এসেছে। ঘুম ভেঙে যায়। দেখে ঝিন্নি তারে ঘরের রুম-হিটারটা জ্বালিয়ে দিতে এসেছে। সেই ডিসেম্বরের শীত-রাতে দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করেছে, দুটি মন এসেছে কাছাকাছি। ঝিন্নির

কথায় পুষ্কর জেনেছে যে তার পিতা তার কিশোর মুখে তার পত্নীর আদল দেখে অস্থির হয়ে পড়বেন, সেই আশঙ্কাতেই কলকাতায় ফিরে যাননি। পুষ্কর জানিয়েছে, বিষয় সম্পত্তির টানে সে কলকাতা থেকে কুলুতে আসেনি। এসেছিল বাবার সম্পর্কে কৌতূহল মেটাতে। তার বাবাকে পুষ্করের মনে হতো মিষ্টিরিয়াস মানুষ, ছেলের জন্যে টাকা পাঠান কিন্তু কাছে আসেন না। পুষ্কর তিনমাস মানালীতে কাটিয়েছে নরসিংলালজীর কাছে। আজ দুমাসের জন্যে এসেছে কুলুর বাংলোতে। সে আর কলকাতা ফিরতে চায় না। মানালীতেই ডিসপেনসারি খুলে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে চায়।

দুজনের এই কথাবার্তার মাধ্যমে লেখক পাঠককে পুষ্কর ও ঝিন্নির মনোভাব অবগত করাতে চান। ঝিন্নি কাজ করে নাগ্গরে রেয়োরিখ আর্ট গ্যালারিতে গাইড হিসেবে।

তিনজনে তিন জায়গায়। দূরত্ব বেশি নয়। নরসিংলালজী থাকবেন কুলু গ্রামে 'গোল্ডেন অর্চার্ড' দুই আপেল-বাগিচার পরিচর্যা নিয়ে, পুষ্কর মানালীতে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করবে আর ঝিন্নি নাগ্গরে রেয়োরিখ আর্ট গ্যালারিতে গাইডের কাজ করবে। স্থানিক ব্যবধানে তিনজনে রইল, কিন্তু মনের দিক থেকে তারা দূরে থাকছে না—এই ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক।

কুলু উপত্যকায় প্রধান উৎসব দুটি। শরতে আপেল বাগিচার বিখ্যাত সোনালী আপেল তোলার কাজ। অক্টোবরে ক্ষেত থেকে ভুট্টা তোলার কাজ। এরপরেই এসে যায় দশেরা উৎসব। বিভিন্ন গাঁও থেকে বিপাশার ঢোল ময়দানে এসে জড়ো হয় গ্রাম-দেবতারা। শুরু হয়ে যায় দশেরার মেলা। খোলা আকাশের নিচে স্টেজ বেঁধে বসে নাচগানের আসর। কলাবতী কুলুকে যথার্থভাবে জানতে হলে দেখতেই হবে এই উৎসব। নরসিংলালজী ও তার কন্যা ঝিন্নির সঙ্গে কলকাতার ছেলে পুষ্কর ডাক্তার এই প্রথম দেখল এই উৎসব। তারপরেই আসে দেওয়ালি ফেস্টিভ্যাল। ডিসেম্বরের শীতেই অনুষ্ঠিত হয় দেওয়ালি উৎসব। তামাম কুলু মেতে ওঠে কোলি-রি-দেওয়ালিতে—দীপ জ্বলে, বাজি পোড়ে, আকাশ জুড়ে রোশনাই হয় নাগ্গরে। অক্টোবরে বিপাশার তীরে দশেরা উৎসব, আর ডিসেম্বরে তীব্র শীতে নাগ্গরে কোলি-রি-দেওয়ালি।

পুষ্কর এই দুই উৎসবেই যোগ দেয়। দশেরা উৎসবে পুষ্কর যোগ দেয় পিতা-পুত্রীর সঙ্গে। আর কোলি-রি-দেওয়ালিতে যোগ দেয় ঝিন্নির সঙ্গে। এই দুই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে দুটি তরুণ-তরুণী মনের খুব কাছাকাছি এসে যায়।

পূর্বেই লিখেছি, জীবনের গতিপথ সরল রেখায় চলে না। পুষ্কর আর ঝিন্নির মাঝখানে এসে যায় এক গরীব পণ্ডিতজীর মাতৃহারা কন্যা বালু। ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি গরিব পরিবারটিকে সাহারা দেবার জন্যে তরুণী বালুকে মানালীতে তার ডিসপেনসারিতে নিযুক্ত করেন। রোগীর প্রাথমিক পরিচর্যা, দূর গাঁওতে ডাক্তার যখন ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে যায় তখন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সঙ্গে যাওয়া, সেখানে ডাক্তারকে নানাভাবে সাহায্য করার কাজ পেয়ে বালু নিজেকে ধন্য মনে করে।

এই সংবাদ পৌঁছে যায় নাগ্গরে রেয়োরিখ আর্ট গ্যালারিতে ঝিন্নির কাছে। ক্ষোভে বেদনায় ভরে যায় ঝিন্নির হৃদয়।

আখরা বাজারে মেষচারক গদ্দী সম্প্রদায়ের ভাগ্‌তু নামে এক কিশোর কাজ করে লী সাহেবের বাংলোয়। আসন্ন বড়দিনের উৎসবের প্রাক্কালে একটা ভারি পাথর হঠাৎ ওপর থেকে গড়িয়ে ভাগ্‌তুর পায়ের উপর পড়ে। লী সাহেব ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। দেখা গেল ভাগ্‌তুর এক পায়ের সবকটা আঙুল থেঁতলে গেছে। অপারেশন করা ছাড়া উপায় নেই। আঙুলগুলি কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ডাক্তার জিপগাড়িতে ভাগ্‌তু, ঝিন্নি, লী সাহেব আর বেনন সাহেবের ছেলেকে নিয়ে মানালীর বাংলোতে পৌঁছে গেল। তখনি ভাগ্‌তুর পায়ে সার্জারি হল, বাদ গেল পায়ের আঙুলগুলি। লী সাহেবের বাংলোতে গিয়ে ডাক্তার আর ঝিন্নি তাদের বড়দিনের উৎসব দেখল। এই ঘটনাদুটি ডাক্তার আর ঝিন্নিকে আরো কাছাকাছি নিয়ে এলো।

কিন্তু লী সাহেব-প্রদত্ত টাট্টু চড়ে বালুকে নিয়ে ডাক্তার যখন দূর গাঁওয়ে রোগী দেখতে লাগল তখনি ডাক্তার আর ঝিন্নির মধ্যে গড়ে উঠল দূরত্ব। কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি তার ফল।

তখন থেকে পঙ্গু কিশোর ভাগ্‌তু আশ্রয় পেল পুষ্কর ডাক্তারের কাছে।

কোলি-রি-দেওয়ালি উৎসবে অংশ নিতে কুলু থেকে ডাক্তার এলো নাগ্‌গরে। সঙ্গে ঝিন্নি। আর্ট গ্যালারির পাশে ঝিন্নির কোয়ার্টারে পৌঁছে ডাক্তারের মনে হল—'সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে যেন শূন্যলোকে রয়েছে। সেখান থেকে পৃথিবীর আশ্চর্য সব ছবি দেখছে। ডাক্তার দেখছে তার তিনদিক ঘিরে গভীর উপত্যকা। সবুজ চাদর বিছানো। রোদ্দুরে নানা ধরনের সবুজের ছবি ফুটছে। উপত্যকার বুকের ওপর যে অগোছালো সাদা কাপড়ের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে ধবধবে সাদা একটা নদী। দক্ষিণের পাহাড়ে নিবিড় বন। নিচে ব্লু পাইন। দূর দক্ষিণে দুটো নীলাভ পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের চূড়ার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দুধের মতো সাদা একটি পর্বতশীর্ষ। পীরপাঞ্জালের কোনো একটি তুষার ধবল শৃঙ্গ।' (পৃ ১৭৪)

এই অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যের সামনে লেখক পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। পুষ্কর ডাক্তারের সঙ্গে পাঠকও সুন্দরের সামনে বাক্যহারা হয়ে যায়।

ঝিন্নির সঙ্গে পুষ্কর রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারি দেখে। তারপর সন্ধে নামল। ঝিন্নির জানালায় দাঁড়িয়ে পুষ্কর কোলি-রি-দেওয়ালি দেখছিল। নৈশাকাশে একের পর এক হাউই আলো ছড়াচ্ছে। মনে হয় ঝাঁকে ঝাঁকে উজ্জ্বল সাদা সাদা ফুল ফুটে উঠছে। (পৃ ১৭৯-১৮০)। এই সুন্দর দৃশ্য দুটি তরুণ-তরুণীকে মনের কাছাকাছি এনেছে। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। সে রাতে পুষ্কর ঝিন্নিকে বুকে চেপে রেখে গভীর প্রেমে ডুব দিয়েছে। (পৃ ১৮০-১৮১)।

দুদিন পরে দুজনে নাগ্‌গরে মেলা দেখেছে। (পৃ ১৮২-১৮৪)। গদ্দী মেয়েরা সুর করে গাইছিল শিবের গান—'গদ্দী চরদা ভেদন। গাদ্দান দিন্‌দি ভূপ।। গদ্দী জো দিন্‌দা ভেদন গাদ্দান জো দিনদা রূপ।।' ঘরে ফিরে ডাক্তারের অনুরোধে ঝিন্নি সেই গানই আবার গাইল। ঝিন্নি স্বীকার করল—'প্রথম যেদিন তুমি চাচাজীর সঙ্গে এলে সেই দিনটি থেকেই আমার সমস্ত মন তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত ছোটে সাহেব।....শুধু মুখ ফুটে বলতে পারিনি, আমি তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে একটু চুপচাপ থাকতে চাই।' (পৃ ১৮৭) সেদিন

থেকেই ঝিন্নি আর পুষ্কর ডাক্তার দুজনে রচনা করেছে স্বর্গলোক। যেখানে কেবল তারা দুজন মাত্র অধিবাসী। (পৃ ১৮৮-১৯৪)। পুষ্করের মনে হল, এভাবেই যেন তারা থাকতে পারে। (পৃ ২০০)

তবু মানালীতে ফিরে এসে পুষ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়ে রোগী দেখায়। নাগ্‌গর আর মানালী—দুই শহরে থাকে দুইজনে, চিঠি লেখে পরস্পরকে। পুষ্কর ঝিন্নির চিঠিগুলি পড়ে আর তার মনে হয়, ঝিন্নির বুক ভরে আছে ভালোবাসার বর্ষা আর বসন্ত। (পৃ ২১৫)

কিন্তু বালুকে নিয়ে দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হল ভুল বোঝাবুঝি। সে ভুল ভাঙল যখন বেনন পরিবারের জুলিয়েন অসীম ঔদার্যে বালুকে তার জীবনে গ্রহণ করে, তাকে বিবাহ করে। (পৃ ২৩৬-২৫৩)। তার পূর্বে ঝিন্নির চিঠি পায় ডাক্তার। (পৃ ২৫৪-২৫৫)। তাতে পড়েছে দূরত্বের ছায়া।

এক বছর কেটে গেছে। ফের এসেছে ডিসেম্বর। এলো কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব। পুষ্করের মনে হয় কী করে সে ঝিন্নির ভালোবাসা ফিরে পাবে। গত ডিসেম্বরে ঝিন্নির সঙ্গে পুষ্কর দিন-রাত কাটিয়েছে, কিন্তু এই ডিসেম্বরে ঝিন্নি কোথায়? মিলন-বিরহের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্কর। (পৃ ২৬৫-২৬৭)।

এখানেই 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের সমাপ্তি।

তিন

দ্বিতীয় পর্ব 'নির্ঝরের গান'। এটিও কুলু উপত্যকার ফ্রেমে বাঁধা। তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দিল্লি আর কাশ্মীর। প্রথম পর্বের শেষে স্বপ্ন আর বাস্তবের নীলাভ প্রদেশ থেকে চলে এসেছে ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি। বাস্তবের কঠিন জমিতে পা রাখতে পেরেছে। সমস্ত দ্বিধা সংশয় দূর করে পুষ্কর আর ঝিন্নি পরস্পরকে স্বামী স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে। তাদের পাশাপাশি সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত—জুলিয়েন বেনন আর বালুর সুখে ভরা দাম্পত্য জীবন। বালুর জীবনে ঘটেছিল যে দুর্বিপাক, তার থেকে তাকে উদ্ধার করে জুলিয়েন বেনন। বিদেশি সাহেব পর্যটকের ফাঁদে পড়ে বালুর যে সর্বনাশ হয়েছিল, ঘটেছিল অপমান, তা থেকে তাকে উদ্ধার করে জুলিয়েন বেনন। বালুর শরীর থেকে সব ক্লেদ মুছে ফেলে তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিল বেনন।

'নির্ঝরের গান' উপন্যাসের সূচনায় পাঠক পেয়ে যায় দুটি বিবাহিত দম্পতিকে—পুষ্কর-ঝিন্নি আর জুলিয়েন-বালু। দুই দম্পতির বিবাহ পুরনো হয়ে যায় নি, দুই পুরুষ—পুষ্কর আর বেনন অনেক জাতপাত ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের বাধা পেরিয়ে গ্রহণ করেছিল নিজ নিজ রমণীকে। কুলু উপত্যকায় মাথার উপর নির্মল আকাশ। দিগন্তের ধানগম্ভীর পীরপাঞ্জাল শিখর আর চারপাশে রম্য নিসর্গের পটভূমিতে এই দুই দম্পতির জীবনধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।

পুষ্কর-ঝিন্নির দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে যে শূন্যতা ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে জুলিয়েন বালুর ভরে ওঠা দাম্পত্য-জীবনের পাশে।

উপন্যাসের সূচনায় পুষ্কর-ঝিন্নি রাতের অন্ধকারে খেতে বসে শুনতে পায় কারা যেন আসছে। এখানে লেখক একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। পুষ্কর অনুধাবন করে ঝিন্নি এক রহস্যময়ী নারী; 'ঝিন্নি অনেক দূরের জিনিস যেন স্পষ্ট দেখতে পায় তেমনি অনেক দূরের শব্দও আশ্চর্যভাবে ওর কানে এসে বাজে।' (পৃ ২৬৯)

কলকাতা শহরে যার প্রথম যৌবন কেটেছে, সেই পুষ্কর ডাক্তার শ্রবণেন্দ্রিয় আর দর্শনেন্দ্রিয়ের সামর্থ্যে হেরে যায় পার্বতী নন্দিনী ঝিন্নির কাছে।

সত্যিই ঝিন্নির অনুমান ঠিক। অনেক দূর থেকে পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ বেয়ে আসছে একটি হেডলাইট-জ্বালা জীপ।

হঠাৎই এলো তাদের বন্ধু-দম্পতি—জুলিয়েন আর বালু। পরস্পরকে দেখে চারজনেই খুব খুশি। মাত্র এক রাতের জন্যই এসেছে জুলিয়েন আর বালু। একদিন পরেই জুলিয়েন জরুরি কাজে চলে যাবে সিমলা। জানা গেল জুলিয়েন বেননের পরিবারে পূর্বেই যোগ ঘটেছিল ভারতের। তার ঠাকুমা ছিলেন ভারতীয়। এক পুরুষ বাদে জুলিয়েন বেনন আবার সম্পর্ক পাতাল ভারতীয় মেয়ে পাহাড়ি মেয়ে বালুর সঙ্গে।

পুষ্কর বোঝে নি, কিন্তু ঝিন্নি বুঝেছে জুলিয়েনের হেঁয়ালি-ভরা কথা। জুলিয়েন বলল—"বাগান তৈরি অব্দি আমার কাজ, কিন্তু গাছের ফল, তার পরিচর্যা আর রক্ষার ভার বালুর হাতে।....বাগানে ফল তো ভালই ধরেছে। কিন্তু তার বিপর্যয়ের কথাটা তোমার অজানা নয়। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া। ক্লাইং ফক্সের উৎপাত। বরফপাত। এসব দুর্যোগ কাটিয়ে উঠলে তবেই তো কুলুর গোল্ডেন অ্যাপেলের স্বপ্ন সার্থক হবে।" (পৃ ২৭২)

একথার নিগূঢ় তাৎপর্য পুষ্কর বোঝে নি, কিন্তু ঝিন্নি বুঝেছে। আহারে গল্পে হাসিতে চারজনে মধ্যরাত পার করে দেয়। তারপর দু ঘরে শুতে যায় দুই দম্পতি। সে রাতেই শয্যায় ঝিন্নি পুষ্করকে শুধায়—'কিছু বুঝলে?' পুষ্কর ডাক্তার তখনি বোঝে নি। ঝিন্নি বললে—'আপেলের গাছ মা হয় কখন? যখন তার ফল ধরে। বালু মা হতে চলেছে।' (পৃ ২৭৪)

এতক্ষণে পুষ্কর ডাক্তারের বোধগম্য হল জুলিয়েনের বর্ণনা—অর্চার্ড ফল তো ধরেছে। কিন্তু তাকে রক্ষা ও পরিচর্যা করাটাই তো আসল কথা।

ততক্ষণে ঝিন্নি পুষ্করের বুকে জোর করে মুখখানা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তখন পুষ্কর অনুধাবন করল—"এতক্ষণ একটি নারীর মাতৃত্বকে নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে গিয়ে আর এক বঞ্চিতাকে কতখানি ব্যথা দিয়ে ফেললাম তা বুঝে উঠতে পারিনি।" (পৃ ২৭৪)

বিদেশি পর্যটক-ধর্ষিতা বালুকে সমাদরে প্রেমে সম্মানে গ্রহণ করেছে জুলিয়েন, তাকে বিবাহ করেছে, আর এক বছরের মধ্যেই জানা গেল বালু জুলিয়েনের সন্তানের মা হতে চলেছে। এদিকে দুবছর বিবাহের পরও ঝিন্নি কবে মা হবে তা ঝিন্নির জানা নেই। একারণেই ঝিন্নির কান্না। জুলিয়েন তো আগে একটা কাজ করেছিল। পুষ্কর ডাক্তারের সহকারিণী হয়ে বালু কাজ করছিল বলে তার দুর্নাম হয়েছিল, ঝিন্নিও সেই দুর্নাম বিশ্বাস করেছিল। তার থেকেও জুলিয়েন তাদের প্রেমকে বাঁচিয়েছে।

তার আদরের ছোটোসাহেবকে (পুষ্করকে) ঝিন্নি ভুল বুঝেছিল, সে কারণেও ঝিন্নির চোখে আজও চোখে জল আসে। কিন্তু বালু তো মাতৃত্বের মর্যাদা পেতে চলেছে। সে মর্যাদা ঝিন্নি কবে পাবে?

পুষ্কর আর ঝিন্নির মাঝে এই শূন্যতার পরিণতি কী হবে—তা নিয়েই রচিত হয়েছে 'নির্জনের গান' উপন্যাস। সারা উপন্যাস জুড়ে আছে এই দম্পতির কান্না হাসি আদর অভিমান আর ভুল বোঝাবুঝি ও তার অবসানের নানা ঘটনা।

দুজনে শেষবেলায় কেল্লার পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে। নিচে বয়ে চলেছে বিপাশা। এধারে চলাচলের পথ, ওপারে পাহাড়ের কোলে কোলে গমের ক্ষেত—এখন শস্য ঘরে তোলা হয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি টিকা (গাঁও)। ঝিন্নি কখন পুষ্করের পথ ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। ঝিন্নি পেছন থেকে 'কু' দিয়ে পুষ্করকে ডাকতে থাকে। পেছনে একটা কুহলের (ঝর্ণা) নিরন্তর ঝরে পড়ার শব্দ। পুষ্কর পেছনে উঁচু-নিচু পাহাড় ডিঙিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু কোন শিলাস্তূপের আড়ালে যে ঝিন্নি লুকোচুরি খেলছে তা পুষ্কর ধরতে পারে না।

পরবর্তী বর্ণনাটি ছবির মতো সুন্দর—

"একসময় স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবকন্যার মতো আমার সামনের টিলায় আবির্ভূত হল। শেষবেলার সোনাটুকু এসে পড়েছে তার গোল্ডেন অ্যাপেলের মত মুখখানার ওপর। নীল রঙের সুখানের ওপর সোনালী ঘাগরা। কাজ করা চোলি; মাথায় বেঁধেছে লাল রঙের দোপাট্টা। সে এক মহিমময় মূর্তি। ঝিন্নি বলে ওকে চেনাই যাচ্ছে না। নাগরাকোঠীর ব্রাহ্মণের আভিজাত্য যেন চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।" (পৃ ২৭৮)

এই তরুণ দম্পতি মনের আনন্দে পাহাড়ের ধার বেয়ে পাকদণ্ডী পেরিয়ে কোহলের জলে পা ভিজিয়ে কুইন গাছের তলায় ফোটা পপিফুলের সিল্কের মতো পাপড়িতে হাত বোলায়। পাঠক বোধহয় জানেন, এই পপি গাছের কাঁচা নরম অপক্ক বীজের ঘন রস শুকিয়ে আফিং তৈরি হয়।

পুষ্কর বলে—'পপি আর ঝিন্নির ভেতরে অসম্ভব মিল রয়েছে।' (পৃ ২৭৮)

এই সুন্দর কুলু উপত্যকায় দেবদেবীর মত সুন্দর তরুণ দম্পতি ঘুরে বেড়ায়। ডাক্তার মানালীতে প্র্যাকটিসে যায়, নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারিতে গাইডের কাজে যায় ঝিন্নি। কখনো তারা মানালীতে থাকে, কখনো-বা কুলু গাঁওয়ের কোঠিতে। খোঁড়া ভাগ্‌তু বিপাশার জল স্পর্শ করে। ভাগতুর মা তাকে একথা বলে দিয়েছে। ভাগতুর মা বাবা এবার শীতকালে যখন ওকে দেখতে আসে তখন ওর কানে দুটো রিং পরিয়ে দিয়ে যায়। সেইসময় ওকে বলে যায়, প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পূর্ণিমায় ও যেন বিপাশার জল মাথায় ছিটিয়ে নেয়। গদ্দীরা (মেষচারক) বিশ্বাস করে বিপাশার জল মাথায় ছোঁয়ালে সব বিপদ কেটে যায়।

ভাগ্‌তু খোঁড়া, সে তো পাহাড়ে উপত্যকায় ভেড়া চড়াতে পারবে না। শীতে গদ্দীরা কুলু উপত্যকায় নেমে আসে তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে। সারা শীত তারা চরে বেড়াবে উপত্যকাগুলোতে।

এই তরুণ-দম্পতির দিন কাটে পাহাড়ের গায়ে পাইন অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়ে। সুন্দর সেইসব দৃশ্য। যেমন,

"আমরা এক সময় ঘনবনের মাঝখানে চলে এলাম। আমরা গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেকখানি নীচে বন, বসতি, বিপাশা নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর কুলু উপত্যকা। আর বেশখানিক ওপরে আলো ঝলমল পীরপাঞ্জালের তুষার মহিমা। আমরা সেই মুহূর্তে গভীর বনের মাঝে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে দিয়ে হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে পালানো দুষ্টু মেয়ের মত একটা কুহল শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছিল বিপাশা লক্ষ্য করে। এই ঝর্ণাটা আবার শীতকালে রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কত সকাল কত সন্ধ্যায় আমরা দুজনে ঐ কুহলের পাশে উঁচু পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে কত কথা বলে গেছি। কি মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি হেসেছে ঐ কুহল আমাদের কথা শুনে। আবার আমরা ওর শীতের ঘুম ভাঙাতে ওর গায়ে আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গান গেয়েছি। আমি গেয়ে গেছি রবীন্দ্রনাথের গান, আর ঝিন্নি গেয়েছে ওর কুলুহী ভাষার লোকসঙ্গীত।" (পৃ ২৮৭)

কখনো-বা দুজনে ভালোবাসার আবেগে ভেসে যায়। সে রকম অনেক দৃশ্য থেকে একটিমাত্র তুলে ধরি—

"ঝিন্নি আমার দু হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। আমার মুখের দিকে ওর বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকাল। ওর চোখে বন্ধ ঘরের আবছায়ায় আমি যেন জলের আভাস দেখলাম। ও এমনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি করে বল ছোটেসাহেব, আমি কি এখনও তোমার চোখে সেই তরুণীটি রয়েছি?

কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আমি সেই রুদ্ধপ্রায় গলায় বললাম, বিশ্বাস কর, চাচা নরসিংলালজীর সঙ্গে প্রথম কুলুর কোঠীতে এসে বেলাশেষের আলোয় যে তরুণীকে দেখেছিলাম, আজও সে তেমনি ঔৎসুক্যের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে আমার মনে। তাকে আমি ভুলব কেমন করে ঝিন্নি। সেদিনের দেখা তরুণীটি শুধু একটি দেহধারী নারী ছিল না। আমার প্রথম ভাল-লাগার ছোঁয়ায় সে চিরকালের তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।" (পৃ ২৯০)

কিন্তু একটি অভাব, একটি শূন্যতা, একটি গোপন বেদনা তাদের দুজনকেই কুরে কুরে খাচ্ছিল। এখান থেকেই শুরু হল জটিলতা।

পুষ্করের কথায় তা ধরা পড়েছে—

"আমি কয়েকবারই লক্ষ্য করে দেখেছি, মানালীর ভ্যালির ওপারে যখন চাঁদ উঠত আর ভ্যালির থৈ থৈ অন্ধকারের জলটাকে ধীরে ধীরে পাতলা দুধের মত সাদা করে তুলত, তখন চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ত ঝিন্নির। আমি জানতাম, ওর অসহ্য ভাললাগার প্রকাশ এমনি করেই ঘটে। আর আমার ভাললাগার অনুভূতি এক ধরনের রোমাঞ্চের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা অদ্ভুতভাবে শিউরে শিউরে উঠত। আমরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে আসতাম বাংলোতে। পারতপক্ষে কেউ কোন কথা বলতাম না।" (পৃ ২৯৩)

কুলু উপত্যকায় অ্যাপেল-চাষের বিবরণ আমরা পেয়ে যাই ঝিন্নির শিল্প-ভাবনার সঙ্গে পুষ্করের বন্ধু জুলিয়েন বেননের ব্যবসায় বুদ্ধির মিলিত পরিকল্পনায়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অজস্র ট্যুরিস্ট আসে কুলু-মানালীতে। ওরা দুজনে মিলে সাজালো অ্যাপেল-সম্ভার। প্রকাশ করল একটি চিত্রিত বুকলেট ট্যুরিস্টদের জন্যে। তাতে ধরা আছে কুলুতে অ্যাপেল চাষের ইতিহাস। ১৮৭০ সালে বানড্রোকে ক্যাপটেন লী-র প্রথম অ্যাপেল বাগান। তারপর এলেন ক্যাপটেন বেনন ১৮৮৪ সালে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'সান-শাইন অর্চার্ড'। ইংলিশ ভ্যারাইটির ফল পাবার জন্যে রোপণ করলেন চাষ। গন্ধে বর্ণে আকারে উৎকৃষ্ট হল কুলুর অ্যাপেল। পাতায় পাতায় অ্যাপেলের ফুল ফল আর অ্যাপেল সংগ্রহকারিণীদের ছবি। সত্যি চোখে পড়ার মতো রূপসজ্জা।

পুষ্কর-ঝিন্নির সুখী দাম্পত্যজীবনে বারবার ব্যাঘাত ঘটতে লাগল তাদের সন্তানহীনতা। সমস্ত মন দিয়ে ঝিন্নি চাইছে সন্তান। দুজনে মিলে অনাগত সন্তানের কল্পনায় বিভোর হয়। কিন্তু কঠিন বাস্তবে তাকে চুরমার করে দেয়। পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর। তাদের তিন বছরের বিবাহিত জীবন কি নিষ্ফলা থাকবে?

এদিকে কুলু উপত্যকায় আসে ক্ষণস্থায়ী বসন্ত। আসে নয়ন ভোলানো রূপে। গদ্দী রমণীরা ফসল কাটতে কাটতে গান গায়। তাদের গানের কোনো বিরাম নেই। (পৃ ৩০২)

ঝিন্নি ছবির পর ছবি আঁকে। জুলিয়েনের সাহায্যে পরামর্শে তার ছবির প্রদর্শনী করতে ব্যস্ত হয়। জুলিয়েনের হোটেলেই ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। সিমলা গিয়ে তারা ঝিন্নির আর্ট কলেজের দু-চারজন অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ করে আনে। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারিকেও তারা ধরে নিয়ে আসে। প্রদর্শনীর নাম দেয় পুষ্কর—'বসন্ত সমাগম'। পার্বতী প্রকৃতি আর মানুষের বারো বারো চব্বিশটি আর প্রবেশদ্বারে একটি মোট পঁচিশটি ছবির প্রদর্শনী। মানালী শহরের এই ছবির প্রদর্শনী হল। দর্শকের অভাব হল না। ঝিন্নি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শর্মাজী শিল্পীর পরিচয় দিলেন। ছবির প্রশংসা করলেন। আর দিল্লি থেকে আগত এডুকেশন সেক্রেটারি সাকসেনাজী কেবল প্রশংসাই করলেন না, প্রস্তাব করলেন কুলু ভ্যালির উপর দিল্লিতে এইসব ছবির প্রদর্শনী হবে। এবং তা হল।

ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। দিল্লি থেকে ফিরে আসে পুষ্কর। ছবির প্রদর্শনী নিয়ে ঝিন্নি দিল্লিতেই থেকে যায়। মানালীতে ফিরে এসে ঝিন্নির চিঠি পায় ডাক্তার। মিসেস সাকসেনার ভাই পর্যটন বিভাগের অফিসার ঝিন্নিকে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে ছবি আঁকতে চান। সাতদিন পরে শ্রীনগর থেকে ঝিন্নির চিঠি আর আঁকা ছবি পায় পুষ্কর ডাক্তার। জুলিয়েন তাকে বোঝাল কেন ঝিন্নি ছবি আঁকায় এতো উৎসাহী, সন্তানহীনতার বেদনা এড়াতেই তার ছবি আঁকার এতো উৎসাহ (পৃ ৩১৩)। শ্রীনগর থেকে ফের চিঠি আসে—ঝিন্নি লিখেছে পুষ্করের জন্য তার চোখে জল আসে। পরের চিঠিতে ঝিন্নি লিখেছে—নাগিন লেকে ফেদ্রিক নামে এক ফরাসি শিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয়। এখন সে ফেদ্রিকের সঙ্গে নানা স্পটে গিয়ে ছবি আঁকে। ঝিন্নি ফেদ্রিকের খুব প্রশংসা করেছে চিঠিতে। (পৃ ৩১৬)। তবে কি পুষ্কর ঝিন্নির মধ্যে দূরত্ব রচিত হচ্ছে? ঝিন্নি ফিরে এল।

ফেড্রিকের চিঠি এল। দিল্লি থেকে চিঠি এল। ঝিন্নি পেয়েছে ফরেন স্কলারশিপ, ছবি আঁকতে ঝিন্নি ফ্রান্সে যাবে। (পৃ ৩১৯)। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ঝিন্নি রাগ করে, দাম্পত্য কলহ বেধে যায়। মানালী থেকে ঝিন্নি কুলু চলে যায়। পুষ্করও বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হেঁটে কুলু গাঁও-এ পৌঁছয়। ঝিন্নির কাছে শোনে সে মা হতে চলেছে। সে আর ছবি আঁকতে বিদেশে যাবে না। সন্তান-সম্ভাবনায় ফিরে আসে ভালোবাসা।

চার

ঝিন্নির সন্তান-আগমন সংবাদে দ্বিতীয় পর্ব 'নির্ঝরের গান' উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। তৃতীয় পর্ব 'তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি'। এই উপন্যাসে কাহিনির যবনিকা উঠল পনের বছর পরে। ঝিন্নির মেয়ে তিন্নি আজ পঞ্চদশী। জুলিয়েনের ছেলে চণ্ডীগড়ে ডাক্তারি পড়ে। তার বয়স আঠার। মানালীতে জুলিয়েনের এখন দুটি হোটেল। ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি তৈরি করেছিলেন বিশাল বাড়ি, যার তিনভাগই নার্সিংহোম। এখন আছে জুলিয়েন, বালু আর ঝিন্নি। কেবল নেই ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জি। নার্সিংহোমের মালিক হয়েও পুষ্কর ডাক্তার টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দূর-দুরান্তে পাহাড়ী রোগীদের চিকিৎসা করতে যেতেন। বছর দুয়েক পূর্বে তিনি একটি ক্রিটিক্যাল ডেলিভারি কেস অ্যাটেন্ড করে এক রাতে চাঁদের দুধসাদা কিরণে ধোয়া ভ্যালির সরু পথ ধরে টাট্টুতে চড়ে ফিরছিলেন একাই। হঠাৎই তিনি কি করে যেন নিচে পড়ে যান। সে রাতে ডাক্তার ফিরলেন না। পরদিন সকালে জুলিয়েন বেনন বন্ধুর মৃতদেহ কাঁধে করে ফিরে এলেন। সেদিনের সেই দৃশ্য আজও পঞ্চদশী তিন্নির মনে গাঁথা আছে। শোকের ভিড় থেকে সরে এসে তিন্নি একটি পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। গাল বেয়ে পড়ছিল অশ্রু। তখন জুলিয়েনের ছেলে ক্যারল তার হাত ধরল, জানাল সেও ডাক্তার আঙ্কলের মতো ডাক্তার হবে। আঙ্কলের তা-ই ইচ্ছা ছিল।

সেদিনের সেই নিভৃতে দেওয়া কথার মর্যাদা রেখেছে ক্যারল। আজ সে চণ্ডীগড়ে ডাক্তারি পড়ে। এক বছর বাদে ক্যারল দু তিনজন বন্ধু নিয়ে মানালীতে ফিরছে। এখান থেকেই শুরু 'তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি।'

চণ্ডীগড় থেকে ক্যারল চিঠি লিখেছে তার পিতা জুলিয়েনকে, তিন্নির জুলিয়েন আঙ্কলকে। সেই চিঠিতে ক্যারল জানিয়েছে কয়েকদিনের ছুটিতে আসছে দু-তিনজন বন্ধুকে নিয়ে। একসময় ঝিন্নিদেবী ছবি আঁকতেন। হয়ে উঠেছিলেন নাম করা শিল্পী। অধুনা সপ্তদশী তিন্নি মায়ের স্টুডিওতে—কাচের গোলঘরে বসে ছবি আঁকে। মায়ের কাছেই ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছে। ক্যারল ও তার বন্ধুদের অভ্যর্থনা, পরিচর্যার প্ল্যানের চেয়ে তিন্নির কাছে আজ প্রাধান্য পাচ্ছে, তাদের কী উপহার দেবে। স্টুডিওতে বসে তাদের জন্যে সে ছবির কার্ড আঁকতে শুরু করে। গদ্দী পহালরা ভেড়ার পাল নিয়ে নামছে; ফুলন্ত আপেলের ডালে বসে বাহারি রঙের পাখি দেখছে তার দোসরকে; শিলাস্তূপের ফাঁকে উঠেছে সবুজ পাইন গাছ; নীলাকাশের গায়ে বরফের মুকুট-পরা পর্বত-চূড়া। চোখের সামনে দেখা নিসর্গ নিয়ে চারটি ছবি-কার্ড সে এঁকে ফেলল।

পনের বছর আগের খোঁড়া ভাগতু আজ তিরিশ বছরের যুবক। সে ঝিন্নির ছেলের

মতো। আর তিন্নির দাদা, বন্ধু, অভিভাবক।

তিন্নির স্টুডিওর দরজায় এসে দাঁড়ায় চব্বিশ বছরের অচেনা সুদর্শন যুবক। সে জানায় সে জজ সাহেবের দৌহিত্র, নাম অর্কদীপ। গাঢ় হলুদ রঙের টি শার্ট পরেছে—তাতে লেখা 'উই আর ফ্রেন্ডস্'। তিন্নির সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্কদীপের বন্ধুত্ব হল। মার্কিনদেশে হায়ার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করে অর্কদীপ। অর্কের কাহিনি জজ সাহেব ও তার স্ত্রীর মুখে বারবার শুনেছে তিন্নি। আজ তাকে দেখল সামনা-সামনি। ভাগতুরামকে দেখে অর্ক বিস্মিত। তিন্নি জানাল ভাগ্‌তু তার আপন দাদার মতোই। স্টুডিও থেকে পাহাড়ি পথে তিন্নির হাত ধরেই নেমে এল অর্ক। জুলিয়েন আঙ্কেলের আপেল-বাগিচার মধ্য দিয়ে শর্ট-কাট করে নেমে এল তারা দুজনে। তিন্নি পরে মায়ের কাছে বালু-আন্টি জুলিয়েন আঙ্কলের গল্প শোনে; আর মাকে বলে জজ বদরীপ্রসাদের নাতি অর্কদীপ 'ভ্যারি হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান।' মায়ের কাছেই সে জানল, বদরীপ্রসাদজী একদিন জুলিয়েন আঙ্কলকে অপমান করেছিলেন। তিন্নি জানাল, বয়স্করা তাদের মান অপমান নিয়ে থাকুন, তারা নতুন প্রজন্ম সবাই বন্ধু।

পরদিন নাস্তার নিমন্ত্রণে জজসাহেবের বাড়ি গিয়ে অর্কদীপের সঙ্গে তিন্নির আরো বেশি করে আলাপ হল। অর্ককে তাদের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে এল তিন্নি।

ক্যারল ও বন্ধুদের জন্য প্রোগ্রাম তিন্নি তৈরি করেছে অর্কদীপের সঙ্গে আলোচনায়। তিন্নি তার প্ল্যানে খুব খুশি। দুজনে মিলে টাট্টু-ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে আসে।

তিন্নি আর অর্কদীপের বন্ধুত্ব দেখে ঝিন্নির মনে পড়ে যায় তিরিশ বছর পূর্বেকার কথা। ডাক্তার পুষ্করকে নিয়ে ঝিন্নি গিয়েছিল নাগ্‌গরে কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব দেখতে। তখন তাদের বিবাহ হয়নি। রোয়েরিখ আর্ট-গ্যালারির পাশে তার কোয়ার্টারে তারা দুজনে রাত কাটিয়েছিল। জানালা দিয়ে তারা দুজনে দেখছিল কেল্লা থেকে রাতের আকাশে ফুটে উঠছে কতো উজ্জ্বল তারার ফুল—একটার পর একটা হাউই। সে রাতে নির্জন কোয়ার্টারে নিভৃতে ফুটে উঠেছিল দুটি ফুল। দুজনেই দুজনের আঘ্রাণে সম্মোহিত হয়েছিল। পরদিন টাট্টুতে চেপে দুজনে নদীর কূল ধরে এসেছিল নাগ্‌গর থেকে কুলুতে।

আজও কি তিন্নি তেমনি অর্কের সঙ্গে টাট্টুতে চেপে পাশাপাশি চলেছে খুশির ফুল ছড়াতে ছড়াতে? (পৃ ৩৪৪)

ঝিন্নির সম্বিত ফেরে। এ কি সে ভেবে চলেছে? অর্ক তিনাদনের বন্ধু মাত্র। তিন্নির সারা জীবনের দোসর হতে পারে ক্যারল, অর্কদীপ নয়। (পৃ ৩৪৪)

পুষ্কর ডাক্তারের মৃত্যুর পর ঝিন্নির ভ্রাতৃপ্রতিম হয়ে উঠেছিল জুলিয়েন। ক্যারল চণ্ডীগড়ে ডাক্তারি পড়তে গেছে ডাক্তার আঙ্কলের প্রতি শ্রদ্ধায়, পুষ্করের ফেলে-যাওয়া ও.টি আর ডিসপেনসারিতেই সে বসতে চায়। জুলিয়েন ঝিন্নিকে জানিয়েছিল, তার ছেলে ক্যারল ভালবাসে ঝিন্নির মেয়ে তিন্নিকে। এই তরুণ-তরুণীদের ভালবাসায় তাদের দুজনেরই কোনো আপত্তি নেই। (পৃ ৩৪৫)

কিন্তু আজ অর্কদীপ হাজির। এখানেই উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা দেয় জটিলতা। এদিকে অর্কদীপ আর তিন্নি টিলার উপরে উঠে আসে। গানে গল্পে কথায় তারা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় মুগ্ধ হয়ে তারা নিচে নদী আর উপরে চাঁদ দেখছিল। সেই অবসরে

মুগ্ধ অর্কদীপ তিন্নির হাত ধরে শুধাল, আমি কি এই হাতখানা ধরে অনেক অনেক দূরের পথ এগিয়ে যেতে পারি না? তিন্নির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সজাগ করে তুলল। আবেগের স্রোতে ভেসে গেলে আর কোনভাবেই বিপরীত স্রোত ঠেলে ফেরা সম্ভব হবে না। তাই তিন্নি বলে, বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যে হাত, তার শক্তি অসীম। তুমি আমার অন্যতম বন্ধু অর্ক। (পৃ ৩৪৭)

বলা বাহুল্য, এই উত্তরে অর্কদীপ হতাশ হল। সঠিক জবাব সে পেল না। অর্কদীপ লক্ষ করে, ভাগ্‌তুরাম ডাক্তার মুখার্জির বাড়ির একটি অ্যাসেট বিশেষ। ঝিন্নিদেবী ও তিন্নি ভাগ্‌তুরামকে পরিবারের একান্ত আপন বলে জানে।

পরদিনটি আগন্তুকদের জন্যে মা মেয়ে ঘর গোছানোর কাজে কাটিয়ে দিল। তিন্নিদের বাড়ির সংলগ্ন আউটহাউসটি গেস্টদের জন্য সাজিয়ে তুলল। সন্ধ্যায় সেই সজ্জিত আউট হাউসে উঠে আসে অর্কদীপ, তার সী-গ্রিন টি-শার্টের বুকে গাঢ় হলুদ লেখা --'ফ্রেন্ডশিপ ইজ দ্য ওয়াইন অফ লাইফ'। তিন্নির মুখে হাসি দেখা দিল অর্ককে দেখে। বলল—'অর্ক, ফ্রেন্ডশিপ ইজ ওয়ান মাইন্ড ইন টু বডিজ।' অর্কদীপ চমকে উঠে বলল—'অসাধারণ।' (পৃ ৩৫০)

দুটি তরুণ-তরুণীর অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় হাসিতে সেই ঘর ভরে ওঠে। তিন্নি অর্ককে তার আঁকা একটি ছবি উপহার দেয়—পাইনে ছাওয়া পাহাড়, পৃষ্ঠাপটে বরফের মুকুটপরা পর্বত। অর্ক তিন্নিকে উপহার দেয় একটি গোল্ডেন ক্যাপওয়ালা লেডিজ সেফার্স ও একটি ডট পেন। তিন্নি খুশি হয়ে অর্কের চুল এলোমেলো করে দেয়। তারপর চিরুনি দিয়ে নতুন করে অর্কর কেশ বিন্যাস করে দেয়। (পৃ ৩৫০-৩৫১)

পরদিন সকালে দুজনে সেই ঘরে বসে ছবি আঁকে। উন্মাদনার আর শেষ নেই। অর্ককে মডেল করে তিন্নি পর পর বাইবেল-বর্ণিত ডেভিডের ছবি আঁকে। তারপর অর্ককে নার্সিসাস সাজিয়ে তিন্নি ছবি আঁকে। তারপর অরফিউস। পরপর সাতদিন এভাবে অর্ককে মডেল করে তিন্নি ছবি আঁকে। (পৃ ৩৫৪-৩৫৬)

বিকেলের দিকে দুজনে নির্দিষ্ট টিলার উপর উঠে বসে থাকে। পাহাড় আর উপত্যকা। কাজের শেষে ফেরে পার্বতী তরুণীর দল, তাদের গলায় আসন্ন বসন্ত-উৎসবের গান। দুজনে দেখে আর শোনে মুগ্ধ হয়ে। একদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ের পথে দুজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জুলিয়েন আঙ্কলের।

তিন্নির কাছে শুনে জুলিয়েন আঙ্কল আর ঝিন্নিদেবী এলেন তিন্নির স্টুডিওতে। অর্কদীপকে মডেল করে আঁকা তিন্নির ছবিগুলি দেখে দুজনেই মুগ্ধ হলেন। (পৃ ৩৬০)

এবার পাঠক পৌঁছে যান উপন্যাসটির ক্লাইম্যাক্সের সূচনা-পর্বে।

তেইশে এপ্রিল। বসন্ত-সমাগম মুহূর্ত। নাগ্‌গর থেকে গাড়িতে কুলু পৌঁছে যায় তিন্নি আর অর্ক। কুলুতে নিজেদের আউটহাউসে পৌঁছল তিন্নি। ঢোল ময়দানের পেছনের দিকের পাহাড়ে আপেল-বাগিচার এক প্রান্তে আউটহাউস। গাড়িতে অর্ক বলেছিল—'তোমার ভেতরে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি আছে।' তিন্নি উত্তর দিয়েছিল, 'তুমি আমার সব সেরা বন্ধু।' (পৃ ৩৬৩)

বিকেলে গাড়ি নিয়ে তারা দুজনে কুলু-মানালী হাইওয়েতে পৌঁছে গেল। ওই পথেই চণ্ডীগড় থেকে গাড়ি করে আসবে ক্যারল, সঙ্গে তার বন্ধুরা। পথেই দেখা হয়ে গেল

লাল মারুতিতে আসা ক্যারল ও তার চার বন্ধুর সঙ্গে। তিনটি ছেলে, আর একটি মাত্র মেয়ে। সবাই মিলে তিন্নিদের আউটহাউসে পৌঁছে গেল। চা-খাবার খাওয়ার শেষে দুটি গাড়ি চলল মানালীর পথে। সাদা মারুতিতে তিন্নি, তার পাশে ক্যারল। লাল মারুতিতে অর্কদীপ, কপিল সাহানি, ধ্রুব পোড়েল, রত্নাবলী কুট্টি।

এবার সাদা মারুতিতে তিন্নি আর ক্যারলের মান-অভিমানের পালা। সে রাতেই জুলিয়েন বেননের বাড়িতে ডিনার পার্টি। মানালীতে আগন্তুকরা আগন্তুকরা থাকবে আর একটি দিন। তারপরই ট্রেকিং-এ চলে যাবে।

ক্যারলের বন্ধুরা তিনদিন চষে বেড়িয়েছে মানালী। এরই মধ্যে ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জির প্রশস্ত হলে তিন্নির ছবির প্রদর্শনী হল। তারপরই সাতজনে মিলে নাচগানের অনুষ্ঠান চলল। গানে বাঁশির সুরে নাচে বাজনায় সাত তরুণ-তরুণী মোহিত করে দিল অতিথিদের। পরদিন ধ্রুব আর কপিল রোটাং গিরিপথ পেরিয়ে কেলংয়ের উদ্দেশে ট্রেকিং-এ চলে গেল। বাকি চারজন বিজলী মহাদেও মন্দিরে পৌঁছল আড়াই হাজার মিটার পাহাড়ি চড়াই পেরিয়ে। সেখান থেকে পার্বতী কুলু উপত্যকাকে চিনে নেওয়া যায়। সেই নয়নাভিরাম নিসর্গ দেখে মুগ্ধ ক্যারল, তিন্নি, রত্নাবলী আর অর্কদীপ। এরই মধ্যে তিন্নি অনুভব করে তাকে দুদিক থেকে টানছে ক্যারল আর অর্কদীপ।

চারজনের অ্যাডভেঞ্চার আর ভ্রমণে কোনো ক্লান্তি নেই। দুপুরে তারা গাড়ি নিয়ে মানালী থেকে নাগ্‌গরে চলে গেল। সেখানেই নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারি।

এই উপন্যাসে পার্বতী প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য বারবার মানুষকে মুগ্ধ করে। ক্যারল, তিন্নি, অর্কদীপ আর রত্নাবলী সব চাঞ্চল্য ভুলে সেই অসাধারণ সুন্দর নিসর্গকে দেখে।

"এই নাগ্‌গর উপত্যকার শোভা অসাধারণ। গভীর পাইন অরণ্যে ছাওয়া পর্বত। দূরে দূরে নীলাভ পাহাড়গুলির গায়ে মসলিনের মত হিমেল ওড়না উড়ছে। নিচে সবুজ হলুদ শস্যের ক্ষেত। উপত্যকার ওপর দিয়ে উপবীতের মত বয়ে চলেছে বিপাশা। ওপরে গভীর নীল আকাশ। ফারগাছ দুটির ফাঁক দিয়ে দেখলে সামনে দেখা যায় পীরপাঞ্জালের শুভ্র মহিমা। ডানদিকে চির তুষারাবৃত ধৌলাধার।

হাতে হাত বেঁধে চারজনে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির মহিমা।" (পৃ ৩৭১)

সেদিন বসন্ত-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। চাঁদের আলোর জোয়ার উঠেছে। ক্যারলের প্রস্তাব—চারজন লটারির মাধ্যমে দুটি জোড়ায় বিভক্ত হয়ে সে রাতের মতো নাচবে। ঘুরবে, চারজনে একসঙ্গে নয় এবং সে রাতে তারা সঙ্গী হিশেবে যাকে পাবে, তারা কেবল সে রাতটুকুর মত তাদের হৃদয়ের সব থেকে কাছের মানুষ হবে। আগামী কাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এ খেলা শেষ হয়ে যাবে।" (পৃ ৩৭২)

এই খেলা যতই মধুর ততই রোমাঞ্চকর ; যতই মজার ততই বিপজ্জনক হতে পারে—এ কথাটা চারজনে ভাবলই না।

একটি জোড়ায় তিন্‌নি আর অর্কদীপ। অপর জোড়ায় ক্যারল আর রত্নাবলী। প্রস্তাবমতো দুই জোড়া আলাদা আলাদা ভাবে দুদিকে চলে গেল।

তারা একবারও ভাবল না—'নয় এ মধুর খেলা'—মনে কি ভাবল 'পরানের সাথে খেলিব আজি ঝুলনখেলা'?

অর্কদীপ আর তিন্‌নি ফরেস্ট বাংলোর পেছনে একটা শিলাস্তূপের আড়ালে গিয়ে বসল। "ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় ঋতু বসন্তের রঙিন ফুলগুলি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁকি দিচ্ছিল।" (পৃ. ৩৭২)

সেই তীব্র শীতে তিন্‌নির পোশাক ছিল একটা সাদা দামি পাট্টু (কম্বল)। ব্রোচ দিয়ে টাইট করে আঁটা। সেই তীব্র শীতে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে কুলু ভ্যালিতে মেয়েরা এই পোশাকই পরে। তার ওপরে তিন্‌নির গায়ে ছিল গরম পশমিনা। আর অর্কদীপের গায়ে ছিল আমেরিকার গরম সোয়েটার।

সেই গরম পশমিনাটি (কুলুর শাল) তিন্‌নি অর্কদীপের গায়ে দিল। অর্ক তাতে রাজি নয়। তবে দু'জনেই সেই পশমিনাটি একই সঙ্গে গায়ে জড়িয়ে বসল এবং একান্ত সান্নিধ্যে তাপ ছড়িয়ে পড়ল দু'জনের ভেতরে।

এরপরই বিপদ। অর্কর প্রশ্ন—'এ রাত, এই আবেগভরা মুহূর্ত কি চিরদিনের হতে পারে না তিন্‌নি?' তিন্‌নির উত্তর—'এ জিজ্ঞাসা তোমার আমার মনের ভেতর যতদিন থাকবে ততদিনই আমরা বেঁচে থাকব দু'জনের ভেতর। এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে আর এমন আকুলতা থাকবে না অর্ক।' অর্কের প্রস্তাব চুম্বনের। তিন্‌নির তা প্রত্যাখ্যান, তার উত্তর—'আগুনে একবার আহুতি দিলেই তার জিব লকলক করে উঠবে।' (পৃ. ৩৭৩)

ক্যারল আর রত্নাবলী চলে গেছে অনেকটা নিচে। ক্যারল রত্নাবলীর আপত্তি সত্ত্বেও তার দুপায়ে পরিয়ে দিল নূপুর। তারপর রত্নাবলীর দক্ষিণী নাচ দেখে মুগ্ধ হল। ক্যারল তাকে আরো বেশি করে চাইল, কিন্তু রত্নাবলী তাতে রাজি নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত হয়ত তা শুভঙ্কর হবে না।

তখন রাত বারোটা। চারজনে ফিরে এল ফরেস্ট বাংলোয়। ক্যারল আর তিন্‌নি এক কম্বলের নিচে, অর্ক আর রত্নাবলী আর এক কম্বলের নিচে। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অর্ক আর ক্যারল। বাকি দু'জন গভীর ঘুমে মগ্ন।

সকালে মণিকরণে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখে তারা গাড়িতে চলে গেল জারি গ্রামে। সেখান থেকে তারা ফিরে এল কুলুর আউটহাউসে। তিন্‌নির মনে তীক্ষ্ণ প্রশ্নের দংশন—তাদের জোড়া জোড়া খেলার কী পরিণতি হবে? ক্যারল কেন আজ অকারণে তার প্রতি রূঢ়? এই খেলার পরিকল্পনা তো ক্যারলই করেছিল। তার কি দোষ? কেন ক্যারল তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলছে না?

বিপাশার তীরে রাইসনে গিয়ে দুদিন থাকার পরিকল্পনা তিন্‌নি পেশ করল। সবাই রাজি। শান্ত নির্জন রাইসন উপত্যকায় নড়বড়ে কাঠের পোল পেরিয়ে তারা তাঁবু ফেলল। দুপুরে শীতল নদীজলে স্নান, তারপর আহার, সন্ধ্যায় নাচগান। কিন্তু তাঁবুতে ফেরার মুখে তারা অনুভব করল হাওয়া যেন একটুও বইছে না। ক্যারলের আশঙ্কা, সে রাতে প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। তাই হল। রাত দুটোয় ঝড়, বিদ্যুৎ ঝলকানি, প্রবল বর্ষণ। তাঁবু ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীর জল। সেই নড়বড়ে কাঠের পোল ভেঙে গেল। ঝুলন্ত কাঠ ধরে অনেক কষ্টে তারা পেরিয়ে এল। ক্যারল তিন্‌নিকে একহাতে জড়িয়ে নিয়ে অপর হাতে কাঠ ধরে এপারে এল। তার আগেই পেরিয়ে গেছে অর্ক রত্নাবলী। ভোরে ক্যারলের ডাকে অভিমান দূর করে তার বুকে এলো তিন্‌নি। এখানেই উপন্যাস শেষ।

শংকরের ট্রিলজি

শংকর ওরফে মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (জন্ম ডিসেম্বর ১৯৩৩) আজ চুয়াত্তরে উপনীত। পঁচিশ বছর পূর্বে ৫০তম জন্মদিনে (৭ ডিসেম্বর ১৯৮২) তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল ('পরিবর্তন' পত্রিকা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৮২)। সেই সাক্ষাৎকারটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাতে 'বেস্ট সেলার' লেখকের নানা বক্তব্য প্রকাশিত। 'বেস্ট সেলার' লেখক বলেই অবজ্ঞা করতে হবে, এমন কোনও রীতি নেই। অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার, অলোকপ্রসাদের লেখা 'শংকর : বেস্ট সেলারের আশা আকাঙ্ক্ষা' এবং শংকরের লেখা 'একটি নমস্কারে'—এই তিনটি রচনা থেকে শংকর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

'স্বর্গ মর্ত পাতাল' নামক ত্রিলেখ উপন্যাসের আলোচনায় এই রচনাগুলি আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। শরৎচন্দ্রের পরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ আর শংকরের উপন্যাসের বিক্রি ও পাঠকপ্রিয়তা অবশ্যস্বীকার্য।

সেদিন (১৯৮২) অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "এই সময়ের জনপ্রিয় লেখক শংকর। তাঁর বই বিক্রির হিসেব সমকালীন বহু লেখকের বই বিক্রির হিসেবকে অনেকখানি পেছনে ফেলে দিয়েছে। একজন লেখক কিছু লেখেন এবং ছাপান পাঠক পড়বে বলেই। বই বিক্রি হচ্ছে না বলে অনেক লেখকের খেদোক্তি শোনা যায়। অথচ দীর্ঘদিন ধরে শংকর জনপ্রিয়তার চূড়ায়। শংকরের বই ছাপা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংস্করণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'জনঅরণ্য', 'সীমাবদ্ধ' এবং 'আশা আকাঙ্ক্ষা' এই তিনটি উপন্যাস এক মলাটে এসে 'স্বর্গ মর্ত পাতাল' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে (দে'জ পাবলিশিং)। বইটি ইতিমধ্যে এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেছে।"

আজ বিশ বছর পরে জানা যায়, ত্রিলেখ বইটির শেষতম সংস্করণ (১৭২তম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩/মাঘ ১৪০৯) হয়েছে। প্রথম সংস্করণ হয়েছিল আগস্ট ১৯৭৬-এ (শ্রাবণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। অন্যান্য উপন্যাস বা স্মৃতিকথা বা ভ্রমণকাহিনি সম্পর্কেও একথা বলা যায়। তা আমাদের আলোচনার বাইরে। যশোর জেলার বনগ্রাম থেকে পাঁচবছর বয়সে হাওড়া শহরে আসে মুখুজ্যে পরিবার। লেখকের চোদ্দো বছর বয়সে তাঁর পিতার অকালমৃত্যু হয়। লেখকের কথায়—"তিনি (পিতা হরিপদ মুখোপাধ্যায়) এক দিন অকস্মাৎ দ্বিতীয় পক্ষের বিরাট সংসার অনিশ্চয়তার উত্তাল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে জীবন সাগরের ওপারে পাড়ি দিলেন। শুরু হল আমার অগ্নিপরীক্ষা। ... তখন আমার বয়স চোদ্দ। ম্যাট্রিক পাস করে কোনরকমে কলেজে এসে ঢুকলাম। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে চাকরির দিকে।

কিন্তু ওই বয়সের ছেলেকে কে চাকরি দেবে? আমি সাধারণ ফার্স্ট ডিভিশনে আই. এ. পাশ করলাম এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে শেষ নমস্কার জানিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। একটা চাকরি জোগাড়ের জন্যে তখন আমি পাগলের মত পথে পথে ঘুরছি, কিন্তু সামনে অজস্র বাধা—বিরাট এই শহর কলকাতার উঁচু পোস্টে কর্মরত কাউকে চিনি না। আমার জামা কাপড় ময়লা, এবং তার ওপর আমি আইনত নাবালক। অগত্যা রাস্তার ফেরিওয়ালাগিরি করেছি, অর্ডার সাপ্লায়ের নামে দোকানে দোকানে মাল বিক্রির চেষ্টা করেছি।"

তখন ১৯৪৭ সাল। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে। শরণার্থীর ঢল নেমেছে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়। তখন সময় চঞ্চল, অস্থির, দিশাহীন। এ সময়ে শর্টহ্যানড শিখতে শুরু করেন শংকর।

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে শর্টহ্যান্ড শিখে নেন। তাঁর সহপাঠীর দাদা শ্রীবিভূতি রায় মারফত যোগাযোগ হল হাইকোর্টের ব্যারিস্টার বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে। "কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের অন্যতম শেষ বাবু হবার সম্মানটি বিধাতা বোধহয় আমার জন্যে তুলে রেখেছিলেন।"

পিতৃহারা, অসহায়, গরিব, তরুণ শংকর এই সাহেবের কাছে পেয়েছিলেন পিতৃহৃদয়ের উষ্ণতা, স্নেহ। বারওয়েল সাহেব শংকরের জীবনে পরিত্রাতা 'মধুসূদন দাদা'। এই 'মধুসূদন দাদা'র গল্প দিয়েই শংকর একদিন সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলেন। বিশ বছর বয়সে (১৯৫৩) শংকর 'কত অজানারে' লিখতে শুরু করেন। এই বইয়ের সব কাহিনিই পেয়েছিলেন বারওয়েল সাহেবের কাছে। এই লেখা গৌরকিশোর ঘোষের সাহায্যে 'দেশ' সম্পাদকের কাছে পৌঁছায়। তারপর ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয় 'দেশ' সাপ্তাহিকপত্রে ১৯৫৪ সালে। তা বই হয়ে প্রকাশের ফলে শংকর সাহিত্যক্ষেত্রে পাঠকসমাজে পরিচিত হন। তারপর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাস। তারপর 'স্বর্গ মর্ত পাতাল' ত্রিলেখ। তারপর আর শংকরকে ফিরে তাকাতে হয়নি। উকিলের মুহুরি হয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক।

শংকর নিটোল কাহিনি গড়ে তোলেন। গল্পকে জমিয়ে তোলার জন্যে ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে চলেন। এর পিছনে যে 'হোমওয়ার্ক' আছে, তা পাঠকের সামনে আসে না, বস্তুত শংকরের উপন্যাস রচনার পেছনে শ্রমসাধ্য প্রস্তুতি থাকে, কিন্তু তার স্বেদচিহ্ন উপন্যাসে পড়ে না। তাঁর জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ—মধ্যবিত্তসুলভ আবেগ, আদর্শবাদিতা, জীবনের মূল্যবোধে আস্থা। নিটোল গল্পসূত্র পাঠককে আবিষ্ট করে। অপরিমিত যৌনবোধ ও হিংস্রতাকে শংকর প্রশ্রয় দেন না। জীবনের অন্ধকার দিকের কথা তাঁর উপন্যাসে বর্জিত নয়, কিন্তু তা-ই প্রধান নয়। এই অন্ধকার, কঠোর, নিষ্ঠুর বাস্তবকে দেখানোই তাঁর লক্ষ নয়, কিন্তু তার জন্য লেখকচিত্তের পীড়ন, বেদনা, দুঃখবোধ তাঁর কাহিনিতে বড় হয়ে ওঠে।

লেখার ক্ষেত্রে শংকর ঋণ স্বীকার করেছেন গৌরকিশোর ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, বিমল মিত্র ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কর্মসূত্রে সারা ভারতে ঘুরেছেন। নানা ভাষা পাঠকের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর উপন্যাসের অনুবাদ-সূত্রে। বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয়

ভাষার পাঠকদের ভালোবাসা তাঁকে উজ্জীবিত করেছে, একথা তিনি পূর্বোক্ত তিনটি সাক্ষাৎকার-রচনায় কবুল করেছেন।

'সংবাদপত্রের চেয়ে অনেক সময় গল্প-উপন্যাসে বেশি সত্য পাওয়া যায়'—এই উক্তি তিনি করেছেন সাক্ষাৎকারে।

তাঁর উপন্যাসরচনার পদ্ধতি সম্পর্কে এই সাক্ষাৎকারে তাঁর উক্তি : " আমার উপন্যাস লেখার পদ্ধতি একটু জটিল, এর সবটা এখনও লেখার সময় হয়নি। ... আমি মনে করি, আজকের যুগে গবেষণা ছাড়া উপন্যাস লেখা বেশ শক্ত। স্বভাবতই আমার প্রধান উপন্যাসগুলোর পিছনে দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান থাকে। এই অনুসন্ধানের দুটো দিক—ডেস্ক রিসার্চ এবং ফিল্ড রিসার্চ। জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমি যে অনুসন্ধান চালাই তা লোকচক্ষের আড়ালে থেকে যায় আর গ্রন্থাগারে খোঁজখবরের দিকটা কারুর কারুর নজরে পড়ে যায়। ... অন্তরের অনুপ্রেরণা সমস্ত সাহিত্যকর্মের বীজ, কিন্তু জ্ঞানের জলসিঞ্চন ছাড়া তা ফলবতী হতে পারে না।"

ত্রিলেখ উপন্যাসের পটভূমি ও সূত্রপাত সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য পাই গ্রন্থ-সূচনায় তাঁর 'জবানবন্দি'তে।—

"একের মধ্যে তিন এবং তিনের মধ্যে এক এই উপন্যাসত্রয়ীর সূত্রপাত ১৯৭০-এর গোড়ায়। এর পিছনে পুরো এক দশকের নানা চিন্তা-ভাবনাও জড় হয়েছিল। এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অপর নাম চাকুরীজীবী। চাকরিভিত্তিক কর্মজীবনে যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, যে সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ও মান-অপমানের অকথিত কাহিনী হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে পাথরের মতো জমা হয়ে আছে সে সম্বন্ধে সাহিত্যপাঠককে অবহিত করার জন্যই প্রথম এই কাজে হাত দিই। বিরাট বিচিত্র এই কর্মোদ্যমকে একজনের চোখে দেখানো সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনজন যুবককে তিনখানি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে বসাতে হলো।....

আমাদের এই সমাজ আদর্শের স্বর্গ থেকে ক্রমশ নরকে অধঃপতিত হচ্ছে, এই নিরাশার কথা কেউ কেউ তুলছেন। কেউ কেউ আবার সমসাময়িকতার উত্তেজনায় অসত্যের স্লিপিং পিল খেয়ে স্বপ্ন দেখছেন আমরা সবাই স্বর্গলোকের সুখী বাসিন্দা। আমার মনে হয়, স্বর্গ মর্ত পাতালের সিঁড়ি বেয়ে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিকে গমনাগমন করছেন ; এবং কেউ কেউ এই অচেনা পথের তেমাথায় এসে গন্তব্যস্থানের ঠিকানা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। সত্যসন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা এইসব পথভ্রষ্টদের জটিল জীবনে একবার দৃষ্টিপাত করলে আমার এই চেষ্টা সফল মনে করবো।"

লেখকের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে পাতালের ছবি—'জন-অরণ্য', তারপর মর্তের ছবি 'সীমাবদ্ধ', শেষে স্বর্গের ছবি 'আশা-আকাঙ্ক্ষা'।

স্মর্তব্য, 'জন-অরণ্য' ও 'সীমাবদ্ধ'-র চলচ্চিত্র-রূপদাতা 'বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়'কে লেখক এই ত্রিলেখ উৎসর্গ করেছেন। চলচ্চিত্রের কল্যাণে 'জন-অরণ্য' ও 'সীমাবদ্ধ'র কাহিনির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত।

দুই

জন-অরণ্য উপন্যাসের দুই বেকার বন্ধু সোমনাথ ও সুকুমারকে লেখক পেয়েছিলেন আপন জীবন অভিজ্ঞতা থেকে। জন-অরণ্যর নেপথ্য কাহিনি শীর্ষক ছোট রচনায় তা তিনি কবুল করেছেন—“এই উপন্যাস লেখার প্রথম পরিকল্পনা এসেছিল আমার বেকার জীবনে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে বিরাট সংসারের বোঝা আমার মাথার উপর চাপিয়েছেন। একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।....একদিন এক পদস্থ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমাকে বকুনি লাগালেন, ‘বাঙালিরা কি চাকরি ছাড়া আর কিছু জানবে না? বিজনেস করুন না।’ ‘কিসের বিজনেস?’ ভদ্রলোক বললেন, ‘এনিথিং—ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট।’ সেই শুরু। বিজনেসে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।” তিনি আপিসে আপিসে বাস্কেট সাপ্লাইয়ের বিজনেসে নামলেন আর চিনলেন আপিসপাড়ার জীবনকে। জন-অরণ্যে পথ হারিয়ে মানুষ সম্বন্ধে যখন আশা ছাড়তে বসেছিলাম তখন ডালহৌসি পাড়ার সাহেবী আপিসে এক দারোয়ানজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। তাঁর কথায়—‘জীবনের এক সংকট মুহূর্তে ডালহৌসি পাড়ার অশিক্ষিত দারোয়ান আমাকে বাঁচিয়েছিল—আমি হেরে যেতে যেতে হারলাম না।’ সেই দারোয়ানজি লেখককে বলেছিল, ‘মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।’ “বাস্কেট তৈরির কারখানা এক আজব জায়গায়। তার ঝুড়িগুলো রং হতো মধ্য কলকাতার এক পুরানো বাড়িতে। এই রং করতেন কয়েকজন সিন্ধি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা—সন্ধেবেলায় যাঁদের অন্য পেশা ছিল। দেহবিক্রয় করেও দেহধারণ কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে এঁরা এই পার্ট টাইম কুটির শিল্পে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তখন আমার যা বয়স, কলকাতার অন্ধকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইসব স্নেহশীলা মহিলাদের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হলো।”

এখান থেকেই জন-অরণ্য কাহিনির সূত্রপাত। বেকার যুবকের অন্তহীন হতাশা, অর্ডার সাপ্লায়ের সামান্যকাজে সীমাহীন ব্যর্থতা এবং দেহব্যবসায়িনী-সাপ্লাইয়ের একটা নতুন পথের সন্ধান এই কাহিনির পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে।

এই অর্ডার সাপ্লাইয়ের মূলমন্ত্র যে কোনও কোম্পানির পারচেজ অফিসারকে ‘নরম করা’। উপন্যাসের নায়ক সোমনাথ এমনি এক বিপন্ন বেকার। চিৎপুর রোডে দাঁড়িয়ে লেখক একটি দৃশ্য দেখেছিলেন—এক বিপন্ন যুবক হতাশার পথ ধরে চলেছে অর্ডার সাপ্লাইয়ের পথে। এমনি এক বেকার তরুণ ও এক আপাতদৃশ্য ভদ্রমহিলা যিনি ছদ্মবেশিনী দেহব্যবসায়িনী, তাদের সঙ্গে আলাপের মধ্য থেকেই লেখক পেয়েছিলেন উপন্যাসের উপাদান। তাই দিয়ে তৈরি হয়েছে এই উপন্যাস, নির্মাণ করেছেন দুই তরুণ বেকারকে—সোমনাথ আর সুকুমার। ইন্টারভিউয়ের পর ইন্টারভিউ দিতে দিতে দুই বন্ধু হতাশায় ভেঙে পড়ছে। সুকুমার যাবতীয় জি. কে. (জেনারেল নলেজ) আর ইন্টারভিউ-সহায়ক বই পড়ে পড়ে হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, পথের মোড়ে যাকে পায় তাকেই

ধরে ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর চায়—উত্তর না পেলে বিরক্ত হয়। আবার পথে পথে ঘোরে ও যাকে পায় তাকেই প্রশ্ন করে। এরই পাশে সোমনাথ। অর্ডার-সাপ্লাইয়ের পথ ধরে সে চিৎপুর রোডের এক বহুতল বাড়ির হাজারটা আফিসের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ায়। আলাপ হল নটবরবাবুর সঙ্গে। সেই আসল পথ দেখাল, আসল রহস্য ফাঁস করল। অর্ডার পেতে কোনও নারীলোভী ব্যবসায়ীর চাহিদা মতো কলগার্ল সাপ্লাই করতে হবে। তাহলেই বাঞ্ছিত অর্ডার পাওয়া যাবে। বাধ্য হয়ে সোমনাথ তার বিবেক দংশন বর্জন করে সেই পথেই এগোল। এক মাড়বারনন্দনকে মেয়ে সাপ্লাই করে অর্ডার পেল। তারপর জানল সেই মেয়ে আর কেউ নয় ; তারই বন্ধু সুকুমারের বোন কণা।

এই আকস্মিক আঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনি একটি চাবুক-মারা সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে।

তারপর? এরপরও আর কিছু থাকতে পারে কি? নারীউপভোগকারী ব্যবসায়ী গোয়েঙ্কা শিউলি (আসলে কণা)-কে হোটেলের ঘরে ভোগ করার পরেই খুশি হয়ে সোমনাথকে প্রতিশ্রুত অর্ডার সাপ্লাইয়ের চিঠি দিলেন। কেবল এক নম্বর মিলের নয়, দু'নম্বর মিলের কাজটাও সোমনাথ পেল। নিয়মিত কেমিক্যাল সাপ্লাই করবে সোমনাথ। এখন তার হাতে টাকা। সে এখন প্রতিষ্ঠিত। সে এখন বিবেকবর্জিত। এখন থেকে সব অনটনের অবসান।

বাড়ি ফিরেছে সোমনাথ। সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তার মা আর বউদি শুনে খুশি সে সোমনাথ এখন মাসে মাসে কেমিক্যাল সাপ্লাই করে নিশ্চিত অর্থ পাবেই পাবে। মা আর বউদির জন্য এনেছে কাপড়। কিন্তু বউদিকে বলেছে, ওই শাড়ি পরো না, ওতে নোংরা লেগে আছে। বউদি বিস্মিত। সোমনাথ তখন তার ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আসল কারণ কেউ জানল না, সোমনাথ কাউকে তা বলতেও পারে না।

জন-অরণ্য উপন্যাস এখানেই বেকার তরুণ বাঙালিদের জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি উন্মোচন করেছে। এক বন্ধু চাকরি না পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। অপর বন্ধু বিবেকবর্জিত হয়ে অর্ডার সাপ্লাইয়ের চিঠি পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই অনিবার্য পরিণামের দিকে, বিবেকবর্জিত হয়ে জীবনধারণের ট্রাজেডির দিকে পাঠককে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছেন লেখক।

তিন

'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) উপন্যাসের নির্মাণ-কাহিনির অন্তরালে যে সব ঘটনা ও পরিবেশ আছে, তার সম্পর্কে লেখকের স্বীকৃতি আছে 'স্বর্গ মর্ত পাতাল' ত্রিলেখ গ্রন্থে।

হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার বারওয়েল সাহেবের মুহুরি হয়ে চাকুরির শেষে লেখককে অন্যত্র জীবিকার সন্ধান করতে হয়। শর্টহ্যান্ড ও টাইপ করা বিদ্যা সেখানেই কাজে লেগেছে, কিন্তু এবার বড় ভূমিকায় তিনি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কর্পোরেট হাউসের অন্দরমহলে ঢুকলেন।

সত্তরের দশকের কলকাতা। "ঐ সময় বিখ্যাত এক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জানাশোনার সুযোগ হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী এই ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লবের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। যে-সব কাচের ঘরে একদা শ্বেতাঙ্গদের আসন সংরক্ষিত ছিল সেখানে ভারতীয়রা বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু নতুন যুগের এই শিল্পনায়কদের কাছে যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তা কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এমন একটা অভিযোগ শ্রমিক ও কর্মীদের মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যে প্রকাশ্যে কর্মীরা বলাবলি করতেন—কালো সায়েবদের থেকে গোরা সায়েবরাই ভালো। ওদের সঙ্গে কাজকর্ম আলাপ-আলোচনা অনেক সহজ।

শিল্প-বিপ্লবের এই নতুন অভিজাত সম্প্রদায়কে অনেকে ভিলেনের চেয়েও খারাপ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হলেন। এইসব নব-নায়করাও সায়েবদের জীবনযাত্রা নির্লজ্জভাবে নকল করতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে নানা সমস্যা ডেকে আনলেন এবং এদেশের জনজীবনের মূল প্রবাহ থেকে নিজেদের স্বেচ্ছানির্বাসিত করলেন। স্বদেশে জন্ম নিলেও এঁরা হঠাৎ একদিন প্রবাসী হয়ে উঠলেন। নিচুতলার সহকর্মীদের বিদ্বেষকে এঁরা সপরিবারে হিংসে বলে উড়িয়ে দিলেন। মানুষের মধ্যে দূরত্ব বাড়ল, বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর জেলের পাঁচিলকেও লজ্জা দিতে লাগল।

মানবিক সম্পর্কের এই অবস্থা যে-কোন উপন্যাসলেখকের পক্ষেই পরম লোভনীয় বস্তু। এই উচ্চবিত্ত ও বিলাসিতার জীবনকে ভুল না বুঝে, এঁদের ওপর কোনোরকম অবিচার না করে কিছু কাজ করার ইচ্ছে হঠাৎ আমার মধ্যেও প্রবল হয়ে উঠলো।"

এখান থেকে 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসের সূত্রপাত। কিন্তু লেখক একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছিলেন। এই উপন্যাসের বীজ তাঁর মনের মধ্যে দশ বছর লালন করছিলেন। আটকাচ্ছিল কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক কবুল করেছেন—

"উপন্যাসের কাঠামো আঁকবার সময় আমি এমন একটা ঘটনা সন্ধান করেছিলাম যেখানে উচ্চাভিলাষী নায়ক পরিস্থিতির দুর্বিপাকে এমন কাজ করবে যা ঠিক বে-আইনী নয়, কিন্তু 'ইমমরাল'। বিবেক-বহির্ভূত এই অপরাধের দংশন আমার উপন্যাস-ক্লাইমেক্সের পক্ষে অপরিহার্য মনে হয়েছিল।...(অবশেষে) একদা-পরিচিত এক মহিলা টেলিফোন-অপারেটরের সঙ্গে দেখা।" (তিনি অন্যত্র কাজ খুঁজছেন)। "জানতে চাইলাম কেন তিনি বিখ্যাত অফিসের ভালো-মাইনের কাজ ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মহিলা চুপিচুপি বললেন, তাঁর বর্তমান অফিসে নানারকম গোলমাল আসন্ন। ওখানে বিরাট এক্সপোর্টের চুক্তি রয়েছে, যা মান্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভয়ে ওঁরা হয়তো কারখানায় গোলমাল বাধিয়ে দেবেন। মহিলা বিদায় নিলেন, কিন্তু নিজের অজান্তে আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে গেলেন। যা আমি তিন বছর ধরে খুঁজছি তা এক মুহূর্তেই পেয়ে গেলাম।"

পরাধীন ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন establishment-এর ধারক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তোষণকারী। স্বাধীন ভারতে সে অবস্থা বিশেষ বদলায়নি। "ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি

আর শাসনযন্ত্রের স্বীকৃতিকামী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর মননের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। নাগরিক আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে তাঁদের কাজেকর্মে বাস্তবচেতনার পরিচয় দিতে পারছেন না।" (পশ্য 'বুদ্ধিজীবীদের কাল শেষ হল', 'কম্পাস', ৩-১০ এপ্রিল সংখ্যা দুটিতে প্রকাশিত। লেখক রঞ্জু নাগ)।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্যায়ের সঙ্গে গোপন আপসের জ্বলন্ত ছবি শংকরের 'সীমাবদ্ধ'। নায়ক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি ছিল মেধাবী ছাত্র, পাটনায় ইংরেজির অধ্যাপক। মাসিক বেতন একশো নব্বুই টাকা। সে হ'ল কলকাতার হিন্দুস্থান পিটার্স লিমিটেডের সেলসম্যান, বেতন সাড়ে আটশো টাকা। সেই শুরু—তারপর ধাপে ধাপে চাকুরিতে উন্নতি ও ধাপে ধাপে নৈতিক অবনতি। কভেনেন্টেড অফিসার শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির চমকপ্রদ কাহিনি 'সীমাবদ্ধ'। শেষ পর্যন্ত শ্যামলেন্দু হল কোম্পানির সর্বক্ষণের ডিরেক্টর। মাসিক বেতন বারো হাজার টাকা। সঙ্গে অনেকরকম সুখসুবিধা (পার্কস)। এই অত্যাশ্চর্য উন্নতির পিছনে আছে শ্যামলেন্দুর কয়েকটি কাজ, দুয়েকটি সিদ্ধান্ত, যার 'লিগ্যালিটি' আছে, 'মর‍্যালিটি' নেই। নৈতিক ভালোমন্দবোধকে বিসর্জন দিয়ে উচ্চাশাকে কীভাবে সফল করা যায়, 'সীমাবদ্ধ' তারই কাহিনি। উঁচুতলার মানুষের নিচু কাজের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এই উপন্যাস। অ্যাম্‌বিশনকে, উচ্চাশাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে মর‍্যালকে, নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে হয় এবং বুদ্ধিজীবী তা'ই দিয়ে থাকে। এই সমাজসত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। কাহিনি শেষে শ্যামলেন্দুর বিবেকদংশন শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত মদ্যপানে ও ফুঁপিয়ে কান্নায় পর্যবসিত। শ্যামলেন্দুর উচ্চাশার পিছনে নৈতিক সমর্থন নেই। দুর্বল অসহায় গরিব মানুষদের মাথার উপর দিয়ে শ্যামলেন্দুর উচ্চাশার রথ চলেছে। সে জানে তার অন্যায়কে, তবু তা ছাড়তে পারে না। এখানে মানুষ হিসাবে শ্যামলেন্দুর ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা।

হিন্দুস্থান পিটার্স লিমিটেড একটা বড় একস্‌পোর্ট সময়মত দিতে পারছে না। তার ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু একটি শর্ত আছে যা ক্ষতিপূরণের হাত থেকে কোম্পানিকে বাঁচাতে পারে—তা হল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যদি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কর্মীদের ক্যান্টিনে যে খাবার দেওয়া হয় তা নিম্নমানের—এই মিথ্যা অভিযোগকে কিছু দালাল মারফত শ্যামলেন্দু সত্যরূপ দিয়ে গোলমাল বাধিয়ে প্রোডাকশন বন্ধ করিয়ে কারখানা 'ক্লোজার' করিয়ে দিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে শ্যামলেন্দুর দাম বাড়ল, সে পেয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত ডিরেক্টর-পদ।

"হিন্দুস্থান পিটারস লিমিটেড/ভারতে সমিতিভুক্ত/সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ"- আপিসের দরজায় খোদাই-করা নেমপ্লেটের 'সীমাবদ্ধ' শব্দটা পেয়ে গেল নতুন মাত্রা। লেখকের মতে, 'সীমাবদ্ধ' মর্তের কাহিনি।

চার

লেখকের মতে, তৃতীয় উপন্যাস 'আশা-আকাঙ্ক্ষা' স্বর্গের কাহিনি। লেখকের নিবেদনে (১৫.১.১৯৭৩) তিনি জানিয়েছেন, "বছর কয়েক আগে কোনো এক ছুটির দিনে বাংলার বাইরে গিয়েছিলাম। সেখানকার এক আধুনিক গবেষণাগারে কয়েকজন তরুণ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছিল। সেই পরিচয় থেকেই এই উপন্যাসের সূত্রপাত। আমাদের এই ভারতবর্ষে তাঁরা নীরবে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্গলোক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তা সার্থক হোক, দেশজননীকে তাঁরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুন এই প্রার্থনা।"

এই উপন্যাস লেখার পূর্বে লেখক যথারীতি 'হোম-ওয়ার্ক' করেছেন। বস্তুত স্বাধীন ভারতে সার-কারখানার প্রয়োজনীয়তা কতটা তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরে সার-উৎপাদন-পদ্ধতির সবিস্তার আলোচনা করেছেন। সার-কারখানায় উৎপাদনের প্রতিটি ধাপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

এ উপন্যাসের নায়ক কমলেশ। সোমনাথ বা শ্যামলেন্দুর মতো তাকে কোনও অনৈতিক কাজ করতে হয়নি। কঠোর পরিশ্রমে সার উৎপাদন পদ্ধতিকে সাফল্যে পৌঁছে দিতে পেরেছে। জার্মান ইঞ্জিনিয়রদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও বড় সায়েব দিগম্বর ব্যানার্জির অশ্রান্ত তাড়ায় কমলেশ সফল হয়েছে। দিগম্বর ব্যানার্জি কেবল কাজ-পাগল বিজ্ঞানী নন, ইউরিয়া কারখানার সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসেবেও অসাধারণ। ব্যানার্জি বলেছিলেন, ৭ই ডিসেম্বর থেকে কারখানার উৎপাদন শুরু হওয়া চাই। কলকাতায় কমলেশের ফুলশয্যার রাতেই ব্যানার্জির টেলিগ্রাম এল—এক্ষুনি ফিরে এসো। কাজে যোগ দাও। অগত্যা পরদিন সকালেই সদ্যোবিবাহিতাকে ফেলে রেখে কমলেশকে ফিরতে হল কর্মক্ষেত্রে। ব্যানার্জি চান, তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে সার-কারখানায় উৎপাদন শুরু হোক। কোনও ওজর-আপত্তি তিনি শুনবেন না। নির্ধারিত তারিখ ছেড়ে কেন সাতদিন এগিয়ে এলেন তাও জানালেন না। অতএব শুরু হল দিনরাতের পরিশ্রম। জার্মান ইঞ্জিনিয়র, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়র, ভারতীয় কর্মী ও মজুরদের বিশ্রাম বলে কিছু রইল না। অবিশ্রান্ত গতিতে বিরামবিহীন তৎপরতায় কীভাবে তিরিশে নভেম্বরেই উৎপাদন শুরু হল, তার বিচিত্র ইতিহাস 'আশা-আকাঙ্ক্ষা'। স্বাধীন ভারতে সার-কারখানার গুরুত্ব কত দূরব্যাপ্ত এবং যথাশীঘ্র সার-উৎপাদন কেন দরকার, তা নানা চরিত্রের কথায় কাজে লেখক পাঠকদের জানিয়েছেন। কীভাবে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নির্ধারিত দিনেই সার-উৎপাদন শুরু হল তার কাহিনি পাঠককে চুম্বকের মতো টানে। ইতোমধ্যে কমলেশের নববিবাহিতা স্ত্রী কলকাতা থেকে এসে গেছে, কিন্তু তাকে সময় দেবার মতো অবকাশ নেই কমলেশের। উপন্যাসের শেষে একটি ঘটনা কাজ-পাগল নির্মম প্রশাসক বড়সাহেব দিগম্বর ব্যানার্জির ভিতরের মানুষটাকে বের করে এনেছেন লেখক। তিরিশে নভেম্বরে উৎপাদন শুরু হল—এটা দেখেই ব্যানার্জি কলকাতা চলে যাবেন। পরদিনই নার্সিংহোমে তাঁর পেটে অস্ত্রোপচারে দেখা হবে—ক্যানসার কতটা ছড়িয়েছে। আনন্দ-বিষাদে সমাপ্ত এই উপন্যাস স্বাধীন ভারতের কর্মপ্রয়াসের এক উজ্জ্বল আলেখ্য।

প্রফুল্ল রায়ের ট্রিলজি

আমাদের দুই প্রজেন্মর (যাদের বয়স ১৯২০-এর দশকে এবং ১৯৩০-এর দশকে) বাঙালির কাছে তিরিশটি বছর (১৯৪২-১৯৭২) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিরিশটি বছর আমাদের চেনাকাল। এই সময়ে লেখা ও এই সময়ের পটভূমে যে-সব উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তাদের আলোচনায় সমকাল দেশ সমাজের কথা আসবেই। সে-কারণে আমাদের প্রজন্মের দুই লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায় (১৯৩৪) ও শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৪) ট্রিলজির আলোচনার পটভূমিরূপে এই চেনাকালের স্বরূপটি আমাদের চিনে নিতে হয়।

বিংশ শতাব্দীর দুই সাংবাদিক-সাহিত্যিক-সম্পাদক আমাদের আলোচ্যমান কালের স্বরূপটি চিনিয়ে দিয়েছেন। সে-কারণে তাদের বক্তব্য গোড়াতেই উদ্ধার করি। এই বক্তব্য শ্রীপ্রফুল্ল রায় আর শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যয়ের ট্রিলজি অনুধাবনে বিশেষ সাহায্য করে বলে আমার বিশ্বাস।

এই চেনাকালের চরিত্র অনুধাবনে গোড়াতেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় দ্বিতীয় বিশ্বসমর ও সমরোত্তর দুনিয়া এক অস্থির চঞ্চল বিক্ষুব্ধ নতুন দুনিয়া তার সঙ্গে পূর্বতন দুনিয়ার মিল নেই। আজ যে চাঞ্চল্য অসন্তোষ বিদ্রোহ মহাসাগরের কূলে কূলে তরঙ্গিত তা দুই গোলার্ধে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করেছে পুরনো মূল্যবোধ, প্রাচীন সংস্কার ও গুরুবাদী মনোভাব বর্জনে। বহু যুগব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়ায় গুরুবাদী মনোভাব ব্যক্তি ও সমাজের উপরে কায়েমি আশ্রয় বেঁধেছিল, আজ তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট। তার বদলে বুদ্ধিনির্ভর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, আর গড়ে ওঠার মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন, দেখা দিচ্ছে সমাজের অনিশ্চয়তা, চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ।

এই সময়সীমার ভারতবর্ষকে বলা যেতে পারে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ অথবা সদ্য-অতিক্রান্ত সময়ের ভারতবর্ষ। এই কালের পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

"একদিকে জাতির পুনর্জন্ম, অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কারের পুনরুজ্জীবন। এই দোটানায় ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক জীবন বিভ্রান্ত। পূর্বের পরিচিত সমাজ আজ বিলুপ্ত অথবা বিলীয়মান। কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ আজ প্রায় অসম্ভব। পূর্বের সমাজে গুরুবাদ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার নিশ্চয়তাও ছিল। আজ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং বহুক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন। পুরোনো সমাজবন্ধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, তাতে আজ কোন দেশ অথবা সমাজের পক্ষে বাইরের পৃথিবীকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করবার পথ নেই। যেসব মানুষের সঙ্গে

জীবনে কোনোদিন দেখা হবে না, যাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা সাধারণত ভাবি না, তারাও আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের অজান্তে যে সব সিদ্ধান্ত, আমাদের জীবনমরণও তাদের উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যক্তিবোধ এর পূর্বে কোনদিন এত নিরুপায় বোধ করে নি। একদিকে বিপুল বিশ্বের ভার এবং অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের অসহায়তা : তারই মধ্যে আজকার তরুণ-সম্প্রদায় অনিশ্চিত বিদ্রোহে অজানা লক্ষ্যের দিক চলেছে।

চিরদিনের শান্ত আত্মস্থ ভারতবর্ষ তাই আজ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ভারতবাসী আজ পরিচিত বন্দর ছেড়ে দুরন্ত সাগর পাড়ি দিতে চায়। লক্ষ্য আজো স্পষ্ট নয়। কিন্তু লক্ষ্যের আকুতি আজ অনস্বীকার্য।

কোনো সমাজ বা কোনো যুগই কিন্তু স্বয়ম্ভু নয়। হতে পারে না। দুনিয়ায় একেবারে নতুন কিছুই নেই। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের যে সমস্ত অভিব্যক্তিকে একান্তভাবে নতুন মনে হতো, বিচার করলে দেখা যায় যে, তাদেরও ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও পুরাতনের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য যে এক অর্থে নতুন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই দুই-তিন দশকে পরিবর্তনের গতি ও পরিমাণ অভূতপূর্ব। ইতিহাসের আদিমকাল থেকে প্রায় দশ হাজার বছরেও যে সব বদল সম্ভব হয় নি, গত দুই-তিনশো বছরে সেগুলি বাস্তবরূপ নিয়েছে। মানুষের মাঝে যেসব পরিবর্তন গত দুই-তিনশো বছরে হয়েছে, তার তুলনায় পূর্বের দশ হাজার বছরের ইতিহাসকে গতিহীন স্থাবর সমাজের ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। গত পঞ্চাশ বছরে এই পরিবর্তনের গতি আরও বেগবান হয়েছে। বর্তমানে দশ বছরে যেসব পরিবর্তন আসে পূর্বে হাজার বছরেও তা সম্ভব হয় নি।

বর্তমান যুগের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে পরিবর্তনের গতিবেগ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে এবং আজও বাড়ছে। অন্যদিকে, আজ এ পরিবর্তন কোনো বিশেষ দেশকালে সীমিত নয়। আজ পরিবর্তনের ফল পৃথিবীব্যাপী।" (হুমায়ুন কবির—'ভারতীয় ঐতিহ্য', 'চতুরঙ্গ', বর্ষ ৩১, সংখ্যা-২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬/১৯৬৯ খ্রি.)।

এই বিবরণ থেকে ভারতবর্ষের এক অস্থির দশকের (১৯৪০-১৯৫০) চেহারাটা চেনা যায়।

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' (তিন পর্ব) উপন্যাসের সূচনা—১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর, আশ্বিন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। তৃতীয় পর্বে উপন্যাস যখন শেষ হচ্ছে তখন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগ। ১৯৪০-১৯৪৯— এই নয় বছরের পটভূমিতে বিস্তারিত 'কেয়াপাতার নৌকা' উপন্যাস।

এই উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানা পাঠকের পক্ষে জরুরি ও প্রাসঙ্গিক। সাংবাদিক শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত এবিষয়ে একটি বই লিখেছেন—'বঙ্গসংহার এবং (১৯৪৬-১৯৫০)' (প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২। নয়া উদ্যোগ)। দশটি অধ্যায়ে বিভাজিত। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ভারত-বিভাজনের যে রোয়েদাদ ঘোষণা করেন তার তারিখ—নয়া

দিল্লি, ১২ আগস্ট ১৯৪৭। স্মর্তব্য, র‍্যাডক্লিফ এই প্রথম ভারতে আসেন এবং রোয়েদাদ স্বাক্ষর করে সেদিনই বিলাত চলে যান।

"গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদিত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (১৯৪৭) তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে 'বেঙ্গল বাউন্ডারি'-এর কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করেন। ওই একই আইন মোতাবেক কলকাতা হাইকোর্টের দু-জন হিন্দু ও দু-জন মুসলমান বিচারপতিকে 'বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন'-এর সদস্য নিয়োগ করা হল। ... ১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই সাতদিন কলকাতায় র‍্যাডক্লিফ কমিশনের প্রকাশ্য শুনানি চলে। শুনানিকালে চেয়ারম্যান হিসাবে কখনও র‍্যাডক্লিফ অংশগ্রহণ করেননি। তিনি অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশের ২৫টি জেলার মানচিত্র, জেলাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, রেললাইন, নদীপ্রবাহ, সড়ক সংযোগ, বিভিন্ন থানার এলাকা এবং প্রতিটি থানার ধর্মভিত্তিক লোকসংখ্যার অনুপাত সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। অন্যদিকে বাউন্ডারি কমিশনের সদস্য হিসাবে দুই হিন্দু বিচারপতি যথাক্রমে বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস যুক্তভাবে তাঁদের পৃথক রিপোর্ট ও সুপারিশ চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কাছে পেশ করেন। আবার মুসলমান বিচারপতিদ্বয় আবু সালেম আকরাম ও এস ও রহমান আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রিপোর্ট জমা দিলেন র‍্যাডক্লিফকে। .... ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের এই কাঠামোর মধ্যেই বঙ্গপ্রদেশ বিভাগের কাজ সম্পন্ন করেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। (পাঞ্জাব সম্পর্কে একই ধরনের আলাদা সিদ্ধান্ত নিলেন র‍্যাডক্লিফ)। ('বঙ্গসংহার এবং', পৃ. ৬৮-৬৯)

"এদিকে র‍্যাডক্লিফ কমিশনের রিপোর্ট বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গের জনসাধারণকে 'দ্বিধাহীনভাবে ও শান্তচিত্তে' র‍্যাডক্লিফ কমিশনের বঙ্গ বিভাগের বাঁটোয়ারা মেনে নিতে বললেন। (তদেব, পৃ. ৭৩)।

"জীবনসন্ধ্যায় বিস্মরণের তীরে দাঁড়িয়ে বঙ্গ রাজনীতির এক অন্যতম উপেক্ষিত নায়ক ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, '১৪ই আগস্ট মুর্শিদাবাদ ও মালদহ শহরে পাকিস্তানি পতাকা তোলা হয়। দুই বাংলার সীমানা নির্ধারণের ভারপ্রাপ্ত র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রায় বেরোয় ১৭ই। সেই অনুযায়ী খুলনা জিলা যায় পূর্ব পাকিস্তানে। আর মুর্শিদাবাদ ও মালদহ শহরসহ এ দুই জিলার খানিক অংশ হয় পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত। দুই বাংলায় থমথমে ভাব। আমি উদ্যোগী হয়ে স্যার নাজিমুদ্দিন ও আমার নামে যুক্ত বিবৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তার সারমর্ম ছিল যে, র‍্যাডক্লিফ রায়ের পরিবর্তন যা দরকার তা হবে দুই বাংলার মধ্যে আলোচনার মারফতে। যতক্ষণ সেরূপ কিছু করা না হয়, ঐ রায় মেনে চলতে বলি জনগণকে। বল্লভভাই ঐ বিবৃতি পছন্দ করলেন না। কেন ঐ বিবৃতি দিয়েছি জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলি—'এই বিবৃতি দিয়ে বাংলাকে রক্তপাতের হাত হতে বাঁচিয়েছি। নইলে বাংলার অবস্থা পাঞ্জাবের মত হত।' বিরক্ত হয়ে বল্লভভাই বলেন, 'হোতা ত ক্যায়া হোতা!' আমি বলি, 'সেকথা আপনি বলতে পারেন আমি পারি না।'

মহাত্মাজী প্রকাশ্য সভায় কলকাতায় আমার বিবৃতিকে বিজ্ঞজনোচিত আখ্যা দেন।' (তদেব, পৃ. ৮২)

"বঙ্গসংহারের পর বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মনে একই রকম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা দেখা দিল। এগুলি হল, সংসার ও পরিবার বিভক্ত হয়ে যাওয়া, পরিবারের কে হিন্দুস্তানে যাবে কে-ই বা পাকিস্তানে থাকবে কিংবা (মুসলমানদের ক্ষেত্রে) কে পাকিস্তানে যাবে কে হিন্দুস্থানে থাকবে। হিন্দু বাঙালির নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে যে যৌথ পরিবার প্রথা গড়ে উঠেছিল, বঙ্গবিভাগে তা একেবারেই ভেঙে দিল। সমৃদ্ধ বাঙালি মুসলমান পরিবারেও প্রায় একই রকম একটি যৌথবন্ধন ছিল। তাদের ক্ষেত্রেও ওই বন্ধনকে আর ধরে রাখা গেল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কী হবে এটাই ছিল প্রধান উৎকণ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে কে কোথায় কতদিন থাকতে পারবেন, কোথায় যেতে পারবেন এবং দেশত্যাগের পর কী পরিণতির মধ্যে পড়বেন এসবই ছিল প্রধান সমস্যা।" (তদেব, পৃ. ৮৩)

'কেয়াপাতার নৌকা' ট্রিলজিতে এই সমস্যা ও সংকটের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। দেশবিভাজন ও বঙ্গ-পঞ্জাব বিভাগ (১৯৪৭) এমন একটা দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যাতে সমগ্র ভারতবর্ষ উথাল-পাথাল হয়েছিল। তারই জের আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

'প্রসঙ্গত' (ভূমিকা) অংশে লেখক জানিয়েছেন, "এই গ্রন্থের (তিন পর্বের উপন্যাস) পরবর্তী আরও দু-তিনটি খণ্ড লেখার পরিকল্পনা আছে। সেগুলি প্রকাশিত হবে ভিন্ন ভিন্ন নামে। প্রধান কিছু চরিত্র একই থাকবে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আরও অসংখ্য মানুষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর অনন্ত জীবনযুদ্ধের কাহিনি এই উপন্যাসগুলিতে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। সেগুলির পটভূমি হবে বিশাল। দেশভাগের পরবর্তী অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাঙালির সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে মহা সংকট ঘনিয়ে এসেছে তার চিত্র কতটা ধরতে পারব তা জানি না।"

পূর্ববঙ্গের মেয়ে বিবাহ করেছেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে আসা হয়ে ওঠে নি। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গবাসী অবনীমোহনের চোখ দিয়ে পাঠক প্রথম পর্বে আবিষ্কার করে পূর্ববঙ্গকে। যখন অবনীমোহন কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকা জেলার রাজদিয়া গ্রামে তাঁর মামাশ্বশুর হেমনাথের বাড়ি এলেন তখন তিনি পঞ্চাশে উপনীত। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষে তাঁদের কলকাতা ফেরার কথা। কিন্তু অবনীমোহন শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছেড়ে পূর্ববঙ্গেই থেকে যেতে মনস্থ করলেন। কলকাতায় করতেন নানা ধরনের ব্যবসা। সেসব বিক্রি করে দিয়ে পূর্ববঙ্গে ধানজমি কিনে চাষবাস শুরু করতে চাইলেন। অবনীমোহনের কলকাতা থেকে রাজদিয়ায় আগমনে (অক্টোবর ১৯৪০) প্রথম পর্বের সূচনা, পূর্ববঙ্গে রাজদিয়াতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

অবনীমোহন (৫০), তাঁর স্ত্রী সুরমা (৪০-৪২), দুই কন্যা সুনীতি (২১), সুধা (১৮), আর একমাত্র পুত্র বিনুকে (১২) নিয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে এলেন। দুদিনের ট্রেন-স্টিমারযাত্রা শেষে পৌঁছলেন রাজদিয়া। সুরমার দূর সম্পর্কের মামা হেমনাথ আর তাঁর স্ত্রী স্নেহলতা নিঃসন্তান। তাঁরা প্রতি বৎসর অবনীমোহন-সুরমাকে আমন্ত্রণ পাঠান। প্রতিবারই অবনীমোহন পুরী, গিরিডি, দেওঘর ভ্রমণের ওজর তুলে এড়িয়ে যান। এবার শেষ পর্যন্ত রাজদিয়া এলেন।

প্রথম পর্বে আমরা অবনীমোহন ও তার ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গকে দেখি। বলা যায় সপরিবার অবনীমোহন পূর্ববঙ্গকে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারে আছে আনন্দ—নতুনকে দেখার আনন্দ, ভালবাসার আনন্দ, রূপসী বাংলাকে চেনার আনন্দ, পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলিম সমাজে নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ, সারা বৎসরের নানা পালাপার্বণে যোগ দেবার আনন্দ, নতুন নতুন বন্ধু পাবার আনন্দ।

সেই কারণে 'কেয়াপাতার নৌকা' প্রথম পর্বের ভাষা মসৃণ ও দীপ্ত, নিসর্গ উজ্জ্বল ও স্বপ্রসাধিত, মানুষজন হৃদয়বান। হিন্দু মুসলমানের প্রীতি ও সৌহার্দ্য দেখে সপরিবার অবনীমোহন মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছে প্রথম পর্বের সবখানে—স্থলে জলে ঋতুপর্যায়ে আকাশে বাতাসে পাখপাখালি পশু জলচর স্থলচর জীবজন্তুতে আর মেলায় হাটেগঞ্জে আর নানা লৌকিক আচারে গানে পূজাপার্বণে। সে কারণেই প্রথম পর্বের গদ্যভাষা উজ্জ্বল মসৃণ গতিসম্পন্ন। মনে হয় লেখকের কলমে আঁকা নিসর্গ আর মানুষ ঝকঝক করছে।

বস্তুত প্রথম পর্বে লেখক আমাদের এনে ফেলেছেন নিসর্গের ফ্রেমে বাঁধানো এক আনন্দলোকে।

অবনীমোহনের শেষ সন্তান পুত্র বিনুর চোখ দিয়েই পাঠক মূলত পূর্ববঙ্গের জীবনকে দেখেছেন। ক্রমে ক্রমে বিনু-ই হয়ে ওঠে তিন পর্বে বিন্যস্ত সুদীর্ঘ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু তা পরের কথা।

বিনুর চোখে আমরা পূর্ববঙ্গ-আবিষ্কারের প্রথম প্রক্রিয়াটা দেখি। তা সানন্দ বিস্ময়-ভরা।

"বালক বিনু ভাবছিল পরশুদিন এই সময়টা তারা ছিল কলকাতায়, ভবানীপুরের বাড়িতে। .... তার পর সন্ধেবেলা শিয়ালদা গিয়ে ঢাকা মেল ধরেছে। কাল সকালে এসেছে

গোয়ালন্দ। সেখান থেকে এই স্টিমারটায় পাড়ি জমিয়েছে। কাল রাত্তিরে তাদেরই রাজদিয়া পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু বিপদ বাধিয়েছিল নদীর একটা চড়া। আটদশ ঘণ্টার মতো স্টিমারটাকে আটকে রেখেছিল।" (পৃ. ১৩)

কোন্ বিনু কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে এলো? সে কথাও ভোরে স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে রাজদিয়া স্টিমারঘাটের দিকে তাকিয়ে বিনু ভাবছিল।

"দুচোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে বিনু। স্টিমার এখন যেখানে, সেখান থেকে নদীর তীর খুব কাছে, আধ মাইলের মধ্যে। গাছপালা, সবুজ বনানী, ফাঁকে ফাঁকে দু একটা বাড়িঘর চোখে পড়ছে। অন্য পাড়টা অনেক দূরে। ধু ধু, দুর্বল রেখায় আঁকা জলছবির মতো অস্পষ্ট।

নদীর ঠিক মাঝখানটায় ঝাপসা কুয়াশার ভেতর অসংখ্য কালো কালো বিন্দু বিচিত্র সংকেতের মতো ছড়িয়ে আছে। মা বলেছেন ওগুলো জেলেডিঙি, সারারাত নদীময় ঘুরে নাকি ইলিশ মাছ ধরে। .... বিনু শুধু তাকিয়ে আছে। অসীম বিস্ময় ছাড়া তার আশেপাশে আর কিছুই নেই এখন।..... এখানে এই পারাপারহীন জলরাশির দৃশ্য তাকে যেন বিহ্বল করে ফেলেছে।" (পৃ. ১১-১২)

কোথা থেকে, কোন্ প্রেক্ষাপট থেকে বিনু এসেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বিনুর বিস্ময়ের হদিশ পাই। লেখক জানিয়েছেন,

"বিনুর জন্ম কলকাতায়। পুবে বেলেঘাটা, পশ্চিমে বড় গঙ্গা, উত্তরে বাগবাজার, দক্ষিণে টালিগঞ্জ—কলকাতার চার সীমার ভেতর এত মজা, এত চমক, এত ঘটনার মেলা সাজানো যে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দেওয়া যায়। আর অবনীমোহন মানুষটা স্বভাব-যাযাবর। কোথাও যদি দুটো দিন পা পেতে বসেন। তাতে কটা দিন ফালতু এসে গেল তো সংসার তুলে নিয়ে পাড়ি দিলেন রাজপুতানায় কি সৌরাষ্ট্রে। মগধে অথবা কোশলে। চার বছরের ছোট্ট জীবনে অনেক দেখেছে বিনু।" (পৃ. ১৩)

এবার অবনীমোহনের মত হয়েছে, তাই দিল্লি আগ্রা দার্জিলিং প্রয়াগ না গিয়ে টিকিট কেটে ঘর-সংসার তুলে দিয়ে ঢাকা মেলে গিয়ে উঠেছেন। স্ত্রী সুরমার বহুবারের অনুরোধ এবার তিনি শিরোধার্য করেছেন।

রাজদিয়া স্টিমারঘাটে পা রাখার অব্যবহিত পূর্বে লেখক জানিয়েছেন, "বার বছরের বিনু ক্লাস সেভেনে পড়ে। অনেক কিছু বুঝতে পারে সে। তার অনুভবের সীমা বহুদূর বিস্তৃত। দাদুর চিঠি সে পড়েছে। সেগুলোতে যে আন্তরিকতা, যে স্নেহপূর্ণ মাধুর্যের সুরটি থাকে বিনুকে তা অভিভূত করেছে। কোনও দিন দাদুকে দেখেনি বিনু। তবু মনে হয়েছে তাঁর মতো মমতাময়, মধুর মানুষ জগতে খুব বেশি নেই। রাজদিয়া বার বার তাকে গোপনে হাতছানি দিয়ে ডাকে।" (পৃ. ১৩)

রাজদিয়ায় পা রাখার এই ভূমিকা পাঠককে সচেতন ও চমৎকৃত করে তোলে—বিনুদের পরিবার আজ বলতে পারে 'এলেম নতুন দেশে'। সবই নতুন। নিসর্গ, পশুপাখি, মানুষজন, আত্মীয়স্বজন, পরিবেশ—সবকিছুই নতুন আর আন্তরিক।

বিনুরা লক্ষ করল, জেটিঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রবীণ। রঙ কালো। মজবুত স্বাস্থ্য।

পরনে খাটো ধুতি, খদ্দরের ফতুয়া। দুচোখ স্নেহে ভাসা, কিছুটা উৎকণ্ঠিত। বয়স ষাট পেরিয়েছে। ইনিই দাদু হেমনাথ। তাদের নিতে এসেছেন। সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। ফুলো ফুলো নরম লালচে গাল—নাম ঝিনুক।

কতকাল পরে দেখা। সুরমার বিয়ে হয় তার সতের বছর বয়সে। আজ চল্লিশ পেরিয়েছে। হাঁপানি রোগে সদা অসুস্থ। মামা-ভাগ্নীর আলাপের পর জামাই ও দুই মেয়ে এক ছেলের সঙ্গে দাদু হেমনাথের আলাপ হল। এই আলাপের আন্তরিকতা পাঠকমনকে স্পর্শ করে যায়। পাঠক ইঙ্গিত পায়, হেমনাথের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের জীবন ও প্রকৃতি তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করছে। হেমনাথের হাত ধরে আছে যে সুন্দর বাচ্চা মেয়েটি ঝিনুক—সে রাজদিয়ার ভবতোষ লাহিড়ির মেয়ে, ভবতোষ আপাতত পত্নী-বিচ্ছিন্ন। তাই হেমনাথ-স্নেহলতাই তার আশ্রয়। হেমনাথ বললেন, মেয়েটা খুব দুঃখী।

স্টিমারঘাটের বাইরে অপেক্ষমান দুখানা ফিটন-গাড়িতে উঠল নবাগতরা। ফিটনে চড়ে দাদুর বাড়ি যাবার পথে বিনুরা যা দেখে তাতেই অবাক হয়। বাজারে নেমে হেমনাথ এক হাঁড়ি রসগোল্লা (ছ'আনা সের) আর একটা বড় পাকাকলার ছড়া কিনলেন।

পথে যেতে যেতে হেমনাথ-অবনীনাথের আলাপে জানা গেছে, এখন (১৯৪০) ইউরোপে যুদ্ধ চলেছে, হিটলার ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছে, ভারতে—কলকাতায় এখনো তার প্রভাব পড়েনি। দূরবর্তী বিপত্তির এই প্রথম ইশারা পেলেন হেমনাথ অবনীমোহনের কাছে। আজ ১৯৪০-এর অক্টোবর। জানা নেই, অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে। আপাতত ছ'আনা সের রসগোল্লা, বছর খানেক পূর্বে ছিল তিন আনা। আর পাকা কলার ছড়াটা অমৃতসাগর, তিন পয়সা হালি, নামে গুণে সুন্দর। মাঝপথে দেখা হল যুবক হিরণের সঙ্গে। হেমনাথের বন্ধু দ্বারিক দত্তর নাতি, গত বছর ইকনমিকস অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, এখন এম.এ পড়ে, হেমনাথের কথায় রাজদিয়ার রত্ন।

ফিটন পৌছল বিশাল বাগানে। ফলফুলে ভর্তি। সাত-আট বিঘের মতো জায়গা জুড়ে হেমনাথের বাড়ি। বাগান পেরিয়ে মস্ত উঠোন। বাগান আর জায়গার মতো এ বাড়ির কর্তা ও গিন্নি হেমনাথ আর স্নেহলতা। আর আছে স্নেহলতার বিধবা বোন শিবানী। বাকি সব কামলা আর আশ্রিতের দল। নামতেই বোঝা গেল হেমনাথ সম্পন্ন গৃহস্থ। পরে আরো বোঝা গেল, তিনিই রাজদিয়ার তাবৎ হিন্দু-মুসলমান সমাজের অভিভাবক, শ্রদ্ধার পাত্র। এখন যাবেন কেতুগঞ্জে—একটা ঝগড়াব সালিশী করতে।

কামলা দুটির নাম যুগল আর করিম। বিনুর পরবর্তী জীবনে যুগল খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে।

হেমনাথের সঙ্গী মেয়েটি, যার নাম ঝিনুক, তার বাপ-মা ভবতোষ আর তার স্ত্রীর মধ্যে আপাত-বিচ্ছেদের পর আছে হেমনাথ-স্নেহলতার স্নেহাশ্রয়ে। শেষ পর্যন্ত এটাই তার পাকা আশ্রয় হয়ে যেতে পারে।

আহারের পর বিশ্রাম। অবনীমোহন সুধা আর হিরণ পুবদুয়ারী বড় ঘরে আড্ডা জমালেন। সুনীতি সুরমা স্নেহলতা শিবানী ভেতর দিকে রান্নাঘরে গেল। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ। পরস্পরের মধ্যে অনেক কথা জমে ছিল। সেইসব কথা হতে লাগল। আলাপনের

মধ্যে একটিই কাঁটা—হতভাগিনী বালিকা ঝিনুক। এদিকে বিনুর সঙ্গে যুগল কামলা আলাপ শুরু করে দিল। কইলকাতা যে কতো বিশাল শহর সে সম্বন্ধে যুগল বিনুর কাছে খোঁজখবর করতে লাগল। এই যুগল-ই বিনুকে ধীরে ধীরে রাজদিয়ার নিসর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। বারো বছরের বিনুর বারবারই মনে হয়, এলেম নতুন দেশে। রাজদিয়ার প্রকৃতিতে যে কতো বিস্ময় আর আনন্দ পরতে পরতে মেশানো আছে, তা যুগল বিনুকে চেনাতে লাগল। চারদিকে জলরাশি—বড়ো পুকুর বিশাল নদীতে ঘেরা রাজদিয়া। এখন শরতের দিন। কিছুকালের মধ্যেই জল কমে যাবে। এখন নাওয়ে ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না। শীত এলেই ধূসর মাঠঘাট শুকিয়ে যাবে। বিনুর বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

'কেয়াপাতার নৌকা' প্রথম পর্বে মুগ্ধতা, কেবলই মুগ্ধতা। কলকাতা থেকে আসা বসু পরিবার (অবনীমোহন, তার স্ত্রী, দুই কন্যা আর এক পুত্র) জানছে নতুনকে—মানুষকে, নিসর্গকে, পরিবেশকে। সেই কারণে উপস্থাপনার ভঙ্গিটি মনোরম, গতি মসৃণ, জলেস্থলে উজ্জ্বল আলো।

একের পর এক মানুষকে নবাগতরা চিনছেন। তাঁরা চিনলেন ঝিনুকের বাবা ভবতোষকে। ভবতোষ ঢাকায় রেখে এসেছে স্ত্রীকে তার বাপ-মায়ের কাছে। জানা গেল, সে আর ফিরে আসবে না। চল্লিশোর্ধ্ব, চোখের কোণে কালি, চুল এলোমেলো, মুখে অজস্র দাগ—এই হল ভবতোষ। সুখের কাহিনিতে এই প্রথম একটা বেসুরো আওয়াজ শোনা গেল। ঝিনুককে নিয়ে ভবতোষ চলে গেল, জানাল দু-চার দিন পরে ফিরিয়ে দিতে যাবে ঝিনুককে।

এলেম নতুন দেশে—এই ভাবটি আস্তে আস্তে নবাগতদের মনে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। "জানলার বাইরে চোখ মেলেই ছিল বিনু। .... জোনাকি আর মাঝে ধানখেতে আলোর ওই বিন্দু ক'টি ছাড়া চারধারে শুধু অন্ধকার—গাঢ়, অথৈ, অতল আঁধার।" (পৃ. ৪২)

বিনুর মনে হল কলকাতা থেকে আজ তারা কতো দূরে। বিজলিবাতি নেই, মহানগরের কোলাহল নেই, শোনাই যায় না পথিকের কণ্ঠস্বর।

"পূর্ব বাংলার এই সুদূর প্রান্তে এত অন্ধকার জমা হয়ে থাকবে আর সন্ধে নামতে না নামতেই ঝুপঝুপ করে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, কে ভাবতে পেরেছিল। কলকাতার রাত্রি টেরই পাওয়া যায় না। সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ফোয়ারা ছুটে যায়। .... কিন্তু এখানকার রাত্রি প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আছে। .... শুধু অচেতন জড় পৃথিবীর ওপর নয়, বুঝিবা অন্ধকার কোনওদিন ফুরোবে না।" (পৃ. ৪২-৪৩)।

কলকাতা আর রাজদিয়া—দুটি নতুন জগৎ। কোথাও দুয়ের মধ্যে যোগ নেই। এই নতুন পরিবেশে বিনুরা কীভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, তা উপন্যাস-সূচনায় প্রাধান্য পায়। বিনুর নিত্যসঙ্গী যুগল। এই যুগলই 'ছুটো বাবুকে' চিনিয়ে দিচ্ছিল গ্রামপ্রকৃতি আর পরিবেশকে। কেতুগঞ্জে গিয়েছিলেন হেমনাথ সকালে, ফিরলেন মজিদ আর তার বোনাই হাসেম আলির সঙ্গে। নৌকা থেকে নামল বড় বড় মুখ-বাঁধা তিনটে হাঁড়ি (মিষ্টিতে ভর্তি) আর একটা বড় রুইমাছ। হেমনাথ আর মজিদ মিঞার পারস্পারিক ভালবাসা আস্থা দেখে কলকাতার আগন্তুকরা অবাক হল। রাতে মজিদ মিঞা আর হাসেম আলির সঙ্গে খেতে

বসলেন হেমনাথ, অবনীমোহন, বিনু আর মজিদের দুই মামি। অবনীমোহন চমৎকৃত হলেন। উনিশশ চল্লিশে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈশ্য-হিন্দু-মুসলমান যখন নানা ভাগে খণ্ডিত, তখন মজিদ মিঞার গা ঘেঁষে খেতে বসা দেখে।

লেখকের উক্তিটি মূল্যবান—"বিকেলবেলা ভবতোষ গাঢ় বিষাদের ছায়া নিয়ে এসেছিলেন। মেঘের পর রৌদ্রঝলকের মতো মজিদ মিঞা এ বাড়িটাকে আবার আলোকিত করে গেছে।" (তদেব, পৃ. ৪৯)

'কেয়াপাতার নৌকা' প্রথম পর্বে এই আলোকেরই প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানে পারস্পারিক আস্থা ভালোবাসা দেখে অবনীমোহনের সঙ্গে পাঠকও চমৎকৃত হয়ে যায়। লেখক প্রথম পর্বে এটিকেই মূল সুর করে তুলেছেন। পরদিন ভোরে বিনুর ঘুম ভেঙে গেল সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনে। কাল তারা রাজদিয়া এসেছে। আজ নতুন জগতের প্রভাতে বিনু জেগে উঠল। যা দেখে যা শোনে সবই নতুন। সবই তাকে মুগ্ধ করে। রাজদিয়ার দিন-যাপন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে কলকাতায় দিন-যাপনের প্রক্রিয়ার কোনো মিল নেই। আবারও বিনু মুগ্ধ হল, চমৎকৃত হল। বড়দের সঙ্গেই বিনু পথে বেরুল। স্টিমারঘাট পেরিয়ে নৌকাঘাট। সবাই হেমনাথকে ডাকে বড় কত্তা। এক টাকায় বড় বড় সাইজের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ছয়টা। হেমনাথ আটআনায় তিনটি বড় ইলিশ কিনলেন।

এই শরতে রাজদিয়ার পথে ঘাটে অনেক মানুষের চলাচল। হেমনাথ জানালেন পুজো-ঈদের ছুটিতে অনেকেই বাড়ি এসেছে। ছুটি-শেষে বেশির ভাগ সমর্থ লোক যুবক ছাত্ররা চলে যায় ঢাকায় আসামে কলকাতায় হিল্লি-দিল্লিতে।

"সারা বছর রাজদিয়ায় ঢিমে তালের সুর লেগে থাকে। জীবন তখন মন্থর, ঘুমন্ত, নিষ্প্রভ। ...আশ্বিন মাসটি যেই পড়ল আকাশে বাতাসে ছুটির সানাইও বাজল, নদীর ধারে কাশফুলের বন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল আর রোদের রংটি হয়ে গেল গলানো সোনার মতো। সেই সময় রাজদিয়ার গায়ে সোনার কাঠি লেগে যায়। জলোচ্ছ্বাসের প্রবল ঢলের মতো দূর দূরান্ত থেকে দুর্বার আকর্ষণে ছেলেরা ফিরে আসে। .... রাজদিয়া জুড়ে তখন প্রমত্ত উৎসব শুরু হয়ে যায়। তারপর পুজো যেই শেষ হল, ছুটির মেয়াদ ফুরলো, ধীরে ধীরে রাজদিয়াকে অপার শূন্যতার ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে একে একে সবাই গিয়ে স্টিমারে ওঠে।" (তদেব পৃ. ৫৩)

লেখক অবনীমোহনদের এমন এক দেশে (রাজদিয়া) নিয়ে এসেছেন যখন প্রসন্ন মধ্য ঋতু (শরৎ), মানুষ আর নিসর্গ উৎফুল্ল, উৎসবের বাঁশিটি শোনা যায়। এই বিবরণ পড়তে পড়তে পাঠকমন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মনে হয় আমরা এক সুখলোকে পৌঁছেছি। কিন্তু এই সুখ, আনন্দ, প্রসন্নতা যে পূর্ববাংলায় চিরস্থায়ী হবে না, তার ইঙ্গিত নেই প্রথম পর্বে। তা আছে দ্বিতীয় পর্বে। আপাতত নিসর্গ সুখী, মানুষ সুখী, আকাশবাতাসে ভাসে আনন্দের সুর।

শহর পরিক্রমার পথে বেরিয়ে হেমনাথ আলাপ করেন পুরনো হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে। হেমনাথের সমবয়সী বন্ধু রামকেশব সস্নেহে সকলকে নিজের বাড়ি টেনে নিয়ে যান। সেখানেই আলাপ হল রামকেশবের পুত্র শিশিরের শ্যালক—আনন্দর সঙ্গে। এই

যুবকটি নবাগত। একে লেখকের ও পাঠকের দরকার আছে। পরে জানা যাবে, সুধা যদি হিরণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তবে সুধার দিদি সুনীতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে আনন্দর (সদ্য আইন পরীক্ষা দিয়ে হয়েছে ব্যবহারজীবী)। (তদেব পৃ. ৫৫)।

পাঠক অনুমান করতে পারে, লেখক কেবল নতুন নতুন চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন না, সেই সঙ্গে জোড়া মেলাবার ব্যবস্থাও করেছেন। রাজদিয়ায় পুজোর ছুটিতে অভিনীত হল নৃত্যনাট্য শ্যামা (যাতে নেচেছে সুধা) আর 'বিজয়া' নাটক (যাতে নেচেছে সুনীতি), সঙ্গে আছে যথাক্রমে হিরণ আর আনন্দ। কেবল নাটকে নয়, পরবর্তীকালে তারা জীবনেও জুটি বেঁধেছে (তদেব, পৃ. ১৭৭-১৭৮)। অনুধাবন করা যায়, লেখক একটা ছক (প্যাটার্ন) ঠিক করে নিয়ে উপন্যাসকে এগিয়ে দিচ্ছেন। আনন্দর বাঘ শিকারের গল্পে সবাই মোহিত, সুনীতি বিমুগ্ধ। এখানেই বিনুর সঙ্গে আলাপ হল সমবয়সী মেয়ে ঝুমার। তাহলে পাঠক অনুমান করতে পারেন, বিনুকে টানবে দুটি মেয়ে—ঝিনুক আর ঝুমা। এবং পাঠকের অনুমান পরবর্তীকালে ঠিক বলেই প্রমাণিত হবে। (পৃ. ৫৬)

পথে চলতে চলতে হেমনাথ আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ করলেন। যেমন চালের পাইকারি ব্যবসাদার ধনী অধর সাহা। হেমনাথের সঙ্গে বাকিরা ধীরে ধীরে শহর পরিক্রমা করছিল। নৌকাঘাট পেরিয়ে রাস্তা ঘুরে গেছে। দুদিকে পথ। একদিকে লাল সুরকিতে ছাওয়া—নদী আর ঝাউগাছের শ্রেণির মাঝ দিয়ে গেছে। অন্যদিকে রাস্তাটা নেমে গেছে মাটিতে। মাছের আড়তদার নকুল। ইলিশ উঠেছে অনেক, তাই টাকায় ছয়টা না, দশটা। আট আনায় পাঁচটা বড় ইলিশ, সেইসঙ্গে ছুটোবাবু বিনুর জন্য উপহার একটা—একুনে ছয়টা। তারপর দেখা হল, লালমোহন অর্থাৎ পাদ্রি ডেভিড লারমোর। তিনি ডাক্তারি পাশ করে সুদূর আয়ার্ল্যান্ড থেকে প্রথম যৌবনে এসেছিলেন রাজদিয়া, আজও বিনা পয়সায় রোগী দেখেন, ওষুধ দেন আর নিজের গির্জায় উৎসব করেন। এই সেবাব্রতী লালমোহন উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র।

লারমোর এলেন হেমনাথদের বাড়িতে। সেই ২৫ বছর পূর্বে দেখেছেন অবনীমোহনের স্ত্রী সুরমাকে। এতদিন পরে আবার দেখা। তাঁকে দেখেই অসুস্থ সুরমা যেন ২৫ বছর পেরিয়ে গিয়ে কিশোরীতে পরিণত হলেন, ছুটে গিয়ে প্রণাম করলেন লালুনামাকে। লারমোরও তাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিলেন। হেমনাথের স্ত্রী স্নেহলতা অনুযোগ দিলেন লারমোর সাহেব কথা দিয়েও কথা রাখেন নি, আসব বলে আসেন নি। দেখা গেল, স্নেহলতার সঙ্গে লারমোর সাহেবের স্নেহ-সম্পর্কে। ৪০ বছর যাবৎ লারমোর আছেন পূর্ববাংলায়। বাংলাভাষাটা চমৎকার বলেন, গরিব মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন আর মাঝে মাঝে স্নেহলতার কাছে বসে ভাত খেয়ে আসেন, সেই সঙ্গে সুর করে গেয়ে ওঠেন মঙ্গলকাব্যের ইলিশ-বন্দনা।

বিনুকে মুগ্ধ করেছে দুজন লালমোহন (লারমোর) আর যুগল কামলা। হিরণকে লারমোর বলেন নিজের কথা—'যেদিন প্রথম এদেশে আসি সেদিন থেকেই আমার বাঙালি হব। তারপর চল্লিশ বছর ধরে সেই চেষ্টাই করে আসছি।.... প্রাণভরে সারা গায়ে

এখানকার আলো-বাতাস ধুলো-কাদা মেখেছি। বাকি ছিল গায়ের রংটা। তুই তো বলছিস, রঙের গর্ব আমার ঘুচেছে। এতদিন আমি কি তবে পুরোপুরি এদেশের মানুষ হতে পারলাম।' (পৃ. ৭০)

হিরণ বাড়ি থেকে হেমনাথের বাড়ি গ্রামোফোন এনেছিল। রেকর্ডে গান শুনে সন্ধ্যাবেলাটা সকলের চমৎকার কাটল।

লারমোর কথা দিলেন বিনুকে তিনি হাটে নিয়ে গিয়ে সবকিছু দেখাবেন পরদিন—সেখানেই তিনি বিনা পয়সায় রোগীদের চিকিৎসা করেন আর ওষুধ দেন। এটাই তাঁর খ্রিস্ট-ভজনা—এটাই তাঁর লোকসেবা। পরদিন হেমনাথরা দুটি নৌকায় হাটে এলেন।

সকালে যুগলের নৌকায় বিনু। বাকি সকলে অন্য নৌকায়। হাটে যাবার নাম করে যুগল অন্যদিকে জলপথে চলে গেল অন্যগ্রামে বিনুকে নিয়ে। যাবার পথে মাছ ধরে নিয়ে পৌঁছল এক পাতানো দিদি টুনিদির বাড়িতে। যুগলের পিসতুতো বোন টুনি। তারই আত্মীয়া পাখি। তার জন্যেই যুগলের ব্যাকুলতা। সুজানগঞ্জে হাটে যাবার আগে চুপিচুপি পাখির সঙ্গে দেখা করে গেল। যুগল তাকে গান শোনাল। বোঝা গেল পাখির জন্যই তার প্রাণ পোড়ে (পৃ. ৯০-৯৪)।

সুজানগঞ্জের হাটে এসে বিনু পূর্ববাংলার আর এক রূপ দেখল। সে যা দেখে তাতেই বিস্মিত হয়। এইসব অভিজ্ঞতা সবই তার কাছে নতুন, অভিনব। দেশে দেশে হাটেগঞ্জে ঢেঁরা দিয়ে বেড়ায় একটা লম্বা রোগা লোক—'নাজিরপুরের জমিদার তৃতীয়বার কচ্চি মেয়ে বিবাহ করেছেন; তিনি বলেন, তিনি মাউগা না।' এতেই হাটের ভিড়ে হাসির ধুম পড়ে গেল। (পৃ. ১০০-১০২)। শ্রোতাদের কাছ থেকে দু-এক পয়সা তার মিলে যায়। এভাবেই নাওয়ে চড়ে সারা দেশে ঢেঁরা দিয়ে বেড়ায়। বিনু দেখল লারমোর সাহেব ডাক্তারি করছেন। তারপর দেখল তার দাদু হেমনাথ তার বাবা অবনীমোহন সওদা করেছেন। শোনা গেল ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী—চার রাত যাত্রা কবিগান কাঠিনাচ আর সারিগানের আসর হবে হাটে।

পূর্ব বাংলার জীবন বিনু যতই দেখে ততই বিস্মিত হয়। বাড়িতে তাকে টানে দুই কিশোরী—ঝুমা আর ঝিনুক। ঝিনুক চায় বিনু কেবল তার সঙ্গেই খেলবে। ঝুমার সঙ্গে খেলবে না। পূজার সময় রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা নৃত্যনাট্য' আর শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটক দেখে গ্রামের লোক ভারি খুশি। এই সুযোগে সুধা হিরণ আর সুনীতি আনন্দ—পরস্পরের খুব কাছে এসে গেল (পৃ. ১৭২-১৭৮)। গ্রামে দুর্গা পুজো আর ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পুজো দেখে সবাই খুব খুশি। অবনীমোহন ও তার পরিবার যা দেখে তাতেই খুশি।

'কেয়াপাতার নৌকা' প্রথম পর্বের শেষে অবনীমোহন হেমনাথকে জানালেন তিনি আর কলকাতার পুরনো জীবনে ফিরে যাবেন না। রাজদিয়াতেই সপরিবারে থাকবেন, ধানজমি কিনবেন, চাষবাস করবেন। এতকাল পরে পূর্ব বাংলায় এসে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন। বাংলার এই স্নিগ্ধ মনোরম রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। "পূর্ব বাংলাকে না চিনলে অখণ্ড বাংলাদেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।" (পৃ. ২২৪)। এখানেই 'কেয়াপাতার নৌকা' প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

তিন

অবনীমোহন ভেবেছেন 'মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে'। পূব বাংলায় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে অবনীমোহনের ধারণা সত্য ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকল না। আমরা চলে এলাম উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে। পূর্ববাংলার সবকিছুই আনন্দময়—এই ধারণা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা গেল না। পরবর্তী এক দশক বঙ্গ ও ভারতের পক্ষে কালান্তরের কাল, বিপর্যয়ের কাল, সর্বনাশের কাল। কেয়াপাতার নৌকা দ্বিতীয় পর্বে তা এলো, কেউ তা নিবারণ করতে পারল না।

এই উপন্যাসে অবনীমোহন একটি ভ্রাম্যমাণ চরিত্র। তাঁর যে ছবি পাঠক উপন্যাসে পায় তা এইরকম :

"সাধারণ মানুষ পায়ের তলায় নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয় পেলেই স্থির হয়ে বসে। সেইখানেই জীবনকে ফুলফলে ভরে তোলে। অবনীমোহন কোনওদিন তা পারলেন না। পায়ের নিচে স্থির ভূমি তো কতবারই তিনি পেয়েছেন। প্রথম জীবনে বিরাট সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন, সেটা থাকলে এতদিনে হাজার টাকার বেশি মাইনে হয়ে যেত। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চাকরি ছেড়ে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। অধ্যাপক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি হল, কিন্তু তার আয়ুও বেশিদিন নয়, বড়জোর বছর চারেক। তারপর কালো কোট চাপিয়ে উকিল সাজলেন, ওকালতিতে যথেষ্ট পয়সা হল। কিন্তু একদিন দেখা গেল, আদালত-টাদালতের বদলে শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত শুরু করেছেন, হেসিয়ান আর বুলিয়ন মার্কেটের রহস্য কিছুদিন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

মোট কথা, কোথাও নোঙর ফেলে বসা তাঁর স্বভাবে নেই"। (কেয়াপাতার নৌকা, ১ম পর্ব, পৃ. ২১৬)।

সুতরাং অবনীমোহন যখন স্থির করেছেন কলকাতা ফিরবেন না, রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন, চাষবাস করবেন, তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা আশ্চর্য হলেন না। রাজদিয়া আসার পূর্বে কলকাতায় এজেন্সির ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তা এক কথায় ছেড়ে দিলেন। যতদিন পূর্ববাংলা তাঁকে মুগ্ধ বিস্মিত চমৎকৃত করে রাখছে ততদিন এখানেই থাকবেন। অবনীমোহন প্রচুর ধানজমি কিনলেন, শুরু করলেন ধানচাষ। উপন্যাসের ২য় পর্বে তাঁকে দেখা গেল ধনী চাষী রূপেই। ঢাকা ছাড়া পুব বাংলার কলেজগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, অতএব ভবতোষের কলেজে সুধা সুনীতি ভর্তি হতে পারে এবং বিনু ইশকুলে ভর্তি হতেই পারে। সুতরাং অবনীমোহনের পরিবারের নতুন জীবন শুরু হল উপন্যাসের ২য় পর্বে।

এদিকে বিনুর নিত্যসঙ্গী যুগল কামলা। সে তার ছুটোবাবুকে মনের কথা বলে। কার্তিক প্রায় শেষ হয়ে এলো। এরপর অঘ্রান—শুরু হবে ধানকাটা। মাঘ পেরিয়েই ফাগুন মাস। যুগল জেনেছে তার ভাবী শ্বশুর গোপাল দাস বিয়ের কেনাকাটা সেরে ফেলেছে, শীঘ্র আসবে হেমকত্তার কাছ থেকে যুগলের বিয়ের পর্বের টাকা নিতে।

অন্যদিকে হেমনাথের বন্ধু মজিদ মিঞা অবনীমোহনকে ধানচাষের জমি কেনায় ও

ধানচাষে সর্ববিধ সাহায্য করে। মজিদ মিঞা তার তিরিশ কানি জমি সুলভে অবনীমোহনকে দেয়। অবনীমোহন ক'দিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে কাজ শেষ করে ফিরে এলেন ও মজিদের কাছ থেকে তিরিশ কানি ধানজমি কিনে রেজিস্টারি করে ফেললেন।

এইসব ঘটনা মনে হয় বড় সুখের, বড় আহ্লাদের। হায়, তখন কি রাজদিয়ার মানুষ বা বাংলার মানুষ কি জানত কোন এক সর্বনাশের দিন আসছে?

হিরণ, ভবতোষ, মজিদ মিঞাই শুধু নয়, বিনুরা যে এখন থেকে রাজদিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হবে, এই সংবাদে রাজদিয়ার সব পাড়ার লোক এসে আনন্দ প্রকাশ করল।

ঘটনাস্রোত দ্রুত বেগে এগোয়। সুধার সঙ্গে হিরণের, সুনীতির সঙ্গে আনন্দর মেলামেশা দ্রুত পরিণতির পথে চলে। এক সঙ্গে দুই বোনেরই বিয়ে হয়ে যায়। অবনীমোহন ধানচাষ শুরু করেন—নতুন করে অনেক কিছু শিখে ফেলেন। আর বিনু যুগলের সঙ্গে ঘুরে রাজদিয়ার জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলে। কাউঠ্যা (কচ্ছপ) কী করে শিকার করতে হয় তা শিখে গেল। যুগলই তাকে দেখাল খালে আগন্তুক সাতখানি বড় নৌকা আসলে বেবাইজার (বেবাজিয়া) বহর। তারা বছর ভর জলপথে ঘোরে। এইবার তারা (বেবাজিয়া = বেদে) এসেছে রাজদিয়া। এই বেদের দলকে দেখে বিনু চমৎকৃত হ'ল। মেয়েগুলির পরনে চিত্রবিচিত্র ঘাঘরা, খাটো জামা। রুক্ষ চুলে কাঠের কাঁকুই। টানা চোখে ছুরির ধার, হাতে পায়ে মেহেদি মাখা। পুরুষগুলির পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি বা কুঁচি-দেওয়া ঢোলা পাজামা। মাথায় ধনেশ পাখির পালক গোঁজা। সারা গায়ে উল্কি। মেয়ে পুরুষ—সকলেরই উদ্ধত যৌবন, চিটচিটে পোশাক থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসে। হাতে পায়ে বড় বড় নখ, অপরিষ্কৃত দন্ত পংক্তি। বিনু অবাক হয়ে এই বেদে-বেদেনীদের দেখছিল। যুগলের সঙ্গে তাদের চেনাশোনা আছে বোঝা গেল। বুড়ি আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীর ডাকে যুগলের সঙ্গে বিনু উঠে গেল বেদেদের বহরে। শুনেছিল জলের দেশে বেবাজিয়ারা নৌকায় নৌকায় ভেসে বেড়ায়, নৌকাতেই তাদের ঘরসংসার—পাঁচ-সাতটা হাজারমণি নৌকাই তাদের বাসস্থান। নৌকায় মনসাদেবীর অধিষ্ঠান, তার পিছনে কালীয় নাগ। সামনে ধুনুচি। আঞ্জুমান জানাল, এইটাই আমাগো আসল জাগা। বিনু যতই দেখে, ততই অবাক হয়। ('কেয়াপাতার নৌকা', ২য় পর্ব, পৃ. ২৩৯-২৪৩)।

বিকেলে এই বেদের দল হেমনাথের বাড়ি এলো। তারা নাচে, গান গায়, সাপ খেলা দেখায়, আবার বিনুর মা রুগ্না সুরমার জন্যে শিকড় দেয়। তাদের নাচগানে সবাই মোহিত হয়ে যায়। কলকাতা-আগত বিনুদের সামনে এক অজানা রঙিন জগতের দুয়ার খুলে যায়। বিনুর মনে হয় জল-বাংলার বিচিত্র রূপ তার চোখের সামনে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। ওদিকে কলকাতা থেকে ফিরেই অবনীমোহন ধানচাষে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কলকাতা-আগত অবনীমোহনের কাছেই সবাই দিন বদলের, দুঃসংবাদের, বিপদের সংবাদ পায়। ইউরোপের যুদ্ধ বাংলাদেশে ছুটে আসছে। কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের মহড়া হয়ে গেছে। কলকাতার বেশকিছু সংবাদপত্র নিয়ে এসেছিল অবনীমোহন। হেমনাথ তা পড়েন। ইউরোপে অক্ষশক্তি আর মিত্রশক্তির যুদ্ধ শুরু হয়েছে (নভেম্বর ১৯৪০)। একদিকে ইতালি জার্মানি, অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স। হিটলার, মুসোলিনি, চেম্বারলেন,

চার্চিল, রাশিয়া-জার্মানির মিত্রতা, হিটলারের সঙ্গে মলোটভের সাক্ষাৎকার। কতো সব নতুন স্থানের নাম—টিরানা, আড্রিয়াটিক সাগর, এজিয়ান সাগর, দারএসসেলেন, ডানিয়ুব, ইন্দোচিন। কতো নতুন সামরিক নেতাদের নাম—কালিনিন, রিবেনট্রপ, ডি ভ্যালেইরা, টিমোশেঙ্কো, গোয়েবল্‌স্‌, নেনু।

খুব দ্রুত দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে বদলে যাচ্ছে কলকাতা, বদলে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশ, বার্মা। এদেশে খুবই দুর্দিন আসছে—হেমনাথের কথায় সম্মতি দিলেন অবনীমোহন।

মনে হল কয়েক ঘণ্টায় এইসব সংবাদপত্রের সংবাদ দূরবর্তী পুববাংলাকে—রাজদিয়াকেও বদলে দিতে চলেছে।

এই পালাবদলের কাল যে কী সর্বনাশ ডেকে আনছে, তা কেউ জানে না। তবে দেশব্যাপী সংকট আসন্ন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হেমনাথের বাড়িতে আসে পিওন নিবারণ ভুঁইমালী। গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করে বেড়ায়। সে সুনীতির জন্য নিয়ে আসে একটা চিঠি—ফ্রম আনন্দ ঘোষ। কলকাতার চিঠি। এমন চিঠি তো ঢাকা থেকেও আসতে পারে সুধার জন্যে—ফ্রম হিরণকুমার মিত্র। বিনুর অবাক লাগে—বিশখানা গ্রামে চিঠি বিলি করে বেড়ায় নিবারণ পিওন। এর মধ্যে পাঁচখানা গ্রামে পাঁচটা বাড়িতে যেতে হয়। বিনু শোনে আর বিস্মিত হয়।

বস্তুত কলকাতা থেকে অবনীমোহন-আনীত সংবাদপত্রগুলি শান্ত রাজদিয়াকে পূর্ববাংলাকে বদলে দিল। বস্তুত শান্ত মন্থরগতি গ্রামজীবন দ্রুতবেগে প্রবাহিত হতে লাগল। যুদ্ধ বার্মায় পৌঁছে যেতে পূর্বভারত দ্রুত বদলে যেতে লাগল। মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ব্রিটিশের পোড়া মাটি নীতি, তাবৎ নৌকা জবরদখল, সর্বোপরি রাজদিয়ার কাছেই সামরিক ছাউনি, আর সুজানগঞ্জের হাটে সরকারি সাহায্যে প্রজাদের প্রতি যুদ্ধের যাবতীয় সাহায্য সমর্থনের আবেদন ঘোষণা, সবরকম খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি: এইসব দূরপ্রসারী ঘটনা বদলে দিতে লাগল শান্ত রাজদিয়াকে। ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২) মুসলিম লিগের বিভেদকামী প্রয়াসকে নষ্ট করতে পারল না।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে আমরা পাই গ্রামগঞ্জে হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক প্রীতি ও আস্থা, এখন দেখতে হল পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস।

অঘ্রানে অবনীমোহনের ধানজমি কেনা রাজদিয়া রেজিস্ট্রি আপিসেই রেজেস্ট্রি হয়ে গেল (কেয়াপাতার নৌকা; ২য় পর্ব, পৃ ২০৮)। সেখানেই এক বিচিত্র মানুষের দেখা পেলেন অবনীমোহন—তালেব। সে মামলার কাজ করে না, কোনো কাজই করে না, গ্রামে গ্রামে ঘোরে, ধানকাটার পর জমিতে যে দুচার দানা ধান পড়ে থাকে, তা-ই সংগ্রহ করে, তাতেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি।

ঢাকার অধ্যাপক ভবতোষের মাতৃ-বিচ্ছিন্ন ঝিনুক এসেছিল হেমনাথের বাড়ি। ভবতোষের স্ত্রী আর ফিরল না। সুতরাং ঝিনুক হেমনাথদের বাড়িতেই থেকে গেল। ঝুমার সঙ্গে বিনু খেলা করলে ঝিনুক আক্রোশে-বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে যায়। নির্বাক বিষণ্ণ প্রতিমার মতো এই সুদুর অচেনা মেয়ে ঝিনুক বিনুকে নিরন্তর আকর্ষণ করে। মাতৃ-বিচ্ছিন্ন

ঝিনুককে বিনু কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে না।

এদিকে হেমনাথের বাড়িতে পরপর তিনটি বিবাহ হয়ে গেল। যুগল কামলা বিয়ে করতে গেল, পাখিকে বিয়ে করে কিন্তু আর ফিরে এলো না। শ্বশুর তাকে আর ফিরত পাঠাল না।

অঘ্রানের শেষে ধলেশ্বরী নদীর চর আর সুদূর ভাটির দেশ থেকে আসে ভূমিহীন গরীব কৃষাণ—দলে দলে আসে—রাজদিয়ার ঘরে ঘরে হানা দেয়। এরা এসেছে ধান কাটতে। হেমনাথ পাঁচশ কিষান রেখেছেন। উদয়াস্ত খাটবে, ধান কাটবে, ধান ঝেড়ে শুকিয়ে গেলে তুলতে দুমাস, ফিরে যাবে ফাল্গুনে। যতদিন ধান কাটা চলবে ততদিন খোরাকি পাবে। দুমাস পর দেশে ফেরার সময় প্রত্যেকে পাবে তিন মন করে ধান, দুখানা করে নতুন লুঙ্গি আর গামছা। (তদেব পৃ ২৬৫)।

এ সংবাদ হেমনাথের কাছে শুনে অবনীমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পূর্ব বাংলার দিগদিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ ছড়ানো । অথচ বেশির ভাগ মানুষ ভূমিহীন। ধানকাটা ছাড়া অন্য ঋতুতে ধান পাট বুনে ও জমিতে খেটে ওদের চলে। দু চারটে মাস বাদ দিলে দুর্ভিক্ষ ওদের নিত্য সঙ্গী। (তদেব পৃ ২৬৪)

শুনে অবনীমোহন বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই ভূমিহীন গরীব কিষানের কাজে নিত্যসঙ্গী বিনু। সে দেখে এরা কীভাবে সারাদিন কতোটা পরিশ্রম করে। জীবনের আর এক নতুন রূপ, ভয়ংকর রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় বিনু। তারা ধান কাটে আর তালমাত্রাহীন গান করে, কেচ্ছা বলে ও শোনে।

ওদিকে পাদ্রি লারমোর সাহেবের চারপাশের গ্রামে গঞ্জে হাটে বিনা পয়সায় চিকিৎসা আর ওষুধ দেওয়া দেখেও বিনু অবাক হয়ে যায়।

জীবন চলে আপন নিয়মে। বিনু রাজদিয়া হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেল। সুধা সুনীতি কলেজে, ঝিনুক মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হলো।

পাদ্রি লারমোর সায়েবের গির্জায় বড়দিন উৎসব পালনে সবাই গেল। পাদ্রি খুব খুশি হলেন। যুগলের বিয়ে হয়ে গেল। পাখিকে যুগল বিয়ে করে নিয়ে এলো। অষ্টমঙ্গলায় যুগল শ্বশুরবাড়ি গেল। কিন্তু আর ফিরল না। শ্বশুরের পরিবারের অনেক দায়িত্ব নিয়ে থেকে গেল।

গ্রামে গঞ্জে শোনা গেল বাংলা পার্টিশন হবে। (তদেব পৃ ৩০৩)

সুজনগঞ্জের হাটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. এসে যুদ্ধের নামে প্রচার শুরু করলেন (পৃ ৩০৭) —এস. ডি. ও. হাটের মানুষদের কাছে আবেদন করলেন, দলে দলে যুদ্ধে নাম লেখাও।

এদিকে জমিজমা নিয়ে মেতে উঠলেন অবনীমোহন। (তদেব পৃ ৩১৩)

স্কুলে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষার সময় শোনা গেল, জাপানিরা বর্মায় বোমা ফেলেছে। (তদেব পৃ ৩১৮-৩২৩), বর্মা থেকে দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে পাহাড় জঙ্গল চলে আসবে। এদিকে দুর্দিন চলে এলো পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে।

সুজনগঞ্জের খোলাবাজার থেকে চিনি কাপড় কেরোসিন উধাও। (তদেব পৃ ৩৩১)।

রাজদিয়ার জীবনে নতুন ঘটনা—মিলিটারি ব্যারাক তৈরি হল। রেঙ্গুনের পতন হল। কলকাতা থেকে লোক পালাতে শুরু করল। রাজদিয়াতেও অনেকে এলো। অবনীমোহন, হেমকত্তা সংবাদপত্র পড়েন আর উদ্বেগে দিন কাটান। (তদেব পৃ ৩৩০-৩৩৯)।

ঢাকায় মুসলিম লিগের সভা হল—মুসলমানগো লেইগা একখান দ্যাশ চাই। তার নাম পাকিস্তান। রজবালির কাছে একথা রাজদিয়া শুনল। আর রাজদিয়ায় রেশন কার্ডে কাপড় চিনি কেরোসিন পাওয়া গেল। ক'দিন পরে সব উধাও। সারা রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য উধাও। লুঠপাটের খবর আসে। ধানচালের দর বাড়ে দেখে অনেকেই চড়া দামে বিক্রি করে ফেলেছে। এখন কোথাও আর চাল নেই। অন্যদিকে হাটে এস. ডি. ও সাহেবের সামনে দলে দলে লোক যুদ্ধে নাম লিখাতে আসে। (তদেব পৃ ৩৫০)। কলকাতা থেকে এসে গেল আনন্দ আর ঝুমা। (তদেব পৃ ৩৬৩)। ঝুমা থাকায় ঝিনুকের রাগ বাড়ল—ঝুমা আর বিনু, দুজনকেই তার দৃষ্টিতে বিদ্ধ করতে লাগল।

ঢাকায় গোলমাল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে গেছে। ভবতোষ হেমনাথের কথা না শুনে ঝিনুককে নিয়ে তার কর্মস্থল ঢাকায় চলে গেল। তিন-চার দিনের মধ্যেই সে ঝিনুককে নিয়ে ফিরবে। ষোল-সতের দিন হয়ে গেল, ফিরল না। ন'টা বছর (১৯৪০-৪৯) বিনু ঝিনুকের সঙ্গে কাটিয়েছে। আজ ঝিনুক কোথায়? হেমনাথ ভবতোষ-ঝিনুকের খোঁজে ঢাকা গেলেন। দিন তিনেক পরে ঝিনুককে নিয়ে ফিরলেন।

কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু। চোখের দৃষ্টি স্থির, উদ্‌ভ্রান্ত। গালে ঠোঁটে হাতে সমস্ত শরীরে কত জায়গায় যে মাংস উঠে উঠে রক্তারক্তি হয়ে আছে। পরনে জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোনও রাক্ষস যেন তার শরীরের সার শুষে নিয়েছে। (তদেব, পৃ ৪১২)

"ঢাকায় ঘাতকের দল ভবতোষকে মেরে ফেলেছে। ঝিনুককে নিয়ে চলে গেছিল। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিশ দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেছেন।" (তদেব পৃ ৪১২)

ঝিনুক ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। "আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে। আমি এখানে থাকব না দিদা, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দাও।" দিন দুই পর বিশ্বাসী রাজেক মাঝির নৌকায় ঝিনুক আর বিনুকে তুলে দিলেন হেমনাথ। "আজ রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে বিনুকে চলে যেতে হচ্ছে। নিরানন্দ, নিরুৎসুক এই বিদায় বিনুর বুক অসীম বিপদে ভরে দিতে লাগল। ...কত কথাই মনে পড়তে লাগল। এরাই যে তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছে। হায়, কৌশোরের এই রম্যভূমি। যৌবনের এই স্বর্গে আর কোনও দিন ফেরা হবে কিনা কে জানে।" (তদেব পৃ ৪১৪)।

চার

'কেয়াপাতার নৌকা' (৩য় পর্ব) পাঠককে পৌঁছে দেয় কলকাতায়। রাজদিয়া থেকে কলকাতার যাত্রাপথে শত বিঘ্ন বিপদ। কলকাতায় পৌঁছেই পাঠক অনুভব করে রাজদিয়ার সুখলোক স্বপ্নলোক থেকে এসে পড়েছে কঠোর বাস্তবলোকে যেখানে নেই কোনো মুগ্ধতা।

উপন্যাসের ২য় পর্বের শেষ লাইনগুলিতে তারই ইঙ্গিত। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে ধর্ষিতা ঝিনুককে নিয়ে বিনু কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

"জল বাংলার মনোহর দৃশ্য পশুপাখি, বৃক্ষ লতা খুব বেশিক্ষণ বিনুকে বিভোর করে রাখতে পারল না। এবার তার চোখে এসে পড়ল খুব সামনে, একেবারে কোলের কাছে ঝিনুকের ওপর। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে অপার স্নেহে, অসীম করুণায় তার বুক ভরে যেতে লাগল। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল, তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিমবাংলার মানুষ, মা পূর্ববাংলার মেয়ে। তার বুকের এক ধারে পূর্ববাংলা, আরেক ধারে পশ্চিম বাংলা। তার রক্তের এক স্রোত পদ্মা। আরেক স্রোত গঙ্গা। আর কোলের কাছে এই মেয়েটা—এই ঝিনুক? সে তো পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত, অপমানিত আত্মা। তাকে নিয়েই সে কলকাতা চলেছে।" (কেয়াপাতার নৌকা, ২য় পর্ব, পৃ ৪১৪)

শুরু হল ৩য় পর্ব। হেমনাথের বিশ্বস্ত রাজেক মাঝি তাদের দুজনকে নিয়ে রাতের আঁধারে যাত্রা শুরু করল। নৌকা অকূলে ভাসল। সামনের দিকে গলুইতে বৈঠা হাতে রাজেক। পেছনের গলুইতে তার চাচাতো ভাই তমিজ, হাতে বৈঠা।

সামনে, কোন বিপদ অপেক্ষা করছে তা বিনু জানে না। কেবল জানে, জলে স্থলে মারাত্মক বিপদ ওত পেতে রয়েছে। জানে না তারপাশার পথে কী ঘটবে? দুইয়ের ভেতর অল্প মালপত্র আর খাবার নিয়ে বিনু আর ঝিনুক। দুপাশে ছইয়ের ধাপ ফেলা। একটুখানি খোলা। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পর এখন কৃষ্ণপক্ষ। হেমন্তের শুরুতে নদী অনেক শান্ত। রাজেক কি তাদের দুজনকে তারপাশা স্টিমারঘাটে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিতে পারবে? শত প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাকে ঝিনুক। একটা ধ্বংসস্তূপের মতো গুটিগুটি শুয়ে আছে।

যুদ্ধের সময় বিনুর বাবা ঠিকাদারির কাজ নিয়ে অসম চলে যান। মিলিটারি ব্যারাক তৈরি আর রাস্তা তৈরি করতেন। যুদ্ধ থামলে কলকাতায় চলে গেলেন। সুরমা মারা গেলেন। সুধা সুনীতির বিয়ে হয়ে গেছে, তারা কলকাতায় চলে গেছে। হেমনাথ আর স্নেহলতা রাজদিয়া ছাড়লেন না। এখন বিনু ঝিনুককে নিয়ে চলেছে কলকাতা। ঝিনুকের এই ভয়ংকর পরিণতি ঘটবে, একথা হেমনাথ স্নেহলতা বিনু ভাবে নি। হঠাৎই কুয়াশাভরা মাঝনদীতে দেখা গেল দুটো ছইহীন লম্বা খোলা নৌকায় আলো জ্বলছে, হই-হল্লা হচ্ছে। নৌকাদুটি এদিকেই ধেয়ে আসছে। রাজেক তমিজ তাদের নৌকা পাড়ে ভিড়িয়ে বিনু ঝিনুককে নিয়ে তীরে ওঠে বেতের ঝোপের আড়ালে লুকোল। হানাদারেরা তাদের খুঁজে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নৌকাটা নিয়ে চলে গেল নদীতে। নৌকা খোয়া যাওয়ায় উন্মাদ হয়ে গেছে রাজেক। বাকি রাতটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল। সকাল হল। নৌকায় তাদের যথাসর্বস্ব ছিল, খাবার ছিল, সবই গেল। সকালের আলোয় দেখা গেল এক মধ্যবয়সী

লোককে। দামি লুঙ্গি, গোলাপি পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্প শু মাথায় টুপি। বোঝা গেল ধনী সম্ভ্রান্ত লোক। তিনিই বিনুদের উদ্ধার করলেন। তাদেরকে তিনি গভীর বনে লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর বাড়ি থেকে জল খাবার দিলেন। বিনুকে একটা লুঙ্গি দিলেন, ঝিনুককে একটা বোরখা। এই জায়গাটার নাম মামুদপুর, তাঁর নাম আফজল হোসেন। একটা হিন্দু-পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে এলেন। তারই বন্ধু ধনার বাড়ি। ধনারাও চলে গেছে। সেই খালি বাড়ির দুটি ঘরে বিনুরা রইল। জানা গেল আফজল হোসেন বড় মিঞা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁরই সাহায্যে ও দয়ায় বিনুদের স্নান, পান, খাওয়া হল—ভাত তরকারি মাছ খেতে পেল। সন্ধের সময় আফজল হোসেনের বুদ্ধিতে বিনুরা ধনা বারুইর পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে নদীতীরে এসে আফজল হোসেনের ব্যবস্থা মতো এক নৌকায় চড়ে নদীপথে তারপাশা যাত্রা করল। আফজল হোসেন নৌকার গলুইয়ে বসে রইলেন। তাদের নির্বিঘ্নে তারপাশা স্টিমার ঘাটে নিয়ে গেলেন। ভোরে নয়, একটু বেলায় বিনুরা সব বিপদ কাটিয়ে তারপাশা পৌছল। বিনু দেখল, গ্রামের দিক থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। এতদিনের বসত তুলে হিন্দুস্তানে পালাচ্ছে।

স্টিমারঘাটায় দেখা হয়ে গেল সুজনগঞ্জের হাটে দেখা সেই ঢেঁড়াদেনেওয়ালা হরিন্দরের সঙ্গে। তার কাছেই বিনু জানতে পারল কতো হিন্দু বউ মেয়ে হারিয়ে চিরকালের মতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যাচ্ছে। পরোপকারী প্রৌঢ় নাসের আলির সঙ্গে আলাপ হল। তিনি একদল ত্রস্ত হিন্দুদের নিয়ে এসেছেন। সারা দিন প্রতীক্ষার পর স্টিমার এলো। এতো ভিড়, বিলুরা উঠতে পারল না। পরদিন সকালে এলো দ্বিতীয় স্টিমার। নাসের আলির সাহায্যে বিনু ঝিনুককে নিয়ে উঠতে পারল। শেষ পর্যন্ত রাত কাটিয়ে স্টিমার গোয়ালন্দে এলো। সেখানে অনেক হাঙ্গামার পর বিনুরা ট্রেনে উঠতে পারল। দর্শনা স্টেশনে যাত্রীদেরকে পাকিস্তানের বর্ডার পুলিশ আর কাস্টমস-এর কর্মচারীরা নামিয়ে দিল—সার্চ হল অর্থাৎ যার কাছে যা আছে সব কেড়ে কুড়ে নিল। এক বাঙালি তরুণ মুসলমান অফিসারের দয়ায় তারা অব্যাহতি পেল। পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি অফিসারের অত্যাচারের কোনো শেষ নেই। অবশেষে ট্রেন বেনাপোলে এলো। হাজার হাজার শরণার্থী হিন্দু এক অনির্দেশ আশায় ভর করে ট্রেন থেকে নেমে এলো। যাদের কলকাতায় কোনো আশ্রয় নেই তাদের ভারত সরকারের কর্মীরা বর্ডার স্লিপ দিচ্ছে রিলিফ ক্যাম্পে থাকবার জন্য। সন্ধেবেলায় ট্রেন পৌছল শিয়ালদহ স্টেশনে। অবশেষে মুক্তি আতঙ্ক থেকে। 'কেয়াপাতার নৌকা' ৩য় পর্বের প্রথম আশি পৃষ্ঠা (পৃ ৪১৭-৪৯৭) ব্যাপী বিপদসঙ্কুল যাত্রার এই বিবরণ আদৌ অপ্রাসঙ্গিক বিস্তার নয়। কতো মানুষ একেবারেই দিশাহীন, রিলিফ ক্যাম্পে থাকবে, তারপর কোথায় যাবে—এই প্রশ্নের উত্তর সেদিনকার ভারতবর্ষের নেতারা দিতে পারেন নি।

উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের বাকি একশ পঁচিশ পৃষ্ঠা (পৃ ৪৯৮-পৃ ৬২৩) বিনু আর ঝিনুকের কলকাতায় আশ্রয় সন্ধান—আশ্রায় পাওয়া, তা হারানো, আবার নতুন আশ্রয় সন্ধানের মর্মন্তুদ কাহিনি। আজ ন' বছর (১৯৪০-১৯৪৯) পরে বিনু কলকাতা ফিরে এলো। বিনুদের বাড়ি ভবানীপুরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। স্মরণ করতে করতে ঘোড়াগাড়িতে

বিনুরা এলো সেখানে। দেখল বাড়ি তালা বন্ধ। তখন সেই ঘোড়াগাড়িতেই বিনু বিডন স্ট্রিটে সুনীতিদের বাড়ি পৌঁছল রাত এগারোটায়। সুনীতির শ্বশুরবাড়ি। সুনীতি, আনন্দ আর আনন্দর মা ভাইদের সঙ্গে দেখা হল। আনন্দর মা হেমনলিনী বিনুর প্রণাম নিলেন, ঝিনুকের প্রণাম নিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন ঝিনুক শোবে একতলার পূবদিকের ঘরে। আর বিনু শোবে দোতালায় দক্ষিণদিকের ঘরে। অর্থাৎ ঝিনুকের লাঞ্ছনার সংবাদ তারা পেয়ে গেছেন। তাই ধর্ষিতা ঝিনুকের ঠাঁই হবে একতলায়। তিনি সোজাসুজি ঝিনুককে বললেন, "তুমি ধর্ষিতা। এ সংবাদ আমরা জানি। শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল। তোমার কোনও অপরাধ নেই। তুমি নির্দোষ। কিন্তু আমি পুরনো দিনের মানুষ। নানা সংস্কারে আটকে আছি। এই বয়সে সেইসব সংস্কার কাটানো সম্ভব নয়। যে ক'দিন আছ, একতলাতেই থাকবে। দোতলায় আমাদের ঠাকুরঘর। তুমি ওপরে না উঠলেই ভাল হয়।" (কেয়াপাতার নৌকা, ২য় পর্ব, পৃ ৫০৩)।

একথা শুনে "হতচকিত বিনু গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু কেউ যেন লোহার আঙুল দিয়ে তার কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। ....বিনুর মাথার ভেতর হঠাৎ অবিরাম একটা আগুনের চাকা ঘুরে যেতে লাগল। কেন হেমনলিনী ঝিনুককে পা ছুঁতে দেননি, কেন তার নিচের ঘরে থাকার ব্যবস্থা, এবার স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে নিদারুণ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কী আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সঙ্গে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সীমান্তের এপারে এসেছে, শুধু সে-ই জানে। ভেবেছিল, সব উৎকণ্ঠা ত্রাসের অবসান ঘটে গেছে। ভেবেছিল, এখানে এলেই অফুরান সহানুভূতিতে ঝিনুককে সবাই কাছে টেনে নেবে, ভুলিয়ে দেবে তার জীবনের চরম দুর্ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিজনের কাছ থেকে মর্মান্তিক আঘাতটা এলো। হয়তো অবনীমোহনও ঝিনুককে গ্রহণ করবেন না, সুধারাও মুখ ফিরিয়ে নেবে। অন্য আত্মীয়স্বজনেরাও ধারেকাছে ঘেঁষবে না। কিন্তু কে কী করল, কে কী করবে, তা নিয়ে ভাববে না বিনু। শক্ত হাতে ঝিনুককে আগলে রাখবে। আজ থেকেই তার অন্য এক মহাযুদ্ধর প্রস্তুতি।

কখন হেমনলিনী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেনি বিনু। সে দেখল, ডান পাশের বড় সোফায় নতমুখে বসে আছে সুনীতি আর আনন্দ। ছাইবর্ণ মুখ। বিনুর চোখ বাঁ দিকে ঘুরে গেল। সেখানে প্রিয় নারীটি অঝোরে কেঁদে চলেছে।

"ঝিনুককে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল হয়ে যায়। বড় মায়ায় বিনু তার কাঁধে একটা হাত রাখে।" (তদেব, পৃ ৫০৪)

অনেকক্ষণ কান্নার পর চুপ করে গিয়েছিল ঝিনুক। বসে আছে নতচোখে। অসাড় এবং নিষ্পন্দ। রক্তিম দুই চোখ টসটস করছে। শুধু গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে যাচ্ছে অবিরত। সুনীতি বিনু আর আনন্দ —সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল।

বিনু তখনই অনুধাবন করল সুনীতি-আনন্দর আশ্রয় তাকে যত শীঘ্র সম্ভব ছেড়ে যেতে হবে। সুনীতিও গোপনে তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছে। জানিয়েছে তার শাশুড়ি চায় না এ বাড়িতে ঝিনুক থাকুক।

পরদিনই টালিগঞ্জে বিনু এলো, সুধা-হিরণদের বাড়িতে। দেখা হল ভাই-বোনে। সুধা

আর বিনু। "নিরবধি কালের মাঝখানের ক'টি বছর কী আর এমন! নেহাতই বিন্দুবৎ। তবু মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সীমান্তের এপারে চলে আসা—সব মিলিয়ে মনে হয় হাজার আলোকবর্ষ পার হয়ে গেছে।" (তদেব, পৃ ৫১২)

হেমদাদু, দুই দিদা রাজদিয়াতেই আছেন। তাঁরা আসবেন না। বিনু ঝিনুকের নাম করতেই সুধা হিরণ চমকে ওঠে। তারা জেনেছে ঝিনুক ধর্ষিতা। বিনু আর ঝিনুকের রাজদিয়া থেকে শিয়ালদা স্টেশন—বিপজ্জনক যাত্রার বিবরণ শুনে সুধা হিরণ স্তম্ভিত। বিলু জানায়, সুনীতিদির শ্বশুরবাড়িতে তারা কি বিরূপ অভ্যর্থনা পেয়েছে। বিনু ঝিনুককে এখনই হিরণ-সুধার বাড়ি নিয়ে আসতে চায়। তারা রাজি হয়। বিনুর আশংকা দূর হল, কিন্তু একটি দূরবর্তী সংশয় তার মনে বিঁধে রইল—হিরণের ঠাকুরদা আর জেঠিমা পাটনায় গেছেন। তাঁরা ফিরে এলে কী হবে? এ প্রশ্নের জবাব হিরণের জানা নেই। হিরণের বাড়ি থেকে বেরোবার পূর্বেই হঠাৎ এসে পড়ল যুগল। সেই যুগল, যে শ্বশুরবাড়িতেই বাস করছিল, তারপর চলে এসেছে শরণার্থী হয়ে কলকাতায়। সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তার কাছেই বিনু জানল যুগলরা আগরপাড়ায় স্টেশনের দু মাইল দূরে এক জঙ্গল-জলা জায়গা পরিষ্কার করে মুকুন্দপুর শরণার্থী নিবাস গড়ে তুলেছে। ওই জমি আর আশ্রয়-নিবাস রক্ষা করার জন্য তারা নিত্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। (তদেব পৃ ২২৪)। আনন্দ-সুনীতিদের বাড়ি এসে বিনু ঝিনুককে নিয়ে সুধা-হিরণদের বাড়ি চলে এলো।

কিন্তু একটা চিন্তা বিনুকে খোঁচা দিতে থাকে। আনন্দ-সুনীতিদের বাড়িতে কতদিন ঝিনুককে রাখতে পারবে?

আজ সব বিপদ-শংকার উপরে উঠে এসেছে—ঝিনুকের কী হবে? তাকে সে স্বস্তিতে কোথায় রাখতে পারবে? সুনীতিদের বাড়িতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ঝুমার সঙ্গে।

সুধার সস্নেহ ব্যবহারে ঝিনুক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগল। রাজদিয়ার অসংখ্য স্মৃতিকথা-আলাপনে সুধা-ঝিনুক-বিনু-হিরণ মেতে উঠল। সুধার আন্তরিকতা, মায়া, ভালবাসার উত্তাপ ঝিনুককে সঞ্জীবিত করে তুলল। (তদেব পৃ ৫০৮)। ঝিনুকের কান্না আর বেদনা মুছে দিল সুধা। মূক দুঃখী কান্নাভেদী ঝিনুক আবার হাসিখুশি হয়ে উঠল। রেললাইনের ধারে চিলড্রেন্স পার্ক। তার পাশেই বিশাল জলরাশি। ঝিনুক অবাক হয়ে দেখে। লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই সারা কলকাতায় জলসার ধুম পড়ে যায়। জলসায় গিয়ে এতো গায়ক এতো শ্রোতা—ঝিনুক দেখে, শোনে, মুগ্ধ হয়ে যায়। সিনেমাও দেখল—'দেবী চৌধুরানী' আর 'কবি'।

যুগলের আমন্ত্রণে বিনু একদিন মুকুন্দপুরে গিয়ে তাদের নতুন বসত দেখে এলো। সেই বসত রক্ষার জন্য তাদের লড়াই করতে হয়, আততায়ীদের ঠেকাতে হয়, তাও বিনু জানল। বিনুর কাছেই ঝিনুক জানে, মুকুন্দপুরে গেলে সে স্বস্তিতে বাস করতে পারবে। তার মতোই ধর্ষিতা মেয়ে সেখানে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে, কেউ ঘেন্না করে না, থুতু ছিটায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

প্রায় এক মাস মাদে হিরণ সংবাদ আনে। তার শ্বশুর অবনীমোহন উত্তরকাশী, আলমোড়া, হরিদ্বার ঘুরে কলকাতায় ভবানীপুরের বাড়িতে সদ্য ফিরে এসেছেন। বিনু স্থির

করল ঝিনুককে নিয়ে অবনীমোহনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। বাইশ দিন পূর্বে শিয়ালদা স্টেশন থেকে এ বাড়িতে এসে তালাবন্ধ দেখে গেছে। আজ দরজা অর্গলবদ্ধ নয়। অবনীমোহনকে দেখে বিনু অবাক হয়ে গেল। পরনে লুঙ্গির মতো থান, গেরুয়া পাঞ্জাবি, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখে মুখে শান্ত সমাহিত ভাব। পূর্বেকার অবনীমোহন অনেক বদলে গেছেন। আসাম থেকে ফিরে কলকাতায় নতুন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল করায় তাঁর সব টাকা গেছে। আশাহীন বিপর্যস্ত অবনীমোহনের সামনে তখন আর কোনো পথ খোলা নেই। 'শেষ পর্যন্ত যোশীমঠে গিয়ে আমার গুরুর দর্শন পেয়েছি'। (পাশেই তাঁর বড় ফোটো বাঁধানো রয়েছে)।

বিনু অবাক হয়ে দেখে আর শোনে। অবনীমোহন দেনার দায়ে ডুবে আছেন। এই বাড়ি বিক্রি করে দেনা মেটাবেন। যে টাকা বাঁচবে তার অর্ধেকটা বিনুকে দিয়ে তিনি যোশীমঠে গুরুদেবের কাছে চলে যাবেন। তারপর বলেন, 'তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। ঝিনুক পাশের ঘরে যাও।'

অবনীমোহন সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'ঝিনুককে—ধর্ষিতা মেয়েটাকে যে পাকিস্তান থেকে আনলে, ওকে নিয়ে কী করবে ভেবেছ?' প্রশ্ন শুনে বিনুর বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায়। অবনীমোহন বলেন—'তুমি যদি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ঝিনুককে রাখতে চাও, হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে জানতে চাইবে মেয়েটা কে? তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? তার কী জবাব দেবে তখন? একটা পথ খোলা আছে—যদি তুমি ওকে বিয়ে করো। কিন্তু আত্মীয়রা তোমায় ত্যাগ করবে। এরকম একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাহস তোমার আছে?' (তদেব, পৃ. ৬২২)

বিনুর কাছে কোনো জবাব নেই। তার মনে হ'ল চারপাশের সমস্ত পৃথিবী ধসে পড়ছে। কী সংকটের মধ্য দিয়ে সে ঝিনুককে নিয়ে এসেছে। কিন্তু অবনীমোহন আজ তাকে জীবনের সবচেয়ে দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। শ্বাসরুদ্ধ বিনু কী জবাব দেবে?

অবনীমোহন বললেন, 'ঝিনুককে কোনো 'হোমে' রাখতে পার। ঝিনুককে বুঝিয়ে বলো।' ঝিনুক পাশের ঘরে গিয়েছিল, কিন্তু দরজার আড়াল থেকে সব কথাই শুনেছে। বিনু সারা বাড়িতে খুঁজল। "ঝিনুক কোথাও নেই। সদর দরজা হাট করে খোলা। বাইরে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঝিনুককে ডাকতে ডাকতে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে লাগল। ..... নেই, নেই, নেই। যেদিকে যতদূর দেখা যায়, অবিরল গাড়ির স্রোত। ভিড়, ভিড় আর ভিড়। তার মধ্যে চিরদুঃখী মেয়েটাকে কোথাও দেখা গেল না। .... কুহেলিবিহীন আকাশের নিচে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিনু।" (তদেব পৃ. ৬২৩)। এখানেই 'কেয়াপাতার নৌকা'র সমাপ্তি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রিলজি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৪) 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ট্রিলজি (করুণা প্রকাশনী) বাংলা উপন্যাসে সর্ববৃহৎ ট্রিলজি। এযুগে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে উপন্যাস। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ট্রিলজিকে এই অর্থে বলা যায় মহাকাব্য। এর কালব্যাপ্তি, বিষয়ব্যাপ্তি ও জীবনবোধ এক অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ১ম পর্ব, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সূচনাকাল আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে, শেষ বঙ্গবিভাজনের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সোনাদের যাত্রা, ঢাকায় পালাবদল, একুশে ফেব্রুয়ারির মহৎ আন্দোলন ও বাংলাদেশের জন্মকাল পেরিয়ে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' দু খণ্ডে বিভাজিত। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১, ৭ম সংস্করণ মার্চ ১৯৯৭, ১ম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯১, ৭ম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫। দ্বিতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান'-এর প্রকাশ ১৭ মে ১৯৭৭। ১ম পর্বের কিশোর সোনা এখন পরিণত যুবক। হেঁটে চলেছে কলকাতার রাজপথে—উদ্দিষ্ট শিপিং অফিস, সেখানে রিক্রুট হয় জাহাজী। শেষ হয়েছে হিগিন্‌সের কথায়—জাহাজ ছেড়ে বোটে উঠে দ্বীপে চলে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে ছোটবাবুর বনির সঙ্গে অজানা ভূমিতে নেমে যাওয়া। জাহাজে থেকে গেলেন ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিন্‌স আর সারেঙ—তখন সিউল-ব্যাংক জাহাজ অজানা সমুদ্র ভেসে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন হিগিন্‌সের সহায়ক ছোটবাবু সোনার মনে হল জাহাজ যেন এক অলৌকিক জলযান। এই উপন্যাসটির ('অলীক জলযান') ১ম প্রকাশ মাঘ ১৩৮৪, ১ম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১, ৩য় অখণ্ড সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৩। ৩য় পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান'—কলকাতার কুমারদহ রাজবাটীতে এসে পৌঁছল নবীন সৌম্যকান্তি যুবক অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক ওরফে সোনা। দেখা করতে এসেছে কুমার বাহাদুর রাজেনবাবুর সঙ্গে। সময়টা ১৯৬৪ সাল। এই রাজবাটীতে তার নতুন চাকরির সূচনা হল সেই মুহূর্তে। এখন আর কেউ তাকে 'সোনা' বলে জানে না। অতীশ বলেই জানে। উপন্যাসের সমাপ্তি একটি মৃত্যুর পর শবসৎকারের বিবরণে—নীলুর সৎকারের পূর্ব মুহূর্তে অতীশের (সোনা) মনে হল তার প্রথম যৌবনে দেখা বনির কথা, সেই বনি যেন আজ উপস্থিত অতীশকে বলছে—'প্রেইজ গড ফর এভার'। বনির সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে অতীশ শুনছে সৎকারকালীন মন্ত্রোচ্চারণ—'সেই পরব্রহ্মকে আমরা চিন্তা করি। তিনিই জগতের কারণ স্বরূপ, জলস্বরা।' এভাবেই গড্‌ আর পরব্রহ্ম এক হয়ে যেতে থাকেন। মৃত নীলুকে ঘিরে তখন অগ্নি সর্বভূতে বিরাজমান। মুর্শেদ, মঞ্জু আর অতীশ যেন

তিন পর্বে প্রসারিত এই ট্রিলজি ১৯৩০ সাল থেকে আনুমানিক ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রসারিত। ভারত ও বাংলাদেশ, সমুদ্র ও নদী, জল, স্থল এবং আকাশ এই ট্রিলজিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

এই কাল-পর্ব অখণ্ড ও খণ্ড ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কালপর্বেই আমাদের চেনা পৃথিবী হয়ে গেছে নতুন, পুরনো বহু সংস্কার ধ্যান ধারণা সরে গেছে। এসেছে নতুন ধ্যানধারণা। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান মিথ্ জীবনের মহিমাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

কেবল কালব্যাপ্তিতে নয়, আদি সৃষ্টির মহিমা ব্যাখ্যানে নয়, নবীন পৃথিবী ও ধ্যানধারণার উজ্জ্বল রেখায়িত চিত্রে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এই ট্রিলজি। মনে হয় গ্রিক ট্রাজেডি, হিন্দু পুরাণ ও মুসলিম ধর্মধ্যান একে দিয়েছে এক অপরূপ মহিমা। তিন পর্ব মিলিয়ে রয়াল সাইজের মুদ্রিত গ্রন্থে মিলিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ষোলো শ। এই দীর্ঘ উপন্যাসের ধারক হয়ে আছে সোনা ওরফে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। সে যেন একালের অতীশ দীপাঙ্কর। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বোধের মধ্য দিয়ে তার অশ্রান্ত যাত্রা। এই যাত্রাপথে সে জীবনকে দেখেছে অফুরন্ত বৈচিত্র ও সমারোহে, দীনতা ও ক্লেশে, সাহস ও পরাক্রমে, শুভ আর অশুভের মিলিত মিছিলে।

এই তিন পর্বের উপন্যাসের লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতা বিচিত্র। তিনি পূর্ববঙ্গের নদী-বিল বেষ্টিত গ্রামজীবনে বেড়ে উঠেছেন, দেশভাগের পর কলকাতার উদ্বাস্তু কলোনিতে থেকেছেন, কলকাতার স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করেছেন, বিচিত্র সব জীবিকা অবলম্বন করেছেন, অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় লঝঝড়ে জাহাজের নাবিক হয়ে পৃথিবীর সব সমুদ্র বিচরণ করেছেন, নাবিক জীবনের লৌকিক অলৌকিক উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছেন। তারপর ফিরে এসেছেন কলকাতায়, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিযুক্ত হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যকেই আশ্রয় করেছেন। বাল্য-কৈশোরের সোনা, জাহাজের 'কোলবয়' ওরফে ছোটবাবু আর পরিণত জীবনে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক—লেখকেরই তিন সত্তা—সবটা মিলিয়ে এক সত্তা, যে জীবনের শিল্পী।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালে ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে। এই গ্রামকে নিয়ে শুরু হয়েছে ১ম পর্ব। যৌথ পরিবারে তাঁর শৈশব কৈশোর অতিবাহিত। সেই অভিজ্ঞতায় ভরা ১ম পর্ব ('নীলকণ্ঠ পাখির খোজে')। এই পর্বেরই শেষে দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে কলকাতায় উদ্বাস্তু-কলোনিতে নতুন জীবনের শুরু। এখানেই ১ম পর্বের শেষ। তারপর ২য় পর্বে ('অলৌকিক জলযান') সমুদ্রচারী জাহাজের কপ্তেনের সহকারীরূপে (ছোটবাবু) সপ্ত সমুদ্রে যাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণ, তারপরে ৩য় পর্বে আবার নগরজীবনের জগতে অতীশ দীপঙ্করের (সোনা) জীবনে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা—শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে দোলায়িত। জন্ম-মৃত্যুর বন্দনায় মুখরিত এক জীবন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও পূর্ববঙ্গে মুসলিম লিগের উত্থানে আলোড়িত হয়েছে যে ভারত, তার অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের গ্রামসমাজ। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে ২য় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম পর্বের আলোড়নে যন্ত্রণায় দলিত-মথিত হয়েছে সারা দেশ।

কী সেই যন্ত্রণা? "ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসও—সেইসব দুঃস্বপ্নের দিন, নিষ্প্রদীপ, পণ্যমূল্যের উল্লম্ফন। পাষাণ-পথে নিরন্নের শব। দলে দলে পুরুষ ভিখারী। দলে দলে নারী। পিছনে নিছক লোভাতুর শরীর-শিকারী। বাংলা তখন আপনাকে বাঁচাতে পারছে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্ব আর টাকার দাম পড়ছিল হু-হু করে, পাল্লা দিয়ে সেইসঙ্গে যতেক মূল্যবোধ। রাস্তার পাশে শব পড়ে থাকতে দেখলে বেওয়ারিশ লাশ বলে পাশ কাটিয়ে যাই—বলতে কি আসল ডিভ্যালুয়েশন, ডিভ্যালুয়েশনের প্রথম পর্যায়ে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হচ্ছিল ব্যক্তিগত শুচিতা, সম্ভ্রমবোধ, পরিবারগত সম্প্রীতি। অর্থনীতির আণবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু সব গুঁড়ো গুড়ো হয়ে যাচ্ছিল; জীবনকে যদি একটি সংগ্রাম বলি, তা হলে তার নানা রণাঙ্গন জুড়ে ঘটছিল সুন্দরের পশ্চাদপসরণ ও প্রস্থান।

তখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পাশ্চাত্ত্য শক্তির সমরোদ্যমের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি কলকাতা। এখানে ব্ল্যাক আউট, এখানে বোমা। এখান থেকেই বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই শহরের রাস্তার পাঁজর সাঁজোয়া গাড়ির ঘর্ষণে অষ্টপ্রহর কেঁপে কেঁপে উঠছে—ফৌজী ছাউনি যত্রতত্র এবং তারই আনুষঙ্গিক জীবন, নিষ্পেষণ এবং প্রলোভন। এত কাছে থেকে সত্যকার লড়াইয়ের চেহারা এদেশ দীর্ঘকাল দেখেনি। এ যদি তার নিজের লড়াই হ'ত, তবে হয়তো তার আগুনে পুড়ে সে পরিশুদ্ধও হতে পারত। তা তো নয়, পরের লড়াই কিনা। তাই দূর থেকে শুধু তার ফুল্‌কি লাগে, শরীর ঝল্‌সে যায়, দেহের এখানে ওখানে দগ্‌দগে ঘা সৃষ্টি হয়। এখানে হয়েছিল। সমদুঃখভাক সমাজের বদলে তৈরী হয়ে যাচ্ছিল উচ্চাবচ অশেষ স্তর, ফাঁপাই টাকার প্রসঙ্গে ঠিকেদার-সাপ্লায়ার ইত্যাদি বিবিধ কত বৃত্তি। প্রাচুর্যের উদ্‌গারের পাশাপাশি ক্লিন্ন, কুণ্ঠ জীবনের গ্লানি, বঞ্চনার অভিশাপ আর চিৎকার। আগেও যা ছিল না তা নয়, কিন্তু এমন স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয় নি। এমন পাইকারী হারে, মহামারীর আকারে দেখা যায় নি। এই দেশের অন্যত্রও যে ঘটে নি তা নয়, কিন্তু পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক বিচারে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে লড়াই-এর পাপ আর ছাপ তার উপরেই পড়েছিল সবচেয়ে বেশি। আর সেই পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতাসহ গোটা বাংলা। ওয়ার-এফরট্? তার দাম অবশ্যই পেয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনা, কিন্তু গোটা বাঙালিজাতি দাম দিয়েছে, ভিতর-বাহিরের সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে। ইজ্জত, ইমান আর বুকের রক্ত সেই দামের নাম।......

মহাযুদ্ধের দুর্যোগের রাত্রির পরে উঠে দেখি বিধ্বস্ত জীবন, ঝরা আর মরা পাতার স্তূপ। সেই জ্বর-জ্বর সকালে স্বাধীনতার সূর্যালোকও যেন ভালো করে ফুটল না।

ইতিমধ্যে আরও একটা সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল কিনা। প্রথমে দাঙ্গা, পরে পার্টিশন। দাঙ্গা—হ্যাঁ, কলকাতা-নোয়াখালির সেই মহা-মারণ আমাদের জাতীয় জীবনে আরো কয়েকটা 'কালো দিন'। কেননা তখন প্রাণহানিকে ছাপিয়ে উঠেছিল সর্বৈব মূল্যহানি। সমাজের অস্তিত্বের অস্থিতে মজ্জায় কাপুরুষতার বীজ বাসা বাঁধল—ব্যাপক হারে সেই প্রথম।.....

আর সেই রাশি রাশি উন্মূল জীবন? তাড়িত, প্রতারিত ওপারের মানবতা, এপারে শরণার্থী জনতা—তাদের কথা না লিখলে এই পটভূমি রচনা সম্পূর্ণ হত না। আপনাকে

হঠাৎ পর করে দেওয়ার যে অপরাধ, এই সিকি শতকেও তার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়নি। দূর তো করে দিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলে রাখতে পারলাম কি? তারা তো ফিরে এল, ঠেলে এল। এল কিন্তু ভালবাসা নিয়ে নয়। মাটির শিকড় যাদের ছিঁড়ে গেছে তাদের বুকে ভালবাসা বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। বিশেষ, যাদের সম্মান গেছে, সম্পদ গেছে, তারা ক্ষমাহীন তিরস্কারে ভরা চোখে চেয়ে থাকে। নির্বাক অভিশাপও ছিল নাকি? হয়তো ছিল। আগে থেকেই টলোমলো সমাজে ভারসাম্য আর এল না, কেন না ওঁরা স্থান যদি বা পেলেন, স্থিতি পেলেন না। এক পুরুষের সেই অস্থিতিজনিত অভিমান আর তিক্ততা দ্বিতীয় পুরুষে অস্থির এক আবর্তের সৃষ্টি করেছে নগরীর উপাঞ্চলের পকেটে পকেটে।.....জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা ভাগ আর্থনীতিক স্বস্তি কখনও পেল না। আন্তরিক দিক থেকে তাদের যথার্থ পুনর্বাসন কখনও ঘটে নি। একদেহে লীন হবে কি, তেল আর জল কতকটা আলাদাই রয়ে গেল। যাদের মূল্যবোধ ধসেছে বা কিংবা যাদের জন্মায়ই নি, স্নেহ-প্রীতি স্বাদেশিক মানবিক চেতনা ইত্যাদি, তাদের চিত্তের ফলকে নতুন কোনও মূল্যপাত পড়ল না। (সন্তোষকুমার ঘোষ, 'এই বাংলা', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮, পৃ ১৫৭-১৫৮)।

দুই

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রিলজি পাঠের জন্যে এই পটভূমি দরকার। এই পটভূমিতেই কাহিনি চিত্রায়িত হয়েছে এক প্রসারিত কালপর্বের (১৯৩০-১৯৭০) প্রেক্ষিতে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১ম পর্ব) এই প্রেক্ষিতেই বিচার্য।

তিনটি উপন্যাসেরই পর্যবেক্ষক সোনা—কৈশোর, যৌবন ও পরিণত বয়সের সোনা। ১ম পর্বে আমরা কিশোর সোনাকে পাই। ট্রিলজিতে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে বারবার। ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে সোনার জন্ম। লেখকের জন্মস্থানও সেই গ্রাম। গ্রামের চারধারেই পাট ও ধানের ক্ষেত। সামনেই ফাউসার খাল। তা পেরিয়েই শীতলক্ষ্যা নদী। আরো দূরে লাঙ্গলবন্ধ যেখানে মানুষ যায় তীর্থস্নানে। বেশ কিছুটা দূরে মুড়াপাড়ায় থাকে সোনার পিতৃব্য, সেখানেই দুর্গাপূজা দেখতে যায় সোনা। এক যৌথ পরিবারের কাহিনি পাই এই পর্বে। বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথ ভৌমিক—তাঁর ছেলে বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ পাগল। অন্যান্য ছেলেরা হলেন সেজকর্তা ভূপেন্দ্রনাথ (মুড়াপাড়া), ধনকর্তা চন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী ধনবৌ। তাঁদেরই পুত্র সোনা। ছোটকর্তা শচীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী শশীবালা। বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথ এতই প্রবীণ যে তিনি চলাফেরায় অক্ষম, আর বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ পাগল বলে নির্ভরশীল নন, তার ফলে সোনার বাবা ধনকর্তা চন্দ্রনাথ-ই যৌথ পরিবারের পরিচালক।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে দুই দশকের (১৯৩০-৫২) পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এদিকে শীতলক্ষ্যা, ওদিকে মেঘনা; এদিকে লাঙলবন্দ, ওদিকে গোয়ালন্দ। তার মাঝে গ্রামের পর গ্রাম। মাঠের পর মাঠ, খাল বিল চর। হিন্দু মুসলমান ধনী-মধ্যবিত্ত-গরীব, মধ্যবিত্ত হিন্দু ও গরীব মুসলমানের গ্রামনির্ভর জীবন।

ঢাকা-কলকাতা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দূরাগত তরঙ্গ গ্রামের শান্ত জীবনে আনে চাঞ্চল্য, সামাজিক আর্থনীতিক অস্থিরতা, শীতলক্ষ্যার জলস্রোতের মতো সময়স্রোতের অব্যাহত গতি। তারি মাঝে ছোট বড় মানুষের ওঠা-পড়া, দেশবিভাগের প্রস্তুতির নানা স্তর ও বিভাগ-পরবর্তী বিপর্যয়—সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে এক অখণ্ড জীবনবোধ, যা দেশকাল আলিঙ্গিত হয়েও কোনো খণ্ড সীমানায় ধরা দেয় না। সেই শাশ্বত জীবনবোধ দেশচেতনার পটে বিলগ্ন হয়ে আছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে।

জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখি ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে যাক—এই কামনা বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথেরই নয়, সকল চরিত্রেরই। উত্তর-চল্লিশের পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথের জীবনে সেই হারানো নীলকণ্ঠ পাখিরা আর ফিরে আসে না। এই বেদনায় তিনি নির্বাক।

এই বেদনা মণীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত। কিন্তু এ বেদনার যে সমাজগত, পরিবারগত, দেশকালগত বাস্তবরূপ আছে, তা দেশবিভাগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমাজজীবনে ধরা দিয়েছে লেখকের লেখনীমুখে। তাঁর সমাজবোধ মিশেছে শিল্পভাবনায়।

উপন্যাসের সূচনায় ধনকর্তা ওরফে চন্দ্রনাথের পুত্রসন্তানের জন্মসংবাদ ঘোষিত। তিনি মণীন্দ্রনাথের সেজ ভাই। যৌথ পরিবারের প্রধান বুড়াকর্তা মহেন্দ্রনাথ অশীতিপর অন্ধ বধির। তাঁর চার পুত্র—মণীন্দ্রনাথ (পাগল), চন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ আর শচীন্দ্রনাথ। তাদের তিন বৌ। মেজভায়ের (ধনকর্তা) ছেলে সোনা। সেই সোনা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে গ্রাম-নদী-বিল-নীল আকাশের ফ্রেমে আবদ্ধ জীবনে। বাল্য কৈশোর পেরিয়ে সোনা যৌবনের পথে চলেছে।

হিন্দু মুসলমানের প্রেম-প্রীতি সম্পর্কে বাঁধা জীবনে পরবর্তীকালের অশনি সংকেত নিয়ে এসেছে জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলিম লিগের উত্থান।

"ফেলু দেখতে পায় আকালুদ্দিন মিঞা নদীর পাড়ে হাইটা যায়। মিঞা যাবে বক্তৃতা দিতে। পরাপরদির হাটে লিগের সভা—সকাল সকাল দলবল নিয়ে চলে যাবে।..... ফেলুর ইচ্ছা হাটে যাবে সে একবার। তার এই লিগের মিঞাদের লম্বা লম্বা কথা শুনতে ভালো লাগে।.....

গায়ে কাঁটা দেয় যখন আকালুদ্দিন বলে—দ্যাখেন মিঞারা চক্ষু খুইল্যা দ্যাখেন কি আছে-ডা আপনেগ। খানা নাই, পিনা নাই, জানে নাই খুন, হিন্দুরা সব চুরি কইরা নিছে।.... কিন্তু তখনই মনে হল ধ্বনি উঠছে ঠাকুরবাড়িতে। সবাই মিলে ধ্বনি দিচ্ছে—বন্দেমাতরম্। কী কারণ এ ধ্বনির। কারণ সন্তোষ দারোগা ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এসেছিল রঞ্জিতকে ধরতে, কিন্তু তাকে পেল না। নিজ বলে দারোগা সাহেব শমন খাড়া করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ঠাকুরকে (শচীন্দ্রনাথকে)।..... ওদের দেখাদেখি সেও (ফেলুও) মাঠের এপারে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, আল্লা-হু-আকবর। হিন্দুরা কিছুতেই ওদের জন্য দেশটা আলাদা করে দিচ্ছে না। পায়ের তলায় রেখে কেবল মজা দেখতে চায়। হালার হালা কাওয়া। হালার হালা কাফের।" (পৃ ২৫০)।

এই ধ্বনির পিছনে পিছনে আসে দাঙ্গা। তার বর্ণনা পাই বড়বৌ আর তাদের সারাজীবন অনুগত কাম্‌লা ঈশম শেখের চিন্তায়।

"একদিন রাতে বড়বৌ (পাগল মণীন্দ্রনাথের স্ত্রী) দেখল মাঠের ওপাশে কিছু মশাল জ্বলে উঠছে। একটা দুটো করে অনেক ক'টা মশাল। মশালগুলি নদীর পাড়ে পাড়ে অদৃশ্য হতে থাকল। ওরা ধ্বনি দিচ্ছিল, আল্লা-হু-আকবর। তখন সকলে যে যার মতো পালাচ্ছে। ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এ-সব হিন্দু-গ্রামে আগুন দেবে বলে উঠে আসতে পারে।.... হাজিসাহেবের ছোট ছেলে আকাসুর কাণ্ড এসব, সে-ই এখন এসব করাচ্ছে।..... কী যে হয়ে গেল দেশটাতে। ঈশম নদীর চরে বসে তামাক খায় আর আবোল তাবোল বকে। মিঞা খুব যে খোয়াব দ্যাখতাছ। অগ খেদাইবা কোন দ্যাশে। নিজের দ্যাশ ছাইড়া কবে কেডা কোনখানে যায়। তখন সে শুনতে পায় নিশীথে কারা সব চিৎকার করছে নদীর ওপারে। আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি দিচ্ছে। নারায়ে তকদির ধ্বনি উঠছে। এ-পাশের হিন্দুগ্রামে ধ্বনি উঠছে বন্দেমাতরম্।" (পৃ ৩০০)।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের সূচনায় দেখি ঈশম শেখকে।—"সোনালী বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। ঈশম শেখ ছইয়ের নিচে বসে তামাক টানছে।....ঈশম শোনে এক খবর—ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তার আঘুনের শেষ বেলাতে ছেলে হয়েছে।..... এই খবর শুনেই সে নদীর পাড় অতিক্রম করে সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। ধনকত্তার পোলা হইছে—বড় আনন্দ, বড় আনন্দ।..... ছোট কর্তা দাঁড়ালেন' —ঈশম আইলি?—হ, আইলম। ধনকর্তারে খবর দিতে পাঠাইছেন? না পাঠাইলে আমারে পাঠান। খবর দিয়া আসি। একটা তফন আদাই কইরা আনি।" (পৃ ৯-১০)।

বড় আনন্দিত মনে ঈশম যাত্রা করে লাঠি ও লণ্ঠন হাতে। গামছা মাথায় রাতে সে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে ধনকর্তাকে খবর দিতে যাবে।

উপন্যাসের শেষে সেই ঈশমের মৃত্যু-সংবাদ। লোকে খবর দিল, "ঈশম তরমুজের জমিতে মরে পড়ে আছে। কখন সে মরেছে কেউ বলতে পারে না। .... এই জমির এক অংশে ঈশমের জন্যে একটু মাটি চেয়ে নিল সামু। এই জমির নিচে চুপচাপ শুয়ে থাকবে আবহমানকাল। নানারকম ঘাস জন্মাবে কবরে। ফুল ফুটবে ঘাসে। ঈশমের এই কবর থেকেই বাংলাদেশের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।" (শেষ পৃষ্ঠা—পৃ ৪১২)।

ঈশমের সেবায় স্নেহে ভৌমিক পরিবার আবদ্ধ ছিল। আবার তাদের স্নেহে সাহায্যে ঈশম কৃতার্থ ছিল। সে প্রাণ ঢেলে তরমুজের চাষ করেছে। তার পিছনে ছিল এই পরিবার ও পৃথিবীর জন্য অনুরাগ। আজ তা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু রাইনাবাদি গ্রামে সবাই ঈশমের মতো সেবাপরায়ণ কর্তব্যপরায়ণ নয়। বিধবা মালতীর উপর নজর ছিল জব্বরের। সে দুই সহকারীকে নিয়ে জোর করে মালতীকে ধরে নিয়ে যায় ধর্ষণ করবে বলে।

সেই ক্রূরকান্ডের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এই উপন্যাসে (পৃ ১৫৮, ১৬৭, ১৭০, ১৭৬, ২০০, ২২৫, ২৩০, ২৪০, ২৫৮) মালতীকে অপহরণ, মালতীর পলায়ন, মালতীকে ধরে ফেলে জব্বরের নেতৃত্বে তিনজনের ধর্ষণ, মালতীর উদ্ধার, মসজিদে আশ্রয় ও

চিকিৎসা—সবকিছুরই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা পাই এখানে। পূর্ববঙ্গ যে বদলে যাচ্ছে, তার অন্যতম নিষ্ঠুর ইঙ্গিত এখানে পাই। গ্রামে রঞ্জিত নাই, সামসুদ্দিন নাই—জব্বর ভাবল এই তো সুবর্ণ সুযোগ। প্রথম রাতের নির্জনতায় একা ঘরে শায়িতা মালতীকে (আবেদালির ছেলে) জব্বর তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে আঁধারে কোষা নাওয়ে বাঁধাছাদা মালের মতো তুলে নিয়ে নাও ছেড়ে দিল। এই সংবাদ চাউর হতে-না-হতেই শচীন্দ্রনাথরা নাও ভাসালেন। কিন্তু কোথায় কোষা নৌকা? কোনো সন্ধান নাই। তিন হারমাদ মানুষ মালতীকে জবরদস্ত হাফিজ করে নিয়ে গেল। কোষা নাওএর ছইয়ের ভিতর বাঁধাছাদা মালতী এখন সাপ ও বাঘের মতো। করিম শেখ লোভে পড়ে জব্বরকে টাকা দিল, অপহরণ করো মালতীকে। কিছুতেই মালতীকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে বাঁধন খুলে দিতেই মালতী আঁধারে জলে লাফিয়ে পড়ে। সাঁতার দিয়ে চলে যায় অনেকদূরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল-ভরা চরে শরবনে মালতী ধরা পড়ে গেল। পরপর তিনজন তাকে ধর্ষণ করে পালাল (পৃ ১৬৯-১৭০)। অবশেষে হোগলার জঙ্গলে ক্ষত-বিক্ষত মালতীকে খুঁজে পেল জোটন। ফকির সাহেবের সহায়তায় সেই রক্তাক্ত ধর্ষিত অচৈতন্য মালতীকে মসজিদে নিয়ে এলো। (পৃ ১৭৮)। সেই ধর্ষিতাকে জোটন, ফকিরসাহেব আর রঞ্জিত উদ্ধার করল। হায়! এই কি পূর্ববঙ্গের প্রতিমা? আজ সে ধর্ষিতা হয়ে পড়ে আছে।

এভাবেই লেখকই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসকে এক বিপর্যয় কালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান।

সোনাদের এই ভৌমিক পরিবারের কাহিনিতেই উপন্যাস আবদ্ধ নয়। আছে বিচিত্র চরিত্রের মেলা—তরমুজের খেতে পাহারাদার ঈশম শেখ, মুসলিম লিগের পান্ডা তরুণ সামসুদ্দিন, আবেদালি, তার বিবি জালালি ও বেওয়া-বোন জোটন, মনজুর, বিধবা মালতী, তার ভাই নরেন দাস, ফকিরসাব, ফেলু শেখ, সামসুদ্দিনের মেয়ে সোনার খেলার সাথী ফতিমা, হাজি সাহেব, পাগল ঠাকুরের বাড়ির কুটুম্ব রঞ্জিত (যে শেষপর্যন্ত ধর্ষিতা মালতীকে বাঁচায়), দুর্বৃত্ত জব্বর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শশিভূষণ, লালটু-পল্টু (সোনার খুড়তুতো ভাই), মুড়াপাড়ার জমিদার ভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক, মুড়াপাড়ার বাড়িতে সোনার সঙ্গী দুই কিশোরী অমলা কমলা, রামসুন্দর, ফেলুর বিবি আন্নু, আন্নুর যৌবনভোগী আকালুদ্দিন এবং আরো অনেকে। আছে জমিদারের হাতে শেখ ফেলুর এক হাত ভেঙে দেওয়া ও মণীন্দ্রনাথকে (পাগল) নিয়ে অনেক জায়গা ঘুরে তার ফিরে আসা; অন্য গ্রামের ষাঁড়, যার সঙ্গে লড়াইয়ে ফেলুর মৃত্যু। আছে মেলার দাঙ্গা, মুসলিম লিগের সভা, পুলিশের হাতে শচীন্দ্রনাথের গ্রেফতার, বুড়াকর্তা মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ইন্দ্রপতন, জলে ডুবে জালালির মৃত্যু, ফেলুর হাতে বড়কর্তা পাগল মণীন্দ্রনাথের মৃত্যু, গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক বিরোধ, একদিকে তরুণ রঞ্জিত অপর দিকে সামসুদ্দিন দুই খেলার সাথীর দুই বিপরীত মতাদর্শে (কংগ্রেস, মুসলিম লিগ) সংঘর্ষ, জব্বর কর্তৃক মালতী অপহরণ, ধর্ষণ, মালতীর উদ্ধার, রঞ্জিত আর মালতীর নতুন জীবন, দেশবিভাগ, সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে শচীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথের সপরিবারে দেশত্যাগ, তাদের দুঃখে বিশ্বস্ত সেবক ঈশম শেখের বেদনা, একদিকে ঢাকায় সামসুদ্দিন ও তার মেয়ে ফতিমার নতুন

জীবন—বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, অপরদিকে কলকাতায় খিদিরপুর ডকে ট্রেনিংশিপে যুবক সোনার শিক্ষানবিশি, উদ্বাস্তু মেয়ের দলে মালতী, চালচোরাই তাদের জীবিকা, যার জন্য নিত্য শতেক লাঞ্ছনা। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে, আর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গের জীবনযাত্রার বিচিত্রতর পটভূমে দলিত, পিষ্ট, উজ্জীবিত হয়েছে এইসব চরিত্র।

রাজনীতির পটপরিবর্তন ঘটে এই দুই দশকে। ছোটকর্তা শচীন্দ্রনাথকে রাইনাদি গ্রামে এসে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তার কিছুদিন আগে তিনি গ্রামে এক সভা ডেকেছিলেন, সেখানে বহিরাগত গান্ধি টুপি পরা নেতা বলেছিলেন, আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। আকালুদ্দিন মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন—এক জাতি, এক পরিবার—আমরা ভারতবাসী!—এই আদর্শ আর চলবে না। তারপরই পরাপরদি গ্রামে মাদ্রাসার মাঠে সামসুদ্দিন বক্তৃতা দিয়েছিল—"হিন্দু মুসলমান একই রাষ্ট্র একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারেনা; হিন্দুদের এমন মুসলমান-বিদ্বেষ যে, তারা কিছুতেই যৌথ সরকার গঠন করলেন না। হক সাহেবের প্রজা পার্টির সঙ্গে হাত মেলালেন না। হিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষ কি প্রকট! ভিন্ন দেশ বাদে মুসলমানের গতি নাই।" এই বক্তৃতা করার সময় সামসুদ্দিন তার খেলার সাথী মালতীকে ভুলতে চেয়েছিল আর আকালুদ্দিন হেঁকে উঠেছিল, আল্লা-হু-আকবর।

সেই সামসুদ্দিন ঢাকায় বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বলেছিল, "ফ্যাসিস্ট লিগ সরকার আমার আপনার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।" সোনার খেলার সাথী সামসুদ্দিনের মেয়ে ফতিমা মহান একুশে-র সংগ্রামে সাথী পেয়েছে সফিকুরকে, তবু সাথী মালতীকে সে ভোলে নি, ভুলতে পারবে না। ছেলেবেলায় গ্রামে সামসুদ্দিন মাথায় পরত আমের মুকুট, হাতে নিত বিসর্জনের পরে ঈশম চাচার জল থেকে তুলে আনা দুর্গা ঠাকুরের ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

"সামুর মনে হল ওর সেই আমজামপাতার মুকুট এখনও কে যেন তার মাথায় পরিয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলুক মাথায় আমজামপাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারে নি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা হাহাকার করে উঠেছে। মালতীর কথা মনে আসতেই সবেগে সে বলে উঠল, আজ আমাদের আন্দোলনের দিন, মায়ের ঋণ শোধ করার দিন। আমাদের মা বাংলা মা'র চেয়ে বড় কিছু নেই। যত দিন ঋণ শোধ না হবে ততদিন আমাদের রেহাই নেই।"

এই আত্ম-উপলব্ধির পটভূমিতে ধ্বনিত হয় সমবেত কণ্ঠের গান:

"ওগো মা জননী/ আমাগো মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়/ আমরা কী যে করি/ একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমরা কী যে করি।"

এই গানে গলা মেলায় সফিকুরের দল। সেই সঙ্গে আছে ফতিমা। সামসুদ্দিন ভুলতে পারে না মালতীকে। ফতিমা তার সোনাবাবুকে। এ কেবল বাল্যসাথীকে ফিরে পাওয়া নয়, পূর্ববঙ্গে শাশ্বত জীবনধারায়, অমল দেশচেতনায় প্রত্যাবর্তন।

আর তখনি উদ্বাস্তু সোনা হালিশহরের ক্যাম্পজীবন থেকে ভাসতে ভাসতে এসে

পৌঁছেছে খিদিরপুর ডকের ট্রেনিংশিপের শিক্ষানবিশিতে। ওখানে বাংলাদেশের আকাশ নীল। এখানে ডকে দৈত্যের মতো ক্রেনগুলি লম্বা ছায়া ফেলেছে জেটির জলে :

"অথচ এরই ভেতর সে একটা ঘুঘুপাখির ডাক শুনতে পেল। কোথাও এখানে তবে ঝোপজঙ্গল আছে যেখানে এই শীতের সময়েও ঘুঘুপাখি বাস করতে পারে। ঘুঘুপাখির ডাক শুনলেই বাংলাদেশের কথা মনে হয়। ফতিমার কথা মনে হয়। প্রিয় অর্জুন গাছটার নিচে কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। গাছটা একটা নিঃসম্বল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নেই, জ্যাঠামশাই নেই। ফতিমা শহরে থাকে। কিন্তু সেই গাছটার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলে দেখল ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুরে ফিরে আবার তার তরমুজের জমিতে নেমে যাচ্ছে।"

সোনা যখন বাবা-মা-কাকি-জেঠাইমার সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে আসে তখন আশ্বিনের নীল আকাশতলে মেঘনার তীরে দাঁড়িয়েছিল তার ঈশম-কাকা। তিনটে নৌকায় তারা চলেছে দেশ ছেড়ে। আর নৌকা দেখে পাড়ে পাড়ে হেঁটে চলেছে ঈশম। ঈশম যতক্ষণ পারে ততক্ষণ পাড়ে পাড়ে গ্রাম বা বালির চর ধরে হাঁটছে। সোনা দেখছে নৌকা থেকে ওই অস্পষ্ট মূর্তি ঈশম দাদা :

"সোনার মনে হল সে যা কিছু ফেলে যাচ্ছে, তা সে আর ফিরে পাবে না। আবার এদেশে সে আসতে পারবে কবে সে জানে না। সে বড় হলে ঠিক চলে আসবে। কারণ, যত দূরেই থাক, তরমুজের জমি, নদীর জল, মালিনী মাছ ভুলে বেশিদিন থাকতে পারবে না। সোনার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কেন জানি বারবার ডাকতে ইচ্ছা হল, ঈশমদাদা, আপনি ফিরে যান। আমরা আবার ফিরে আসব।'

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের অনেক চরিত্রই অনেক কিছু পায় নি। বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখিকে ফিরে পাননি, পান নি পলিনকে, তাঁর স্ত্রী ফিরে পাননি স্বামী মণীন্দ্রনাথকে। জালালি পায়নি তার ক্ষুধার খাদ্য, বিলে ডুবে মরেছে। ফেলু রাখতে পারেনি আন্নু বিবিকে। মালতী পায়নি তার সুখকে। জোটনবিবি রাখতে পারে না কোনো স্বামীকেই। হাজি সাহেবের মাইজলা বিবি পায় না তার মনের মানুষ ফেলুকে। ঈশম রাখতে পারে না তার তরমুজ খেতকে। তবু নীলকণ্ঠ পাখির অন্বেষণে সবাই চলেছে সারা জীবন। পূর্ববঙ্গের আশ্চর্য সবুজ-নীল মেশানো পটভূমে বিধৃত এই সুখ আর স্বপ্নের অন্বেষণ দেশকাল-আলিঙ্গিত কাহিনিতে রূপায়িত হয়েছে। আঠার-বিশ বছরের সময়সীমার মধ্যে এই বাংলাদেশে কত না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ঘটনার তরঙ্গ। সেই সব তরঙ্গের অভিঘাতে শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী গ্রামের মানুষ কীভাবে বিচলিত, বিপর্যস্ত হয় ও সেই বিপর্যয়ের মধ্যেই কীভাবে এক অমল সুখের স্বপ্ন দেখে, তার উজ্জ্বল চিত্রশালা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'।

এই উপন্যাসের এক বিশেষত্ব পূর্ববঙ্গের গরিব মুসলমান সমাজের অন্তরঙ্গ জীবন চিত্রণ। পূর্ববঙ্গের গরীব মুসলমান নরনারীর দুঃখকে লেখক গভীরে স্পর্শ করেছেন, দিয়েছেন শিল্পরূপ। সেই সঙ্গে পাই গ্রামের ধর্মানুষ্ঠান ও ঋতু-পর্যায়ে বাঁধা অনুষ্ঠান—হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত ও স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানগুলির উজ্জ্বল বিবরণ। জালালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া,

ফকিরসাহেবের শেষ মুহূর্ত, ফেলুশেখের বাঁধানো কবরে হাজিসাহেবের মাইজলা বিবির রাতের আঁধারে মোমবাতি জ্বালানো—এইসব দৃশ্যে মুসলিম জীবনের সামাজিক ও ধর্মীয় 'মিথ' জীবন্ত হয়ে উঠেছে।।

অপরদিকে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে হিন্দু 'মিথ' প্রত্যক্ষ শিল্পরূপ পেয়েছে। ধনকর্তার ছেলের (সোনা) রথ উপলক্ষে আচার, পালেদের দুই মেয়ের মাঘ মণ্ডলের ব্রত, দুর্গাপূজা, পূজায় রাবণবধের পালাগান, রামায়ণ-গান, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান, সোনার উপনয়ন, মুড়াপাড়ার দুর্গাপূজা, মোষবলি, দশমী তিথিতে দশেরা উৎসব, লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক পূজা: ঋতুচক্রের মালায় গাঁথা উৎসব ঘুরে ঘুরে আসে। আর আছে মেলা যা একমাস ধরে চলে। যেখানে ঘোড়া দৌড়, গোরু দৌড় হয়। আর আছে দাঙ্গা যার জন্য সেই মেলার আনন্দ হঠাৎ শেষ হয়ে যায়।

এরই মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠে সোনা। তার চার পাশের নিসর্গ আর মানুষ তার শিশুমনে বিচিত্র ছায়া ফেলে। নিসর্গের সবুজ আর সংসারের নানা রঙ সোনার কিশোরমনে আলোর ধূপছায়া জাল বোনে। তার বিস্ময়বিমুগ্ধ সৃষ্টির সামনে পরতে পরতে উদ্‌ঘাটিত হয় অপূর্ব দেশ—যেখানে শরৎকালে শেফালি ফোটে, স্থলপদ্ম গাছ শিশিরে ভিজে যায়। আকাশ নির্মল থাকে, রোদে সোনালি রঙ ধরে। এই দেশে সকালে সোনালি রোদ মাঠে নামে, দুপারে চর জেগে উঠেছে, বাবলা আর পিটকিলা গাছে ছেঁড়া ঘুড়ি আর নদীতে নৌকা—তালের বা বেনারসের। তখনি জানা যায় এদেশে শরৎকাল এসে গেল। এই অমল শরতের সোনা-রোদে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের বাতাবরণ এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে।

তিন

দ্বিতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান'-এ কিশোর সোনা যুবকে পরিণত। দেশবিভাজনের পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু-জীবনযাত্রার ক্লেশ ও অনটন সহ্য করে জীবনের লড়াইয়ে নেমেছে সোনা। তার জীবিকা অন্বেষণ, তার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন পথে তার যাত্রা। এই যাত্রার পদে পদে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ব্যবহার হয়েছে। সারা দুনিয়ার সমুদ্রপথে যে মালবাহী জাহাজ খিদিরপুর ডক থেকে শুরু করে জলযাত্রা, সেই জাহাজের ছোটবাবুর (কোল-বয়) ফেলে আসা পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবনের সোনার মিল অল্পই। অমিল প্রচুর। তবু প্রথম পর্বের ('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে') জীবনকে একেবারে বর্জন করে নয়, তারই বিচিত্র উত্তরণ 'অলৌকিক জলযান'।

এই পর্বের সূচনা ১৯৫৩ সালে, দেশবিভাজনের ছয় বছর পরে। উপন্যাসের সূচনা লগ্নেই দেখি কিশোর সোনা বদলে গিয়েছে, আজ সে পরিণত যুবক।

এই পরিবর্তনের সুরটি উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদেই স্পষ্ট :

"১৭ই ১৯৫৩। এ-ভাবে সোনা ক্রমে হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমে সেই দিনগুলো থেকে, জন্ম থেকে সে এভাবে ক্রমে হেঁটে যাচ্ছে যেন। বড় হতে হতে চার পাশের মুগ্ধতার

ভিতরে কখন যেন কঠিন কিছু আবিষ্কার করেও সে হেঁটে যাচ্ছে। নস্করবাড়ির লাল পাঁচিলের পাশ দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। সে তার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমে সূর্য ওপরে উঠছে, সে তখনও হেঁটে যাচ্ছে।"

ক্যাম্বেল হাসপাতাল, সারপেনটাইন লেন, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, সবুজ র‍্যামপার্ট, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পেরিয়ে পেরিয়ে সে চলে যাচ্ছে খিদিরপুরে। দেখে মনে হয় সে হেঁটে হেঁটে আর পারছে না। তবু তাকে হেঁটে যেতে হয় শিপিং অফিসে। বারবার আসছে যাচ্ছে। সেখানে জাহাজে চাকুরির জন্য তার প্রতীক্ষা। সে তো 'ভদ্রা' জাহাজে ট্রেনিং নিয়েছে। তার হাতে আছে জাহাজি ছাড়পত্র 'নলি'।

খিদিরপুর ডক-আপিসে 'নলি' হাতে সোনা জাহাজের আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন। জাহাজের আগমনের খবর হলেই বড় বড় 'মাসতার' পড়ে যায়। জাহাজ থেকে কাপ্তান বড় মিস্ত্রি নেমে আসে। সোনা যাবে প্রথম সফরে। আর সে-কারণেই অভিজ্ঞতা নেই বলে কেউ তাকে নিতে চায় না। তবু সে হতাশ হয় না। একদিন-না-একদিন জাহাজ সে পাবেই। তাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে সোনা দেখতে পায় একজন বুড়ো মানুষ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। লম্বা দাড়ি, ছোট চুল, সাদা পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবি, হাতে একটা লেদার ব্যাগ। 'মাসতার' শেষ হয়ে গেলে গাছের ছায়ায় দাঁড়ান। ফের আসেন পরের দিন। পাশে নদী, নদীতে কত জাহাজ। কতদিনে সে কাজ পাবে?

একদিন আলাপ হল। বুড়ো মানুষ শুধান, তুমি বাবা জাহাজ পাচ্ছ না?—না, চাচা। — এত কম বয়সে তো জাহাজে নেয় না।—আমার 'নলি' আছে, ভদ্রা জাহাজ থেকে ট্রেনিং নিয়েছি।—নলি দিয়ে কিছু হয় না। সফর না দিলে কিছু হয় না।—আমার তবে হবে না?

এই কথালাপের মধ্য দিয়েই ছোকরা সোনার সঙ্গে অভিজ্ঞ এনজিন সারেঙ বুড়ো চাচার ভাব হয়ে যায়। চাচা খবর দেয়, দু-চারদিনের মধ্যে এসে যাবে তার পুরনো জাহাজ—ব্যাঙ্ক লাইনের 'এস এস সিওল ব্যাঙ্ক'।

চাচার কথাতেই সোনা পুরনো জাহাজ 'এস. এস. সিওল ব্যাঙ্কে' coal boy (ছোটবাবু)-এর কাজ পেল। নেমে এলেন প্রধান কাপ্তান হিগিন্‌স্ সাহেব। সবাই তাকে বলে বাড়িওয়ালা। চাচা সাবধান করেন—'কয়লার জাহাজে ভীষণ খাটুনি। তুমি পারবে না। প্রায় ক্রীতদাসের সামিল কাজ।' সোনা জোর গলায় বলে—না, চাচা, আমি পারব।

সোনা বোঝে এই বুড়ো চাচা জাহাজে সারেঙ বা টিন্ডালের কাজ করেন। আসলে তিনি এনজিন-সারেঙ। তার কাছেই সে শোনে—এই 'এস. এস. সিওল ব্যাঙ্ক' জাহাজটা আসলে ইবলিশ (শয়তান)। কেন শয়তান? কেন? 'কেউ বলে ডেনিসদের ওটা যুদ্ধ জাহাজ ছিল, কেউ বলে পালের জাহাজ, কেউ বলে প্রথম মহাযুদ্ধে জাহাজটা খুব ঘায়েল হয়েছিল। মাঝ দরিয়া থেকে মাঝিমাল্লারা টেনে কার্ডিফে নিয়ে যায়। চক ও বয়লার পাল্টে ওটাকে ওরা কার্গোশিপ বানিয়ে ফেলে। কিন্তু ঘাড়ে শয়তান চেপে আছে। পুরানো জাহাজ কখন যে দরিয়ায় এসে পড়বে, কে জানে।' (পৃ. ১১, 'অলৌকিক জলযান')।

চাচার মুখেই সোনা শয়তান-জাহাজের গল্প শোনে। 'দুনিয়ায় দুজন কাপ্তান আছে জাহাজটাকে চালাতে পারে। একজন উইলিয়াম, বুড়ো মানুষ, হিগিন্‌স্ আরও বুড়ো। শেষ বয়সের বিয়ে। বউ পালিয়ে গেছে। ছোট একটা ছেলে আছে। .... ছেলেটাও একটা ইবলিশ। বাপের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়, পড়াশোনা করে না, বেহদ্দ পাজি।' (তদেব পৃ. ১১)

সোনা চাচার কাছ থেকেই এই জাহাজের সবরকম সংবাদ পায়। জাহাজের আছে তিনটে জ্যান্ত কসবি (অর্থাৎ বয়লার)। এই কসবি তিনটেকে বাগে আনতে পারে মাত্র দু'জন সারেঙ—একজন ইমানুল্লা, অপরজন চাচা স্বয়ং। কাল জাহাজটা আসছে। নতুন যাত্রায় কাপ্তান (বাড়িয়ালা) হিগিন্‌স্। খুব রগচটা। সঙ্গে আছে তার কিশোর পুত্র। 'এস. এস. সিওল ব্যাঙ্ক' পরদিন এল। সবাই বলে, 'ইবলিশ'। 'মাসতার' লাগাল। লাইন লাগল। কিন্তু ভিড় নেই। তিনটে বয়লারের জন্য তিনজন করে প্রত্যেক ওয়াচে ফায়ারম্যান। প্রত্যেক ওয়াচের জন্য দুজন করে কোল বয় (coal boy)। দু'জন ডকিংম্যান, তিনজন গিজার, একজন কসপ, বড় টিন্ডাল, ছোট টিন্ডাল, সারেঙ। তাছাড়াও দুজন বাড়তি। কয়লার জাহাজ। জাহাজের বড়-সালেম ডেক-জাহাজিদের বেছে নিচ্ছেন।

সোনা ভাবল, কতদিন পর একজন (বুড়ো চাচা এনজিন-সারেঙ) তার দুঃখটা কি, সে কেন যাচ্ছে তার দেশ মাটি মানুষ ফেলে, টের পাচ্ছে। তার মনে হল মানুষটা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। সোনা অপরদের মতোই পরিশ্রমের বিনিময়ে অ্যাডভান্স টাকা পেল। সোনা জানে যতটা বেশি সম্ভব টাকাটা মাকে পাঠাতে হবে। চাচার ধার (তিন টাকা) শোধ দিতে হবে। চাচার পরামর্শে সে কেনে একজোড়া জুতো, একটা প্যান্ট, একটা জামা। টিনের একটা সুটকেস, মাজন, এক জোড়া নীল রঙের প্যান্ট, নীল রঙের জামা। এই পরে জাহাজে কাজ করতে হবে। মেরামত করে পুরনো শু, শক্ত হবে শুকতলা।

আজ সোনার দুঃখ শেষ। আড়াই মাস 'ভদ্রা' জাহাজে ট্রেনিং। আগে এক মাস কাজের খোঁজে শহরে ঘুরেছে। জাহাজ ছাড়ার একদিন পূর্বে মাকে চিঠি লিখে মানি অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দেবে—মা বুঝতে পারবে নিখোঁজ ছেলে জাহাজে চলে যাচ্ছে।

জাহাজে সোনার কাছের সঙ্গী চাচা, মৈত্র (টিন্ডাল), অমিয় আর সে (কোলবয়)। ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে যায়। coal boy-কে সবাই বলে ছোটবাবু। অতএব সোনাও এখন থেকে ছোটবাবু। সে, মৈত্র আর অমিয় তিনজনে পছন্দমত ফোকসাল বেছে নিল।

সোনা দেখল জেটিতে একটা দামি গাড়ি থেকে নামলেন বুড়ো কাপ্তান হিগিন্‌স্। সঙ্গে এক টেডি বয়। তার ছেলে। দেখতে সুন্দর। বয়স তের-চোদ্দ। (আসলে তার মেয়ে বনি, ছেলে সাজিয়ে তাকে কাপ্তান নিয়ে এসেছে। বনির আলাদা ঘর। কাপ্তানের আলাদা ঘর।) বড় মালোম, চিফ মেট, টিন্ডাল, সারেঙ—সবাই সেলাম জানায়। (এই জাহাজে বনির পরিচয় কাপ্তানের ছেলে হিসেবে, নাম জ্যাক। তাকে কতোদিন পর্যন্ত ছেলে সাজিয়ে রাখা যাবে—চিফ-মেটের প্রশ্নের উত্তরে কাপ্তান বলেন—জানি না কি হবে।) জাহাজ যাবে অনেকদূর—প্রথম গন্তব্য বুনো আইরিস (অর্থাৎ বুয়েনোস এইরিস)।

এবার 'ইবলিশ' পুরনো 'এস. এস. সিওল ব্যাঙ্ক' জাহাজের নোঙর তোলা হল। অজানা

দূর সমুদ্রে ভেসে যাবে। জাহাজের পিছনে এনজিন আর ডেক-ক্রুদের বাথরুম। দু-পাশে দুটো মেসরুম। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি টুইন-ডেকে নেমে গেছে। দুপাশে দুটো ফোকসাল। পোর্ট-সাইডের ফোকসালে এনজিন-সারেঙ। পরেরটায় দুজন এনজিন-টিণ্ডাল। স্টারবোর্ড-সাইডের ফোকসালে ডেক-সারেঙ। পরেরটায় ডেক-টিন্ডাল এবং কশপ। তারপর সিঁড়ি ক্রমে লোয়ার ডেকে নেমে গেলে মাঝ বরাবর একটা লম্বা ঘর। ঘরে ক্রুদের রসদ। দুপাশে সব এনজিন-ক্রুদের থাকার জায়গা।

ছোটবাবু (coal-boy) সোনা উঠে এলো আপার ডেকে। তার মনে হল জাহাজটা ইবলিশ নয়। আপ-ডেকে, মেসরুমের দুপাশে দুটো গ্যালি। তারপর দুটো হ্যাঁচ, দু হ্যাঁচের মাঝখানে মাস্তুল। তার দুপাশে দুটো দুটো করে চারটে ডেরিক। মাস্তুলের গোড়ায় দুটো করে উইন্‌চ্‌। মাস্তুলের রঙ হলুদ। খোলের রঙ সাদা, কেবিনের রঙ সাদা। তারপর চীফ-কুকের গ্যালি। গ্যালির দুপাশে দুটো এলি-ওয়ে। দুটো এলি-ওয়ে দিয়েই এনজিন-রুমে নামা যায়। (এই বর্ণনা আছে পৃ. ১৯-এ)।

লম্বা ডেক। পুরনো জাহাজ হলেও রিপেয়ারের জন্য রঙের নতুন গন্ধ। খিদিরপুর ডক ছেড়ে জাহাজ ধীরে ধীরে চলল মোহানার দিকে। কেবিনগুলোর মাঝখানে চৌকোনো একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা। উপরে উঠে গেলেই বোট-ডেক আর কাচের স্কাইলাইট। একটা লম্বা সিঁড়ি 'দ'-এর মতো এঁকে-বেঁকে পাতালে নেমে যাবার মতো। সিঁড়ির প্রথম ধাপে আছে প্রকাণ্ড সিলেন্ডার। বড় বড় লম্বা থামের মতো মোটা, স্টিম-পাইপ এসে জুড়ে গেছে। সিঁড়ির পরের ধাপে রয়েছে গোল গোল লম্বা পিস্টন রড। তার আকার আর পরিমাণ দেখে ছোটবাবু ঘাবড়ে গেছিল। নিচে নেমে গেলে ক্র্যাঙ্ক স্যাফট। বিশাল লম্বা স্যাফট চলে গেছে অনেক দূরে, বাইরে প্রপেলারকে ধরে রেখেছে। এনজিন-রুমে বিশাল তিনটি বয়লার। তার গায়ে নানারকম পাইপ, কক্‌, গেজ। এ-পাশে জেনারেটর, এভাপরেটার, ও পাশে কনডেনসার, ব্যালেস্ট পাম্প, জেনারেল সার্ভিস পাম্প। ওপাশে ঢুকে গেলে বয়লারের বিরাট তিনটে হাঁ-করা মুখ। বয়লারের তিনটে করে ফারনেস। লম্বা স্টক-হোলডে দাঁড়িয়ে ছোটবাবু ওপরদিকে তাকাল। বয়লারের বিশাল মুখ দেখে ছোটবাবু ভয় পেল।

এই বিবরণ (পশ্য পৃ. ২০) পাঠকের সামনে এক নতুন জগৎ উন্মুক্ত করে দেয়। বাংলা উপন্যাসে এক প্রাচীন কয়লা-জাহাজে সারা পৃথিবীর সমুদ্র-পথে যাত্রার পটভূমে এক বাঙালি যুবকের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়-রহিত। এই জাহাজকে 'শয়তান' বলে অনেকে ভাবে দিকচিহ্নহীন নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্রে নিরন্তর ভেসে চলা এক অলৌকিক অনুভূতি বহে আনে। এবং মনে হতে থাকে এক অলৌকিক অভিযান।

বিশালত্বে রহস্যে অপার বিস্ময়ে ভরা 'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসটি পেয়ে গেছে মহাকাব্যের মর্যাদা। এ যুগে উপন্যাসই মহাকাব্যের প্রতিস্পর্ধী—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস পড়তে পড়তে সে-কথাই আমাদের মনে হয়েছে। একটি উদ্বাস্তু যুবক কাজের খোঁজে খিদিরপুরে—সেখান থেকে পুরনো এক কয়লা-জাহাজে মাল নিয়ে সাত সমুদ্র পরিক্রমা। এই যাত্রার বিস্ময় আর অলৌকিক অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়-রহিত।

এবার আমরা ছোটবাবুর সঙ্গে অজানা রহস্যভরা সমুদ্র-যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। এই মহাকাব্যোপম উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠক স্তম্ভিত, বিস্মিত, মুগ্ধ হয়।

মোহানা ছেড়ে যাবার সময় পাইলট-স্টিমার বিদায় নিল। লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। এখন শুধুই জল আর জল। অসীম অনন্ত জলরাশি আর অসীম অনন্ত নীল সমুদ্র। তারই বুকে একটি জাহাজের ডেকে স্টারবোর্ডে ফার্নেসের সামনে নাবিকদের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা।

জাহাজ চলেছে ডারবানে। সেখানে কিছু পাটের গাঁট নামানো হবে। নিষ্ঠুর সারেঙ আর্চি সামান্য কোল-বয় (ছোটবাবু)-এর মুখে মুখে ইংরেজিতে উত্তর দেবার স্পর্ধায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তি দিচ্ছে। তাকে সারেঙ এনজিনরুমের দরজায় ঢুকিয়ে দিল। সেখান থেকে কনডেনসার বাঁয়ে রেখে সারেঙের হুকুমে আরো নিচে নেমে গেল। অন্ধকারে তলায় নেমে গিয়ে বালতি করে ট্যাঙ্ক-ধোয়া ময়লা তুলে ফেলে। নুয়ে নুয়ে সে কাজ করে। অসহ্য ঠান্ডায় হাত-পা অসাড় হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জ্যাক নিচে নেমে কোলবয় সোনাকে উদ্ধার করে আনে। (তদেব, পৃ. ৬৫-৬৮)।

কাপ্তানের ছেলে 'জ্যাক' (আসলে মেয়ে 'বনি') কোল-বয় সোনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে চায়। জীবনের সহৃদয়তা ও স্নেহে ছোটবাবু ভয় পায়। ছোট জ্যাককে বলে—'তুমি বুঝি খুব একা। আমি তোমার বন্ধু হতে পারি না। তুমি যেমন আমার মনিবের মতো আছো তা'ই থাকো। যখন যা সার্ভিস চাইবে পাবে।' এ কথায় জ্যাক ক্ষিপ্ত হয়, গাল দেয়, চীৎকার করে, কাঁদে। ছোটবাবু ছুটে পালিয়ে যায়। (তদেব, পৃ. ৭৪-৭৫)।

জ্যাক তার পোশাক বদলে হয়ে যায় বনি। সাটিনের ফ্রক। তাতে নানা বর্ণমালা, পায়ে দামি মোজা জুতো, সারা শরীরে সুগন্ধ। সেই ঘ্রাণে ছোট মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে হয় দেয়ালের ক্যালেন্ডার থেকে নেমে এসেছে এক সুন্দরী পরি। (পৃ. ১৪৬)।

ভিক্টোরিয়া পোর্টে মাসাধিককাল দাঁড়িয়ে জাহাজ। অসুস্থ ছোটবাবুর জন্য বনির মায়া, কাপ্তানের মায়া, সকলের মায়া। ছোটকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অসুস্থকে পাড়ে রেখে জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম এখানে কাপ্তান হিগিন্‌স্ না মেনে ছোটখাট রিপেয়ার মেরামতের কাজ চালালেন। শেষে ছোটকে নিরাময় করে জাহাজে ফিরে আনা হল। জ্যাক বলল, তোমাকে না নিয়ে আমরা যাব না ছোটবাবু। ছোটবাবুর রাগ দুঃখ কেমন নিমেষে উবে গেল। সে জ্যাককে বলল, তুমি ভাল হয়ে যাও জ্যাক। জ্যাক কথা দিল। (তদেব. পৃ. ১৫০-১৫৩)।

ছোটবাবুর এই সমুদ্রযাত্রায় কেমন যেন মনে হতে থাকে সে এক অলৌকিক জলযানে চড়ে যাত্রা করেছে। নানা ঘটনা তার ধারণাকে পুষ্ট করে। যেমন, বড় মিস্ত্রি রিচার্ডের ঘটনা।

কাপ্তেন "হিগিন্‌স আবার সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় দেখতে পান, চার পাশে শুধু অন্ধকার। কালো সমুদ্র, কালো আকাশ, গভীর উজ্জ্বল নক্ষত্র, এবং সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস যেন মাংকি-আয়ল্যান্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন বুঝতে পারেন শেষ রাত্রের দিকে সমুদ্রের বাতাস ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে। এবং এখন গিয়ে শুধু শুয়ে পড়া।.... সেকেণ্ড-মেটকে বলে দিতে হবে, রাত তিনটেয় একটা বাতিঘর দেখা যেতে পারে। তখন যেন তাকে ডেকে দেওয়া হয়। এ সব ভেবে কেবিনের ভেতর যান। তিনি এই মধ্যযামিনী-

অন্তে বসে থাকেন হাঁটু মুড়ে। খৃষ্টের মূর্তির সামনে.... মনে হয় যীশাস নিরন্তর এই জাহাজের সীমাহীন নির্ভরতা। কারণ তাঁর মাথার ওপরে তিনি আছেন। .... তখনি মনে হয় একটা চাপা গোঙানি কোথাও থেকে উঠে আসছে। .... হিগিন্‌স্ কিছুই বুঝতে পারেন না। একেবারে হতভম্ব। বড়-মিস্ত্রি রিচার্ড এখনি এলিওয়ের কার্পেটের ওপর সংজ্ঞাহীন। .... আতঙ্কে বোধ হয় তার মাথা ঠিক ছিল না। উলঙ্গ হয়ে ছুটছিল, তারপর পড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছে। .... রিচার্ড জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সে আর কিছু বলতে পারছে না। সাদা চোখে চারপাশে খুঁজছে।" (তদেব, পৃ. ১৬৪)।

এদিকে কাপ্তানের নিজস্ব চিন্তা—"বনি যত বড় হচ্ছে এবং তিনি যত বুঝতে পারছেন বনি এই জাহাজে এখন মেয়ের মতো থাকতে চায়, তত যেন তিনি সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন।" (তদেব, পৃ. ১৬৪)।

বড়-মিস্ত্রি বলে সে ভূত দেখেছিল, স্টুয়ার্ড বলে, তার অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা। "কাপ্তান জানেন, যে কেবিনে রিচার্ড থাকে, ঠিক সেই কেবিনে লুকেনার আত্মঘাতী হয়েছিল। . . আর কাপ্তেন বোট-ডেকে ডেক-চেয়ারে ঘুমিয়ে আছেন।..... কী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলেন? কুয়াশা জালে কেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এলিস। কি করুণ আর বিষণ্ন মুখ!" (তদেব, পৃ. ১৬৭)।

কাপ্তানের মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগেকার কথা। তাঁর স্ত্রীর কথা। আর সমুদ্রে ভাসমান বোটে ছোটবাবু সহ কয়েকজন নাবিকের জাহাজ-অন্বেষণের বিবরণ। (পশ্য পৃ, ৪৮, ৩৫৭)।

কাপ্তেন স্যালি হিগিন্‌স্ কেন তাঁর জাহাজকে ইবলিশ মনে করেছিলেন, কেন ভাসমান বোটের নাগাল পাচ্ছেন না, কেন জাহাজটাকে অলৌকিক জলযান মনে হয়েছিল, সেসব কথা এই অংশেই পাই।

কাপ্তেন হিগিন্‌্{ তাঁর প্রথমা স্ত্রী এলিসকে নিয়ে একবার সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। পূর্বতন কাপ্তেন লুকেনারের অশুভ প্রভাব জাহাজে পড়েছে কি? আগুনের ফুলকি, ট্রানসমিটারে ভৌতিক সব আর্তনাদ, এবং সহসা সব আবার হাওয়া—কাপ্তেন লুকেনারের ছলনা নয় তা কে বলবে? তিনি যেন মৃত লুকেনারের উদ্দেশে বলছেন, আমি এ জাহাজ বন্দরে ভেড়াবই। তুমি কিছু করতে পারবে না। অন্ধকার আকাশের নিচে অন্ধকার জাহাজের স্টারবোর্ডে দাঁড়িয়ে হিগিন্‌স্ দেখলেন, ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এলিস, পাশে একটা লম্বা মানুষ। কিন্তু না, কেউ তো স্টারবোর্ডে নেই। হিগিন্‌সের সেই প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। তিনি তখন সিওল-ব্যাঙ্কের পুরোপুরি কাপ্তেন। কেউ যেন পিছনে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। কে? কে? না, কেউ নয়। সে রাতে কেবিনে হিগিন্‌স এলিসকে বুকে জড়িয়ে চুমো খাচ্ছিলেন। এলিস জানাল, সে রাতে সে ডেকে যায় নি। রাত বারোটা। কেবিনে এলিস জেগে আছে। তিনি পাগলের মতো এলিসের শরীর ছেনে আনন্দ নিংড়ে নিচ্ছিলেন। সে রাত থেকেই যেন লুকোচুরি খেলা, তিনি দেখতেন কখনও বোট-ডেকে, কখনও স্টার-বোর্ডে এলিস, পাশে একটি লম্বা মানুষ দাঁড়িয়ে। এলিস স্বামীকে বলে, তুমি ভুল দেখেছ। তখন অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউগুলো পার হয়ে এক অট্টহাসি সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কে সেই অট্টহাসি হাসছিল, তা হিগিন্‌স্ জানেন না।

এদিকে অন্ধকার সমুদ্রে বোটে ভাসমান ছোটবাবুসহ কয়েকজন নাবিক। তারা তার 'সিওল ব্যাঙ্ক'কে খুঁজে জাহাজে ফিরে যেতে পারছে না। তবে কি এই সমুদ্রে তারা তলিয়ে যাবে? হিগিন্‌স্‌-এর মনে হয় ছোটবাবু কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী, পরক্ষণেই মনে হয়, ছেলেটার মুখে অদ্ভুত সারল্য, তাকে সমুদ্রে ফেলে চলে গেলে তিনি বাকি জীবনে কোনো শান্তি পাবেন না। সেই অন্ধকার সমুদ্রে নাবিকরা তাদের জাহাজকে খুঁজে পায় না। পাঁচ নাবিক অবাক। কোথায় গেল তাদের জাহাজ? সঙ্গে দূরবীন নেই। এল-বি সেট নেই। রাত কেটে গিয়ে সূর্য উঠল। তাদের জাহাজ কোথায়? অবশেষে ছোটবাবু একটা অ্যালবাট্রস পাখি দেখতে পেল। তাকে অনুসরণ করেই জাহাজে তারা ফিরতে পারবে। আর যদি—যদি বোট শয়তানের প্রভাবে পড়ে যায়, তবে কেউ রক্ষা পাবে না। সেই নীল সমুদ্রে একমাত্র সচল কিছু ভেসে আসছে তাদের দিকে—লেডি-অ্যালবাট্রস আসছে। আমাদের নিতে আসছে—একথা বলে ছোটবাবু চিৎকার করে উঠল। আর মনে মনে বলল—বনি, আমি আসছি। দেখতে দেখতে তারা চলে এলো তাদের জাহাজের কাছে। একে একে উঠে এলো জাহাজে। আর তখনি বেতার-যন্ত্রে হেড ফোনে রেডিও অফিসার 'মেসেজ' পাঠায়—'সিওল-ব্যাঙ্ক বলছি। নেকস্ট্‌ পোর্ট অফ কল সামোয়া। ইয়েস, ক্যাপ্টেন হিগিন্‌স্‌ অফ হার কমান্ড।' হেড-অফিসে পৌঁছে যায় সেই বার্তা। তাহলে এস. এস. সিওল-ব্যাঙ্ক অলৌকিক জলযান নয়।

অজানা দূর সমুদ্রে যাত্রাকালে ক্যাপ্তেন দেখেন, দূরে একটা কালো প্রবালের খাড়া পাহাড়। জাহাজ তার দিকেই ছুটে যাচ্ছে। ছোটবাবু আর বনিও তা দেখতে যাচ্ছে। কাপ্তেন হিগিন্‌স্‌ ছোটবাবুকে সমুদ্র সম্পর্কে বলেন—'ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিংক।' হতে পারে না। কোলরিজ মিথ্যে কথা লিখেছিলেন। জল থেকে বঁড়শি দিয়ে তুলে আনবে প্ল্যাংকটন (শৈবাল জাতীয় ও প্রাণীজাতীয়)। তাই কাঁচা চিবিয়ে খাবে। তাতেই ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবারণ হবে। (পৃ. ৪৬৭)

শেষ দৃশ্য : 'সিওল-ব্যাঙ্ক' জাহাজ নীল আকাশের নিচে ভেসে যায়। ক্যাপ্তেন শুয়ে আছেন। তাঁর মৃত্যু আসছে। জাহাজ এখন ভাসমান কফিনের মতো। (পৃ. ৬৭২)।

চার

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ট্রিলজির শেষ পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান'। সোনার জীবনচরিত নিয়ে রচিত ট্রিলজির প্রথম দুই পর্বে পাঠক দেখেছেন কিশোর সোনাকে আর জাহাজের 'কোলবয়' ছোটবাবুকে। তৃতীয় পর্বে সে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। সে ঘুরে বেড়ায়, 'ঈশ্বরের বাগান'-এ ব্লার্বে লেখা আছে—"তিন পর্বে একই ব্যক্তিসত্তা ভিন্নতর সত্যে উদ্ভাসিত—যেমন একই শক্তি মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণে নানা ব্যঞ্জনায় নিত্য প্রকাশিত।' ১ম পর্বে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র পটভূমি—উদাসীন প্রকৃতি। ২য় পর্বে 'অলৌকিক জলযানে'র পটভূমি অনন্ত অসীম সমুদ্র। ৩য় পর্বে 'ঈশ্বরের বাগান', নগরজীবনের ও গ্রামজীবনের এক নীরস ইটকাঠের গদ্যময় জগৎ। সোনা কিংবা ছোটবাবু যেমন শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে

ক্ষত-বিক্ষত, তেমনি ক্ষতবিক্ষত শেষ পর্বের অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা, পৃথিবীর আদি গুজব—দুই-ই তাকে এই পর্বে তাড়া করছে।"

'ঈশ্বরের বাগান' সর্ববৃহৎ পর্ব, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২৪। পাঠক যদি ধৈর্য ধরে এই পর্বটি পড়েন তবে আবিষ্কার করবেন, হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের মূল সত্য উপন্যাস-শেষে বিবৃত নীলুর মৃত্যুকে ঘিরে। মঞ্জু, অতীশ শোনে শব সৎকারকালে ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠ, যাতে সৃষ্টির মূলকথা উচ্চারিত, মুর্শেদ মনে মনে বলে, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো—তিনিই মৃত্যু দেন, আবার জীবন দেন, আর তখনি ঘোরের মধ্যে পড়ে যায় অতীশ—সে দেখে মুর্শেদের এক নারী—কে সে? — খুবই চেনা সেই বনি—সে যেন বলছে অতীশকে—'প্রেইজ গড ফর এভার'। শবসৎকারের জন্য অগ্নি জ্বলে উঠেছে। অতীশ আর মঞ্জু চিতাগ্নির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই মন্ত্র শুনছে।

অবশ্যস্বীকার্য, 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাস পাঠককে জগৎ-ব্রহ্ম-কারণের উৎসে পৌঁছে দেয়। পাঠক যেন অনুভব করে অতীশ দীপঙ্করকে তাড়া করে ফেরে ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা।

উপন্যাসের সূচনায় দেখি—কলকাতায় এক বিশাল রাজবাড়ি। পূর্বেকার গরিমা অস্তমিত। কুমারদহ রাজবাটী। তার কুমারবাহাদুর (রাজেনবাবু)-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে অতীশ দীপঙ্কর। আজ সে এই বিগতগরিমা রাজবংশের এক বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে কাজে যোগ দেবে। সময়টা ১৯৬৪ সাল। রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'শিট মেটাল' কারখানার উৎপাদিত নানা রকমের কন্টেনার তৈরি ও বিক্রয়ের—এক কথায় এই ব্যবসার ম্যানেজার হিসেবে অতীশ কাজে যোগ দেয়। তার ঠাঁই হয় জোড়াগির্জার কাছাকাছি অবস্থিত কুমারবাহাদুরের বিশাল রাজবাটীর অন্দরমহলের সঙ্গে সংযোগকারী দু-তিনটি বিশাল ঘরে। এই অংশ থেকে সোজাসুজি অন্দরমহলে পৌঁছানো যায়। এখানে বাস করে' অতীশ আবিষ্কার করে কুমারবাহাদুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চলে আসে অতীশের এলাকায়, যেখানে অতীশের সঙ্গে থাকে তার স্ত্রী নির্মলা, ছেলে টুটুল, মেয়ে মিন্টু। তার বাবা চন্দ্রনাথ ভৌমিক থাকেন বেলঘরিয়ার উদ্বাস্তু কলোনিতে। তার বড় জেঠা—পাগল জেঠা বহুদিন নিরুদ্দেশ। তাঁর স্ত্রী, অতীশের বড়জেঠিমা একদিন তার কাছে এসে হাজির। যে মানুষটা বিশ-বাইশ বছর নিরুদ্দেশ, সেই বডজেঠার জন্য আর প্রতীক্ষা না করে পারলৌকিক কাজ সেরে ফেলার নিয়ম আজ বড়জেঠিমা মানতে বাধ্য হচ্ছেন। অপরদিকে অতীশের বাবা চন্দ্রনাথ ভৌমিক টুটুলের উপনয়ন দেবার নির্দেশে অতীশকে চিঠি লেখেন, একদিন পঞ্চতীর্থ পুরোহিতকে নিয়ে হাজির হন। তখন অতীশ বাধ্য হয়ে ছেলের উপনয়ন দেয়। তার বাবা মাঝে মাঝেই তাকে বেশি করে অর্থ সাহায্যের দাবি নিয়ে পত্র লেখেন। টাকার অনটন, তাই নির্মলা বর্ধমান থেকে গুসকরা হয়ে বলগণার গোরস্থান-অঞ্চলে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে চলে যায়। অতীশ ও ছেলে মেয়ে নির্মলাকে আটকাতে পারে না। প্রতি সপ্তাহান্তে নির্মলা আসতে পারে না। এতে অতীশ আর ছেলে মেয়ের কষ্ট হয়। তবু অর্থ-অনটন মেটাতে হবে বলে নির্মলা সেই দূরবর্তী গ্রামের মেয়ে-ইশকুলে চাকরিতেই থেকে যায়। অতীশের কাছে তার বাল্যসঙ্গিনী ফতিমা একদিন হঠাৎ এসে হাজির হয়। তার স্বামী পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিদেশ-বিভাগের অফিসার হয়ে কলকাতায় এসেছেন। ফতিমা সেখান থেকেই অতীশের কাছে হাজির হয়। আজ অতীশের

জীবনকে ঘিরে তিনজন—পত্নী নির্মলা, বাল্যসঙ্গিনী ফতিমা, আর অপর এক বাল্যসঙ্গিনী, কুমারবাহাদুর ঘরণী অমলা। 'শিট মেটাল' কারখানায় কুম্ভবাবুর দল দেদার চুরি করে, কারখানায় ক্রমাগত লোকসান হতে থাকে। অতীশ কুম্ভবাবুদের চুরি আটকাতে পারে না। তবু সৎ ম্যানেজার হয়ে কারখানাকে রক্ষা করতে হয়। কুমারবাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উদাসীন। অগত্যা অমলাকেই অতীশ কারখানার সংকটের কথা জানায়। কীভাবে রক্ষা করবে, কীভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করবে তা অতীশ বুঝতে পারে না।

৭২৪ পৃষ্ঠা-সংবলিত বিশাল উপন্যাস 'ঈশ্বরের বাগান' পড়তে পাঠকের ধৈর্য ও মনোনিবেশের অগ্নিপরীক্ষা হয়। বস্তুত তিন পর্বে সমগ্র 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ট্রিলজি বিংশ শতাব্দের ভারত ও পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সামাজিক চালচিত্র। জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এক অখণ্ড লৌকিক-অলৌকিক উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র এক চিত্রশালা।

'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাসে আমরা নায়ককে তিন রূপেই পাই—পূর্ববঙ্গের গ্রামের যৌথ পরিবারের কিশোর সোনা, মালবাহী সমুদ্রগামী জাহাজের 'কোল বয়' ছোটবাবু আর কলকাতার 'শিট মেটাল' কারখানার ম্যানেজার সংসারী অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। অবশ্যই এই তৃতীয় পর্বে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিকের বিচিত্র উপলব্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী দুই পর্বের অভিজ্ঞতা ফিরে ফিরে এসেছে। বস্তুত ৭২৪ পৃষ্ঠা জোড়া 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাস দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত জীবন-অভিজ্ঞতা—অকূল সমুদ্রে 'কোল বয়'-এর অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র সংসার-উদ্যানে সতত কর্মরত কারখানার ম্যানেজার অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিকের অভিজ্ঞতা।

কীভাবে এই সমান্তরাল দুটি কাহিনি প্রবাহিত, তা দেখা যেতে পারে। 'এস. এস. সিওল ব্যাঙ্ক' জাহাজের কাপ্তান হিগিন্‌সের মেয়ে—ছেলের ছদ্মবেশে বনির সঙ্গে 'কোল বয়' ছোটবাবুর অকূল সমুদ্রে ভেসে পড়ার কাহিনির পাশাপাশি প্রবাহিত কলকাতায় 'শিট মেটাল' কারখানার ম্যানেজার অতীশ ভৌমিকের সংসার যাত্রার বিচিত্র কাহিনি, যা শেষ হয়েছে 'বাংলাদেশে' (পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তান) অতীশের প্রত্যাবর্তনে, বাল্যসখী-মঞ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ও তাদের বাড়িতে অবস্থানে।

প্রথমে দেখি মালবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে কাপ্তেন হিগিন্‌স্ তার কন্যা বনি আর কোলবয় ছোটবাবুকে এক ভেলায় ভাসিয়ে দিলেন। সেই অনিশ্চিত সমুদ্রযাত্রা শেষ হয়েছে বনি আর ছোটবাবুর এক দ্বীপভূমিতে পৌঁছনোয়—সেখানেই বনির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ও ছোটবাবুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় জীবননির্বাহী অতীশের কাহিনির মাঝে মাঝেই সেই অনন্ত নিরুদ্দেশ সমুদ্রযাত্রা ফিরে ফিরে আসে (পশ্য ২৩৩, ২৩৪, ২৪৯, ২৫২, ৩১৭, ৩২৪, ৩৭২, ৩৭৩ সংখ্যক পৃষ্ঠাসমূহ)।

বনি নিরুদ্দেশ সমুদ্রযাত্রাকালে 'ছোটবাবু'কে বলেছিল—'Love does bring about justice at last if you only wait' (পশ্য পৃ ২৮০, 'ঈশ্বরের বাগান')। যখন খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে গেল তখন 'ছোটবাবু' সংগ্রহ করত সমুদ্রে ভাসমান জলজ 'প্ল্যাংকটন' যা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা-নিবারক। বনি তা খেতে চাইত না। সে কারণে সে ক্রমশ কাহিল হয়ে যাচ্ছিল। তাদের অনন্ত সমুদ্রযাত্রায় একমাত্র সঙ্গী—একটি অ্যালব্রাট্রস পাখি। সেই বিশাল

পাখি প্রতি সকালে তাদের ভেলার মাস্তুল থেকে উড়ে যেত। আবার সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে আসত। বস্তুত তার স্থল-অন্বেষণ ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করেছিল বনি আর ছোটবাবু। সমুদ্রের জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাদের দুজনের পোশাক ভিজে যেত, লবণাক্ত শরীর চিড়চিড় করত। তারা উলঙ্গ হয়ে সেই ভিজে জামা-প্যান্ট শুকিয়ে নিয়ে পরত। কতো দিন—আর কতোদিন তারা দুজনে এভাবে ভেসে যাবে? এই নিরুদ্দেশ-সমুদ্রযাত্রার কাহিনি অতীশের শিটমেটাল কারখানার ম্যানেজাররূপে কাজ করার ও বাল্যসখী বর্তমানে কুমারবাহাদুরের দ্বিতীয়া স্ত্রী অমলা ও পত্নী নির্মলা ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে জীবন-কাহিনির সমান্তরাল ভাবে চলে আসছে।

যে-সব পৃষ্ঠা-সংখ্যার সদ্য উল্লেখ করেছি, তা পাঠককে বারবার তাদের মালবাহী জরাজীর্ণ জাহাজে চড়ে দুনিয়ার বড় বড় বন্দরে পৌঁছনো, মাল নামানো ও ওঠানোর প্রসঙ্গের সামনে এনে ফেলতো। কখনো সবিস্তারে কখনো সংক্ষেপে।

সেই জাহাজের অন্যতম এঞ্জিন-ইনচার্জ, সাক্ষাৎ শয়তান, আর্চির সঙ্গে ছোটবাবুর সংঘর্ষের কথা, আর্চির বনিকে রেপ-করার প্রয়াস ও ছোটবাবুর বনিকে রক্ষা করার কাহিনি উঠে এসেছে। কারখানার বড় খরিদ্দার শেঠ পিয়ারীলালের ষড়যন্ত্রের কথা—ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর খালি কামরায় চারু নাম্নীকে একটি মেয়েকে তুলে দেওয়ার পিছনে যে কুম্ভবাবু ও পিয়ারীলালের ক্রূর ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিল, সেই প্রসঙ্গও। অতীশেব ভাগ্য ভাল, চারু তাকে প্রলুব্ধ করে নি, সে মাঝপথে কোনো স্টেশনে নেমে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গসূত্রেই এসেছে এঞ্জিন-ইনচার্জ আর্চির শয়তানির কাহিনি—

"এক সময় ছিল, আর্চি, এখন কি তবে অদৃশ্যলোক থেকে পিয়ারীলালের গলায় কেউ কথা বলে। সেই প্রেতাত্মা কি পিয়ারীলালের গলায় তার সঙ্গে কথা বলেছিল। মিন্টু টুটুল ভাল আছে তো। বিশাল এলাকা জুড়ে রাজবাড়ি। মাঠপুকুর, মেসবাড়ি, বাবুপাড়া, বাবুর্চিপাড়া, গোলাঘর, ভুট্টার জমি, সব মিলে এক অরণ্য। সেই অরণ্যে টুটুল মিন্টু নির্মলা যদি হারিয়ে যায়। আর্চির প্রেতাত্মা প্রলোভনে ফেলে দিতেই পারে। ....পুকুরে ডুবিয়ে টুটুল মিন্টুকে আর্চি যদি মেরে ফেলে বলে, ছোটবাবু, প্রতিশোধে আমি বনিকে রেপ করেছি। তুমি ট্রেনে চারুকে কী করেছ। ...আর্চির সেই তীক্ষ্ণ হাসি, বনি আমাকেও সেই প্রলোভনে ফেলে দিয়েছিল। কেবিনে ঢুকে গেছিলাম। তারপর সমুদ্রে থাকলে যা হয়, অমানুষ, এক নারী শুধু জাহাজে—বালিকা যুবতী হয়ে উঠছে। তুমি জানছ, সে বালিকা, আর আমি, আর সবাই জানত, কাপ্তানের ছেলে জ্যাক। পুরুষের পোশাকে বনি জ্যাক সেজে সবাইকে প্রতারণা করেছে।......না আর্চি, দোহাই তোমার, কেবিনে ঢুকে তুমি কেন তাকে রেপ করতে গেলে। কেন, কেন? মাথা আমার ঠিক ছিল না। আমি বালিশে তোমার মুখ চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ কবে দিয়েছিলাম। কেউ জানত না। কেবল তার সাক্ষী, আমি আর বনি। ঝড়ের সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। তারপর দেখি না আরও একজন টের পেয়ে গেছেন। তিনি কাপ্তান। শুধু বলেছেন, ছোটবাবু, উই শ্যাল হ্যাভ টু সাফার। ম্যান ক্যারিং দ্য ক্রস।.....মানুষ জন্মেই পিঠে ক্রস বহন করে বধ্যভূমির দিক এগোয়। ইট ইজ দ্য সিম্বল, ইট ইজ দ্য সাফারিং অফ হিউম্যান মানকাইন্ড।" (পৃ ২৩৩, 'ঈশ্বরের বাগান')।

মাঝে মাঝেই ধরতাই-এর এক একটা সূত্র লেখক দিয়েছেন, যা অতিবৃহৎ 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাসকে ধরে রেখেছে। যেমন,

"খাবার টেবিলে কুমারবাহাদুর ঠাট্টা করে বৌরানীকে বললেন, 'দ্যাশের পোলা কিডা কয়।'.... বৌরানী গম্ভীর হয়ে গেল বলতে বলতে। ওকে না আনলেই ভাল করতে। ওর বাবাকে চিনি। ওর জ্যাঠামশাইকে চিনি। সেকেলে মানুষ। ভাল মানুষ। অতীশও তাই।" (পৃ ৪৭, 'ঈশ্বরের বাগান')

বাল্যসখী ফতিমার কথা, মঞ্জুর কথা অতীশ বলেছে তার স্ত্রী নির্মলাকে।— "আমি তখন তোর চোদ্দ বছরের ছেলে। তবু কেন যে নিখোঁজ জ্যাঠামশাইর জন্য অর্জুন গাছে বার্তা রেখে এলাম, জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি—ইতি সোনা। আসলে ক্ষোভ থেকে। জ্যাঠামশাই ফিরে এলে যেন বোঝে হিন্দুদের জন্যও একটা দেশ আছে। ফতিমাকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, তোরা আমার কেউ না। তোদের দেশ আছে আমাদেরও একটা দেশ আছে। অথচ দ্যাখো ফতিমা না এলে আরোগ্য লাভ করতাম না। ধূপদানির হাত থেকে মুক্তি লাভ করতাম না।

বারবার ফতিমার কথা বলায় নির্মলা যেন রুষ্ট। ফতিমা না এলে তার জন্মান্তর ঘটত না—কিসের জন্মান্তর, এই যে আরোগ্য লাভ। ফতিমাই তো বলেছে, সব বলুন।..... আচ্ছা আমি বলছি, যেন ফতিমা সব জানত, বনির নিখোঁজ হওয়া, অ্যালবাট্রস পাখির মৃত্যু—সব যেন সে ধরিয়ে দিয়েছিল।....স্মৃতিবিভ্রম থেকে তাব উদ্ধার। জীবনের পাপবোধ থেকে আত্মরক্ষার উপায় সে বাতলে দিয়ে গেল। ...অতীতকে কে এত মনে রাখে। আপনার টুটুল মিন্টু আছে। তাদের কথা ভাববেন না। আর পাপ কার নেই? পাপ ভাবলে পাপ, পুণ্য ভাবলে পুণ্য।" (পৃ ৬২৯, 'ঈশ্বরের বাগান')

নির্মলাকে অতীশ আরো বলেছে, "মঞ্জু দেশ ছেড়ে এল না। এটাও বড় কম রহস্য নয়। ওর বাবা অবিনাশ কবিরাজ।" (পৃ ৬২৯)

সেই মঞ্জুর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিটা অতীশ পড়ছিল। স্ত্রী নির্মলা অতীশকে বলেছিল— 'যাও না, ঘুরে এস। মনটা ভাল হবে। নিজের দেশের মাটি কার না দেখতে ইচ্ছা হয়।'

তারপর কলকাতা থেকে অতীশ পৌঁছল তার গ্রামে। ইতঃমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছে (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। খান সেনাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা লড়াই দিয়েছে। সেই সংগ্রামে সাহায্য করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। লড়াই করেছে ভারতীয় ফৌজ। ভাষা আন্দোলনে (১৯৫২) যার সূচনা তার পরিণতি মুক্তিযুদ্ধের শেষে বাংলাদেশের জন্মে।

অতীশ গ্রামে গেছে। বাল্যসঙ্গিনী মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করেছে। শুনেছে তার এতদিনের জীবনের কথা। বাল্যসঙ্গী অবনী জোর করে তাকে ভোগ করেছে! তার ফলে মঞ্জু বাধ্য হয়ে অবনীকে বিয়ে করেছে। তার একটি ছেলের জন্ম হয়েছে। সেই ছেলে জন্মাবার পর থেকেই রুগ্‌ণ। অতীশ গিয়ে তাকে দেখেছে। মঞ্জুদের বাড়ির কোনায় একটি ঘরে ২৪ ঘণ্টা লুকিয়ে থাকে এক আর্মি ডেজার্টার মুর্শেদ। বাংলাদেশের লোক তাকে পেলে মেরে ফেলবে। মঞ্জুর বাড়িতে কাজ করে কেয়া। তার বাপ জলিল। সে-ই এখন কবিরাজি

করে। কেয়া অতীশকে তার সব পুরনো জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখায়। মঞ্জু কলকাতায় একে ওকে চিঠি লিখে অতীশের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখত। তার ফলেই সে অতীশের ঠিকানা পেয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল—'তোমার গ্রামে একবার ফিরে এসো।' আর্মি ডেজার্টার মুর্শেদকে লুকিয়ে রেখে মঞ্জু তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। মঞ্জুর মনে হয়েছিল, 'অবনীর মতো জোরজার করে, ছলেবলে কৌশলে কিছু মুর্শেদ কখনও করতে চায় নি। শুধু দু দণ্ড কথা বলতে পারলেই মুর্শেদ খুব খুশি থাকত।' (পৃ ৭০২)।

মুর্শেদের সঙ্গে অতীশের আলাপ হল। সে জানল, মুর্শেদও একদিন কলকাতায় থাকত। দেশ বিভাগের পরে চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। তারপর ইয়াহিয়ার সৈন্যদলের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানকে দমন করতে এসেছিল। তার মেজর যখন মঞ্জুকে ভোগ করতে চাইল, তখন সে মেজরকে গুলি মেরে দিল। তারপর থেকে সে আর্মি ডেজার্টার। আজ অতীশ এসেছে। সে যদি তাকে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতায় নিয়ে যায় তবে সে বেঁচে যায়। ছোটবেলায় সে থাকত ষষ্ঠীতলায়, কলকাতার উপকণ্ঠে। সেই ষষ্ঠীতলা তাকে ডাক দিত। (পৃ ৭০৬)

অতীশের মনে পড়ে যায়, ফেলে আসা সেই কৈশোরের কথা। আজ সে বাল্যসঙ্গিনী মঞ্জুর মুখোমুখি। মঞ্জুর বাচ্চা ছেলে হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী—মৃত্যুপথযাত্রী। শয্যাশায়ী নীলুর (মঞ্জুর ছেলে) শীর্ণ চেহারা দেখে অতীশ মনে মনে কষ্ট পায়। মঞ্জুর মা আত্মহত্যা করেছিল। তার বাবা অবিনাশ কবিরাজ চারপাশ থেকে গাছপালা সংগ্রহ করেছেন। পরিচর্যা করেছেন। অর্জুন, চন্দন, দারুচিনি, হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া গাছ চারপাশে রয়েছে। তা থেকেই তিনি কবিরাজি ওষুধ তৈরি করে চিকিৎসা করতেন। আজ তার নফর জব্বার সেই বিদ্যা আয়ত্ত করে চিকিৎসা করে। তারই মেয়ে কেয়া, মঞ্জুর একমাত্র সঙ্গিনী।

তারপর এলো সেই অনিবার্য ঘটনা। রাতে মঞ্জুর কথা, নীলুর কথা ভাবতে ভাবতে অতীশ ঘুমিয়ে পড়েছিল। "ঘুম ভাঙল কেয়ার চিৎকারে। কেয়ার আকাশ ফাটা আর্তনাদ 'মঞ্জুদি, নীলু নেই। নীলুর ছুটি হয়ে গেছে।' অতীশের বুকটা কাঁপছিল। ওর শরীরে ঠিক যেন শক্তি নেই। জানালায় ফাঁকা মাঠ। সকাল এবার হবে হয়তো। আর কেউ কাঁদছিল না। ছেলেমানুষের মতো কেয়ার কান্না, নীলুর ছুটি হয়ে গেছে, মঞ্জুদি শিগগির এসো।" (পৃ ৭১৭, 'ঈশ্বরের বাগান')

"মুর্শেদ এসে ডাকল। সোনাবাবু আসুন।....অতীশ দেখল, মঞ্জু নীলুর শিয়রে বসে রয়েছে। কেমন নির্বিকার। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি তাকে কিছুটা যেন নির্বোধ করে রেখেছে। কাঁদছে না। কেবল কেয়া নীলুর বুকের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আসলে মঞ্জু বোধ হয় জানত, এত বড় আঘাত সে সহ্য করতে পারবে না। কিছুটা সে সেজন্য কেয়াকে ভাগ দিয়ে দিয়েছে।...

অতীশের মনে হল, এ-ভাবে মঞ্জু পাথরের মতো বসে থাকলে খারাপ হতে পারে। ওর কাঁদা উচিত। এও হতে পারে, মঞ্জু সব বিলাপ আগেই সেরে রেখেছে। কারণ সে তার ভবিতব্য জানে। প্রতিদিন সে শোকের ভিতর থেকে আজ বোধ হয় ভাবছে ছুটি পেয়ে গেল।..... সে শৈশব থেকে যা কিছু নিয়ে বড় হয়েছিল, এই যেমন গাছ বড় হলে ডালপালা মেলে বড় হয়ে যায়, ঋতুতে ফুল ফল আসে আবার ঝরে যায়। তেমনি মঞ্জুর এখন সব ঝরে গেছে। সে যেন শৈশবের মঞ্জুর মতো! বলে উঠতে পারে সে, "যাবে

"সোনা ঘোড়ায় চড়ে, আমরা হাসান পীরের দরগা পার হয়ে যাব।" (পৃ ৭১৭)

কিশোর নীলুর মৃত্যুর পর কেয়া, মঞ্জু আর অতীশের প্রতিক্রিয়া—তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আলেখ্য এখানে আশ্চর্য কুশলতায় লেখক ধরেছেন। সেইসঙ্গে ইঙ্গিত আছে— সোনার সমগ্র জীবন-পরিক্রমা, জন্মমৃত্যুর লীলার সঙ্গে প্রাকৃতিক জীবনের (গাছপালা) লীলার সাদৃশ্য এবং জীবনের বিচিত্র লৌকিক-অলৌকিক উপলব্ধি। আর সেই সঙ্গে অখণ্ড বঙ্গ, খণ্ডিত বঙ্গ এবং দুই বঙ্গের টানাপোড়েন।

জীবনের একটি সামগ্রিক আলেখ্য তিন পর্বের উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে।

নীলুর মৃত্যু উপস্থিত চার জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি নিয়ে এসেছে। অতীশ দেখল, ভোররাতেই নীলু ছুটি নিয়েছে। তার মনে হল, ফুলের মতো ছেলেরা মরে গেলে মুখে কোন কষ্টের চিহ্ন থাকে না। সেখানে অতীশের দু ফোঁটা চোখের জল পড়ে গেল। কেউ দেখল না হয়ত। মুর্শেদ আর অতীশ ধরাধরি করে নীলুর দেহ বাইরের বারান্দায় নিয়ে যায়। মঞ্জু তার গভীর শোকে পাথর। কেয়া তার শোকে কাতর। তখন জব্বার বনের ভিতরে একটা সবুজ বৃক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মনে হল, এখানে এসেই কবিরাজ বংশ শেষ হয়ে গেল। মঞ্জুর পিতা অবিনাশ কবিরাজ যেন জব্বারকে বলেছিলেন, এবার থেকে এখানে, ব্যস এখানে, আর কোথাও তার যাওয়া হল না। জব্বারের মনে হল—"নীলুকে সে রক্ষা করতে পারে নি। ঈশ্বরের পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে কে আল্লা, কার আল্লা।" (পৃ ৭১৯)

জব্বার এখন কবিরাজ-পালিত দামি গাছগুলির মধ্য থেকে বেছে নিল চন্দন গাছটাই। সহকারীদের নিয়ে জব্বার চন্দনগাছটা ফালা ফালা করে কেটে ফেলল। এই চন্দনকাঠের ওপরেই নীলুকে শোয়ানো হবে। অতীশ আর মুর্শেদ দেখল, মঞ্জু নির্বিকার চুপচাপ বসে আছে। তারপর উঠে এসে উঠোন পেরিয়ে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে বলল—'এখানে নীলু তার বাবার পাশেই থাকুক। সোনার ঠাকুরদাকেও এখানে দাহ করা হয়েছিল।' (পৃ ৭২২)। অতীশের মনে হল, মঞ্জু যেন প্রাজ্ঞ রমণী—এখন সে বিচলিত নয়। অর্জুন গাছের নিচেই চন্দন কাঠের শয্যার উপর নীলুকে শোয়ানো হল। সেখানেই তার ঠাকুরদার শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এবার অতীশ, অখিলমাধব সেন-ছদ্মনামে ধুতিপরা মুর্শেদ আর মঞ্জু নীলুকে নিয়ে এসে চন্দনকাঠের ওপর শুইয়ে দিল। পুরোহিত মশায় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—ওঁ কেশবায় নম, মাধবায় নম। এবং কূপ, নদী, সমুদ্রের জলরাশির উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করো। অতীশ আর মঞ্জু হরিধ্বনি দিয়েছিল। পুরোহিত মশায় আব্রহ্মস্তম্বকে আহ্বান করে কুশাগ্রে জল সিঞ্চন করছেন আর পরম ব্রহ্মাকে স্মরণ করে সূর্য চন্দ্র জল বৃক্ষ আকাশকে আহ্বান করে মন্ত্র পড়লেন। আর মুর্শেদ মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করে তাঁরই মাহাত্ম্য উচ্চারণ করল মনে মনে। আর অতীশ আশ্চর্য এক ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। তার মনে হল, সে যেন দেখতে পাচ্ছে আর এক নারীকে—সে বনি। সে বলছে—প্রেইজ গড ফর এভার। নীলুকে ঘিরে তখন অগ্নি সর্বভূতে বিরাজমাত্র। মঞ্জু দেখছে— রাজস্বরূপ আধার, অগ্নিস্বরূপ জলাধারে ভস্মীভূত হচ্ছে। (পৃ ৭২৩-৭২৪)। এই মহৎ উপলব্ধিতে উপন্যাসের সমাপ্তি। [পশ্য গল্পের মোড়কে উপস্থাপিত স্মৃতিকথা 'জীবনের মাধুর্য', যা এই ট্রিলজির

সমরেশ মজুমদারের ট্রিলজি

এক

আমাদের চেনাকালের বাংলা কথাসাহিত্য-সংসারে সমরেশ মজুমদার (জন্ম খ্রি. ১৯৪২/১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) একটি পরিচিত নাম। তাঁর শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। সেদিনের কথা তিনি লিখেছেন একটি স্মৃতিচারণা তথা দুর্গা-সম্পর্কিত কূটজিজ্ঞাসায়—'নেই তাই খাচ্ছ' (আমার) পুজো নিবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ৩১ ভাদ্র ১৪১৩, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সংখ্যা)।

সমরেশ মজুমদার এই নিবন্ধে শৈশবের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন,—

"শৈশবে আমি ডুয়ার্সের চায়ের বাগানে থাকতাম। তখন ওই তল্লাটে একটাই পুজো হত। ঠাকুর গড়ার কারিগর আসতেন মাস দুই আগে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় বাঁশের গায়ে খড় লাগানো শুরু হত। একটু একটু করে চোখের সামনে প্রতিমা হয়ে দাঁড়াতেন দুর্গা, তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। রং, চুল এবং শেষে চোখ আঁকা শেষ হতেই জোরসে কাঁসর-ঘণ্টা বাজানো হত। বড়রা বলতেন, মায়ের প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। সেই বালকবেলায় মণ্ডপে দাঁড়িয়ে আমি কার্তিক-গণেশদের ভীষণ অপছন্দ করতাম। যাদের মা ও-রকম অসুরের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছেন, তারা কেন আমাদের দিকে পোজ মেরে তাকিয়ে আছে?....

অল্প বয়সে পুজো মানেই উৎসব। নতুন জামা, জুতো। শহরে আসার পরে পুজোর কদিন মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতাম।...

কিশোর বয়সে আগমনী গান শুনতাম। শ্বশুরবাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে আসছে মেয়ে। সেই মেয়েই আমাদের মা। মা উমা আসছেন, তাই কাশফুল আরও সাদা হয়েছে, আকাশ হয়েছে মন-কেমন করা নীল। ভোরের শিউলি ঘাসের উপর সাদা চাদর বিছিয়েছে। মা আসছেন। সে কী উন্মাদনা ছিল আমাদের। নতুন জামা, নতুন জুতো। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। শুধু নিজেদের প্রতিমা নয়, ঘুরে ঘুরে অনেক প্রতিমা দেখতাম তখন।.... কিন্তু, দশমীর সকাল থেকেই মন খারাপ হয়ে যেত। বিকেলে এয়োদের সিঁদুর পরানোর পরে মনে হত প্রতিমার চোখ ছলছল। প্রতিমা (নদীর) জলে পড়ার পর কী উচ্ছ্বাস!"

কিন্তু শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে আসবার পর সেই কিশোরের মনে দুর্গাপুজো সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জাগত। যৌবনে তা আরও বাড়ত। এই নিবন্ধে তারও বিশদ আলোচনা আছে, যার ফলে সমরেশ মজুমদার পরিণত বয়সে এই নিবন্ধে লিখেছেন—"ধন্দটা বাড়তে বাড়তে

এক সময় এল যখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। দেশজুড়ে বাৎসরিক পুতুলখেলা চলছে, চলুক না।"

একসময়ে যা ছিল আবেগ আর গদগদ ভক্তি, পরে তা হয়ে উঠল প্রশ্নসংকুল—এই ব্যাপারটা লেখকের ট্রিলজি 'উত্তরাধিকার-কালবেলা-কালপুরুষ'-এও আছে। দেশভক্তি, রাজনীতি, ১৯৪৭-এর পনেরই আগস্টে কৈশোরের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বয়স বাড়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টির বিভাজন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসনের পর যুক্তফ্রন্টের শাসন (১৯৬৭), তার অবসান, ফের কংগ্রেসী শাসন। আবার বামফ্রন্টের শাসন (১৯৭৭), নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭) : সব কিছুই চলে এল ট্রিলজিতে।

'উত্তরাধিকার' (প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬/১৯৭৯, চুয়াল্লিশ মুদ্রণ ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স), 'কালবেলা' (প্রথম প্রকাশ ১৩৯০/১৯৮৩, দ্বাবিংশ মুদ্রণ ১৪১১, আনন্দ পাবলিশার্স), 'কালপুরুষ' (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫। পঞ্চদশ মুদ্রণ ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স)। মোটামুটি ১৯৪০ থেকে ১৯৮৫—এই পঁয়তাল্লিশ বছরের কাহিনি—অখণ্ড ভারত থেকে খণ্ড ভারত। স্বাধীনতা, নানা রাজনৈতিক আন্দোলনে অস্থির পশ্চিমবঙ্গের কাহিনি এই তিন পর্বে প্রসারিত। শিশু অনিমেষ বড় হল, তার জীবনে এল মাধবীলতা, মাধবীলতার সন্তান অর্কের যখন জন্ম তখন নকশালকর্মী অনিমেষ জেলে, জেল থেকে যখন ছাড়া পেল তখন মাধুরীলতা তাকে নিয়ে এসেছিল বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনের বস্তিতে, আর সেখানেই অনিমেষ দেখল তার শিশুপুত্র অর্ককে। সেই অর্ক বড় হল, তার বাবার মতো সেও রাজনীতিতে এলো, ব্যক্তিজীবন নয়, গোষ্ঠীজীবনকে গড়ে তুলতে চাইল। আর পুলিশ মিথ্যা খুনের চার্জে ধরে নিয়ে গেল, তখন বস্তির পঞ্চাশটা পরিবারের নরনারী অর্কের মুক্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করল। থানা-হাজতে গারদের ওপারে অর্ক, এপারে মাধবীলতা। অর্কর মা তাকে আশীর্বাদ করল অর্কর সাহসিকতার জন্যে। পঞ্চাশটা পরিবারের সব ক'জন মানুষ যখন অর্কের মুক্তি দাবি করে আওয়াজ তুলল, তখন মাধবীলতা হাসল, বিড় বিড় করে বলল, 'অর্ক মানে সূর্য। সূর্যকে কি কেউ বন্দী করে রাখতে পারে?'

এই দীর্ঘ কাহিনির মধ্যে লেখক আমাদের সদ্য-ফেলে-আসা বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সাধারণ মানুষের নব জাগরণের কাহিনি পর্বে পর্বে চিত্রিত করেছেন। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকায় আংরাভাসা নদীর তীরে চা-বাগানের বাবুর ছেলে অনিমেষ কীভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল, তার বিচিত্র আখ্যান গড়ে উঠেছে এই তিন পর্বে। স্বর্গছেঁড়া বাগান থেকে জলপাইগুড়ি শহর, সেখান থেকে কলকাতায় এলো অনিমেষ। সেখানেই কলেজে তার রাজনীতিতে দীক্ষা, ধীরে ধীরে রাজনীতির সঙ্গে তার জড়িয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিচার ও বিবেচনা, সংশয় ও তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তার মনের বেড়ে-ওঠা, গড়ে-ওঠা, তারপর বীরভূমের গ্রামে নকশালবাদীদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই একটি আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে অনিমেষের দেখা—তার নাম মাধবীলতা মুখার্জি। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে

অনিমেষের জীবন জড়িয়ে যাওয়া, জঙ্গি আন্দোলনের কর্মী হিসেবে উত্তরবঙ্গেই পুলিশের হাতে তার ধরা পড়া, চার বছরের বন্দিজীবন। মুক্তি লাভ করে মাধবীলতাকেই সামনে দেখতে পেল এবং শেষ পর্যন্ত মাধবীলতার সঙ্গেই বেলগাছিয়ার বস্তিতে এল এবং চোখের সামনে দেখল এক শিশুকে—সে তারই ছেলে অর্ক। অনিমেষের জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়। সে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল তারই পুত্র অর্ক ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠছে। অনিমেষ আবার এলো জলপাইগুড়িতে তার পিতামহ সরিৎশেখরের বাড়িতে—সেখানে আছেন মাত্র দুটি নারী—তার ছোট মা আর তার পিসিমা। এখন সে কী করবে? তাদের ছেড়ে মাধবীলতা অর্কের সঙ্গে কলকাতায় চলে যাবে, না, জলপাইগুড়িতে থাকবে। অবশেষে মাধবীলতাকে নতুন করে দেখল, ছেলেকেও নতুন করে চিনল।

দুই

এবার পর পর তিনটি পর্বের বিশদ আলোচনায় যাই। আমার অবলম্বন, 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা' আর 'কালপুরুষ' উপন্যাসের শেষতম সংস্করণগুলি।

আমরা সূচনাতেই অনুধাবন করেছি, সমরেশ মজুমদার চা-বাগানে তার শৈশবের অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় অনিমেষ চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন।

ডুয়ার্সের চা-বাগানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য নিয়ে 'উত্তরাধিকার" উপন্যাসের সূচনা। যে পাঠক কখনো ডুয়ার্সের চা বাগান দেখেননি, তিনি প্রথম দেখায় এই দৃশ্যের মুগ্ধতায় ডুব দেবেন। আর যে পাঠক এই পরিবেশে গড়ে উঠেছেন বা কর্মোপলক্ষে চা বাগানে থেকেছেন, তিনি এই দৃশ্য-মাধুর্যে নতুন করে মুগ্ধ হবেন।

উপন্যাসের সূচনাটাই পাঠককে মুগ্ধ করে :

"শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে একটা ঠাণ্ডা আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য ক'দিন থেকেই আকাশের চেহারাটা দেখবার মত ছিল। চাপ-চাপ কুয়াশার দঙ্গল বাদশাহী মেজাজে গড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের উপর দিয়ে খুঁটিমারীর জঙ্গলের দিকে। বিচ্ছিরি, মন খারাপ করে দেওয়া দুপুরগুলো গোটানো সুতোর মত টেনে টেনে নিয়ে আসছিল স্যাঁতসেঁতে বিকেল—ঘষা সেলেটের মত হয়েছিল সারাদিনের আকাশ। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রত্যেকটা দিন যেন সূচের ডগায় বসে থাকত এই পাহাড়ী জায়গাটায়, কেবল বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। হয়তো ভুটানের পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।" (পৃ-৩)

এই প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রথমেই পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে দেয়। তারপরেই কাহিনির নায়ক শিশু অনিমেষকে আমরা দেখি। পুরো হাতওয়ালা হলুদ পুলওভার পরে অনি দেখল দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়িটার চারপাশে শুধু গাছ। সেই সব পেরিয়ে অনি এলো আঙরাভাসা নদীর ধারে। চকচকে ঢেউগুলো দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। ছোট ছোট নুড়ি বিছানো

হাঁটুজলের নদী।

চওড়ায় পনেরো ফুট, তীব্র স্রোতে এই নদীর একটি ধারা চলে গেছে নিচে চা-ফ্যাক্টরির ভিতর দিয়ে। ফ্যাক্টরির বিরাট হুইলটা চলছে এই স্রোতে। মদেসিয়া মেয়েদের হাঁটু অবধি নামা কালো কাপড়ের ঘেরটা পদ্মপাতার মত স্রোতে ভাসে। কাপড়টাকে ওরা বলে আঙরা। তা থেকে নদীর নাম আঙরাভাসা। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে এখনো বিজলি আসেনি। ফ্যাক্টরিতে ডায়নামো চালিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। কর্মচারীদের বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বালানো হয়।

অনির বাবা মহীতোষ স্বর্গছেঁড়ায় প্রথম রেডিও আনলেন। ব্যাটারিতে চলে। তিনি একটি লাউডস্পিকার লাগালেন। সন্ধেবেলায় সবাই এসে রেডিও শুনতে জড়ো হয়।

মহীতোষের কাছে অনি জানল, আজ রাতে নদী বন্ধ হবে। অনির পিতামহ সরিৎশেখর চা-বাগানের বড়বাবু। ছ'দিন বাদে অবসর নেবেন। অনি দাদুর কাছে আব্দার করে সে নদী বন্ধ হওয়া দেখবে। ফ্যাক্টরির হুইলটায় যখন আবর্জনা জমে জমে পাহাড় হয়ে যায় তখন বাঁধের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয়, আবর্জনা সাফ হলে ফের নদীর মুখ খুলে দেওয়া হয়।

সরিৎশেখরের তিন পুত্র—মহীতোষ, পরিতোষ, প্রিয়তোষ। মহীতোষের স্ত্রী মাধুরী। সরিৎশেখরের বড় মেয়ে হেম বিধবা। মেজ মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। মদেসিয়া ঝাড়ি অনিদের বাড়িতে কাজ করে। সে অনির ঝাড়িকাকু। সরিৎশেখরের বড় বউ, মেজ বউ মারা গেছে। সেজ মেয়ে হঠাৎ মারা গেল বাচ্চাকাচ্চা রেখে। বড় ছেলে পরিতোষ বখাটে ও নিরুদ্দেশ। সরিৎশেখরের নিত্যসঙ্গী বকু সর্দার। সরিৎশেখর বকুর ছেলে মাংরাকে জোর করে স্কুলে ঢুকিয়ে দেন। মিশনারী সাহেবরা তার নাম রাখে জুলিয়েন।

সরিৎশেখর ৪৫ বছর চাকরির শেষে অবসর নিচ্ছেন, সেদিনটা পনেরই আগস্ট, ১৯৪৭। ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে, দেশভাগ হয়ে যাচ্ছে, ব্রিটিশরা চলে যাচ্ছে ভারত ছেড়ে।

অনি দেখল, আশ্চর্য দৃশ্য। পুরো নদীটায় এই রাতে আর জল নেই। ভেজা পাথর নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে অজস্র মাছ। কুলি-কামিনরা লণ্ঠন, কুপি হাতে, অন্যেরা টর্চ হাতে পাথর শ্যাওলা সরিয়ে মাছ ধরছে। আবছা আলো-আঁধারে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে আঙরাভাসা নদীর জলহীন খাত। সরিৎশেখরের মনে হয়, তার ছোট ছেলে প্রিয়তোষ দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্বর্গছেঁড়ার মেয়ে তপুর সঙ্গে তার ছিল গোপন অভিসার।

পরদিনই পনেরই আগস্ট। সোনালি রোদ উঠেছে। ভবানী মাস্টারের আদেশে আজ স্কুলে গেল অনি। পরনে সাদা শার্ট কালো প্যান্ট। এক ঘরের স্কুল। ভবানী মাস্টার আর নতুন দিদিমণি তাদের পড়ান। ক্লাস ওয়ান আর টু। আর ক'দিন পরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন। ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) স্কুলে পালিত হল স্বাধীনতাদিবস। নতুন দিদিমণি বললেন—বন্দেমাতরম্। ছাত্ররা চিৎকার করে উঠল—বন্দে মাতরম্। ভবানী মাস্টার ছোট্ট ভাষণ দিলেন। স্থানীয় জননেতা বৃদ্ধ হরবিলাসবাবু পতাকা তোলায় আহ্বান করলেন অনিমেষকে। অনি কম্পিত হাতে রশি ধরে টানল। এপাশ থেকে একটা রঙিন পুঁটুলি উঠে

গেল, ওদিকের দড়ি নেমে আসছে। দড়ি ধরে অনি ঝাঁকুনি দিতেই স্বাধীন ভারতের পতাকা দুলতে লাগল আর ঝুরঝুর করে পড়ল একরাশ ফুলের কুঁড়ি। হরবিলাসবাবু বললেন, আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ পতাকা তুলছে। দিদিমণি শাঁখে ফুঁ দিলেন। চারধারে হই-চই চিৎকার। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। স্কুলমাঠ মুখরিত হল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে।

এখানেই দেশসেবার মন্ত্রে অনিমেষের দীক্ষার সূচনা হল। তারপর কদিন পরেই সরিৎশেখর জলপাইগুড়ি রওনা হলেন। সঙ্গে তার বিধবা মেয়ে হেম আর কিশোর অনিমেষ। স্বর্গছেঁড়া, আঙরাভাসা নদী, প্রিয় গাছপালা আর বাড়ি, বাবা আর মায়ের আছে বিদায় নিয়ে পিতামহ সরিৎশেখরের সঙ্গে লরিতে উঠে রওনা হল অনি। যাবার পূর্বে রুমালে অনি বাড়ির মাটি তুলে নিয়ে পকেটে পুরল। পিসিমা হেম, কাকু প্রিয়তোষ আর অনিকে নিয়ে সরিৎশেখর জলপাইগুড়ি যাত্রা করলেন। অনির মা মাধবীকে সরিৎশেখর বলে গেলেন—'তুমি দেখো, এই কাঁচা সোনাকে কিভাবে পাকা সোনা করে ফিরিয়ে দিই।' চা-বাগানের সব কুলি-কামিন জড়ো হয়ে সরিৎশেখরকে 'ফেয়ারওয়েল' দিল—'ধেউসি রে—আউর থোড়া—ধেউসি রে' বলে লরী ঠেলতে লাগল। (পৃ. ৪০)

সাধুচরণ হালদার জলপাইগুড়িতে ব্যবসায়ী। পূর্ব থেকেই তাকে দিয়ে জমি কিনে বাড়ি বানাবার ভার দিয়েছিলেন পুত্র প্রিয়তোষকে। শেষ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি চলে এসে নির্মীয়মাণ বাড়ির তদারকির ভার সরিৎশেখর সরিৎশেখর নিজেই নিলেন।

জলপাইগুড়িতে সরিৎশেখর ঘটা করে গৃহপ্রবেশ করলেন। স্বর্গছেঁড়া থেকে অনির মা মাধুরী আর বাবা মহীতোষ আর হালিশহর থেকে এলেন এক তান্ত্রিক শনিবাবা। তিনি বিচিত্র পদ্ধতিতে নতুন বাড়িকে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করতে 'বাড়ি বন্ধন' করলেন। সব কাণ্ড দেখে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ, বিস্মিত। শনিবাবার প্রশ্নের উত্তরে সরিৎশেখর জানালেন, সংসারে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন নাতি অনিমেষ। শনিবাবা তাকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'তোমার এই নাতি বংশছাড়া। যৌবন এলে একে আর তোমাদের মধ্যে পাবে না। এই ছেলে যতটা নরম হৃদয়ের ততটাই নির্দয়। জন্ম থেকে এই ছেলে প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে এসেছে। .... ও বিদ্বান হবে, কিন্তু আঠার বছর বয়সে রাজনৈতিক কারণে ওকে জেলে যেতে হতে পারে। ... এর জীবনে বহু নারী আসবে, নারীদের জন্য ও চরম দুঃখ পাবে, নারীদের জন্য কর্মভ্রষ্ট হবে। আবার কোন কোন নারীর জন্য ও মাথা তুলে দাঁড়াবে। সরিৎশেখর, একে তুমি কোন কাজে বাধা দিও না।' (পৃ. ৫৩)

আধুনিক উপন্যাসে তান্ত্রিকের এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনটা কী, সার্থকতা কোথায়—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তিন পর্বে বিভাজিত 'উত্তরাধিকার' ট্রিলজি পড়লে পাঠক দেখবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটাই সফল হয়েছেন। বস্তুবাদী পাঠক এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী মেনে নেবেন কিনা জানি না।

অনির পিসি হেমলতা, মা মাধুরী, বাবা মহীতোষ এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী মেনে নিতে রাজি হন নি।

সেদিনই শেষ বিকেলে মাধুরী ছেলেকে নিয়ে ছাদে এলেন, সেখানে ছিলেন মহীতোষ।

কথা বলতে বলতেই পূর্ণ গর্ভবতী মাধুরী ছাদেই পড়ে গেলেন। তখন আকাশে মেঘ, বৃষ্টি, আঁধার, আর তিস্তার বুকে কল্‌কল জলধারা। যা তীর উপচে করলা নদীতে এসে জলপাইগুড়ি শহরকে ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছে। চিলেকোঠায় যন্ত্রণাকাতর মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে হেমলতা বাবাকে বললেন, ডাক্তার ডাক, মাধুর বাচ্চা হবে। বিস্ফারিতনয়ন অনিমেষ দেখল শায়িতা মায়ের নিচের দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সেই স্রোত সরিয়ে দিতে গিয়ে অনির আঙুল চটচটে লাল হয়ে গেল। তারপরই এলেন ডাক্তারবাবু।

তখনই তুমুল বৃষ্টি এলো। করলা নদীর জল শহরে ঢুকে পড়ল। সরিৎশেখরের বাড়ির একতলার ঘরে জল ঢুকে পড়ল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাধুরী। ডাক্তার হতাশ হলেন। বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হেমলতার বুক-ফাটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। মাধুরীর শেষ ডাক—অনি, আমি তোর সঙ্গে থাকব রে। তুই জেলে গেলেও তোর সঙ্গে থাকব।

মাধুরী চলে গেলেন সেই দুর্যোগের রাতে। নষ্ট হয়ে গেল তার বাচ্চা। পরদিন সকালে দুর্যোগের শেষে মাধুরীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। চিতা জ্বালানো হল। 'মাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কেন?' মহীতোষ কষ্টের সঙ্গে বললেন, 'ভগবান কাউকে নিয়ে গেলে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

এই অভিজ্ঞতা অনিমেষকে গম্ভীর করে রাখল। তার বাবার মনে হল, এক রাত্রে ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। (পৃ. ৫৯)

শনিবাবার ভবিষ্যদ্বাণী, তারপরই মায়ের মৃত্যু অনিকে অনেকটাই বদলে দিল।

স্বর্গছেঁড়া ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই মহীতোষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। অনিমেষ জলপাইগুড়ি স্কুলে ভর্তি হল। তার পাশে আছেন পিসি আর দাদু।

স্বর্গছেঁড়ার অনিবাবা আর জলপাইগুড়ির অনিমেষ এক রইল না। পরপর এইসব ঘটনা অনিকে বদলে দিল। সরিৎশেখরের মনে হল, অদ্ভুত বদলে যাচ্ছে তার নাতিটা। (পৃ. ৬১)

অনিমেষের কাকা প্রিয়তোষ প্রায়ই বাড়ি থাকে না। স্কুলের নতুন স্যার তাকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আমাদের দুটো মা, একজন চলে গেলেন ঈশ্বরের কাছে, কিন্তু আর একজন মা তো আছেন। তিনি দেশমাতা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকেই বন্দনা করেছেন গানে—বন্দেমাতর্‌ম্‌।'

ছোটকাকা প্রিয়তোষ অনির কাছে একথা শুনে বলল, তোর নতুন স্যারটা কংগ্রেসী। প্রিয়তোষ অনেক রাতে এসে জানালায় টকটক করে শব্দ করে। অনি দরজা খুলে দেয়। খাটের তলা থেকে টিনের বাক্স খুলে কতকগুলো বই আর পত্রিকা নিয়ে চুপিচুপি চলে গেল। অনি দেখল—পত্রিকাটার নাম 'মার্ক্সবাদী'। সে রাতেই প্রথম ছোটকাকার মুখে সে শুনল, 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। কংগ্রেসীরা বদমাশ। তারা ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা নিয়েছে। আমরা এ স্বাধীনতা চাই না। কংগ্রেসীদের হাতে সরকার, তাদের পুলিশ আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত আছে।' সুভাষচন্দ্র বসুর দুরকম ছবি দেখেছে অনি—একটিতে সাদা টুপি মাথায় ধুতিপরা সুভাষচন্দ্র, অপরটিতে মিলিটারি জামা টুপিতে একটি হাত সামনের দিকে বাড়ানো। প্রিয়তোষ বলল—'আমরা সুভাষচন্দ্র বসুর লোক নই। আমরা কমিউনিস্ট। আমি যাচ্ছি অনি, তুই কাউকে বলিস না আমি এসেছিলাম।'

একথা বলেই প্রিয়তোষ সন্তর্পণে চলে গেল।

অনিমেষের মনে ধন্দ। এ স্বাধীনতা তবে সত্যি স্বাধীনতা নয়? নতুন স্যারের কথার সঙ্গে কাকার কথার মিল নেই কেন? প্রিয়তোষ ভুল করে সুটকেশ বন্ধ করে যায় নি। অনি তার মধ্য থেকে একটা নীল রঙের চিঠি তুলে নিল। একি, এ যে তপুপিসির হাতের লেখা—'তুমি যত ইচ্ছা রাজনীতি কর, আমি দায় তুলে নিলাম—তপু।'

এইসব ব্যাপার অনিকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। সে রাতেই পুলিশ এল। সরিৎশেখরের কাছে খোঁজ করল তার ছোট ছেলে প্রিয়তোষ কোথায়। তাদের কাছেই সরিৎশেখর প্রথম জানলেন তার ছোট ছেলে কমিউনিস্ট হয়েছে। সমস্ত বাড়ি তছনছ করে পুলিশ চলে গেল। (পৃ. ৬৬)।

পর পর এই সব ঘটনা অনিমেষকে বদলে দিচ্ছিল। সারা 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসটাই অনিমেষের আস্তে আস্তে বড় হওয়া আর বদলে যাবার কাহিনি। তার বাবার দ্বিতীয় বিবাহ, জলপাইগুড়ি স্কুলের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতার পর সারা দেশে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' ধ্বনি, কংগ্রেস আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান ও সংঘর্ষ—মাঝে মাঝে অনিকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

অনি ধীরে ধীরে জলপাইগুড়ি শহরটাকে চিনতে শুরু করল। এখানে প্রতি বছর বন্যা হয়। তিস্তার জল করলা নদীতে পড়ে, সেই জলরাশি শহরকে প্লাবিত করে দেয়। তিস্তা যখন শুকনো, তখন দূরে দেখা যায় বার্ণিশঘাট, ভাঙা ট্যাক্সিগুলো বিকট শব্দ করে ছুটে বেড়ায় তিস্তার বুকে। সরিৎশেখর দেখেন, তার নাতি খুব লাজুক আর গম্ভীর—এই বয়সে অনিকে তা মানায় না। তবু এই সামান্য জীবনেই অনিমেষ যেন অনেকটাই বিজ্ঞ হয়ে উঠছে। সরিৎশেখরের পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। মহীতোষকে লেখেন, সে সামান্য টাকা পাঠায়। আর চা-কোম্পানি সামান্য পেনসন পাঠায়। অনি টের পায়, স্বর্গছেঁড়ায় তার বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করছেন। নতুন স্যারের কাছে দেশপ্রেমের পাঠ নেয়, জলপাইগুড়ি জেলার নানা গল্প শোনে।

বিবাহের পর মহীতোষ নতুন বৌ নিয়ে সরিৎশেখরের বাড়িতে ছুটির দিন আসতেন। অনি অবাক বিস্ময়ে নতুন বৌ-কে দেখল, আর মনে হল একটা অল্প বয়সী মেয়ে তাকে পায়েসের বাটি হাতে দিচ্ছে। অনি তাকে কী বলে ডাকবে?—নতুন-মা?

এইসব কিছুই অনিকে আরো গম্ভীর চিন্তাশীল করে দেয়।

সরিৎশেখর হঠাৎ পথে দুর্ঘটনায় পড়ে গেলেন। তাকে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হল। দাদুর আদেশে অনিকে যেতে হল স্বর্গছেঁড়ায়। যাত্রাপথে ট্যাক্সিতে অনির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাকে অবাক করে দেয়—এক ট্যাক্সিতে চোদ্দ-পনের জন যাত্রী কীভাবে যে চড়ে, কীভাবে যে ট্যাক্সি চলে।

স্বর্গছেঁড়ায় বাড়িতে গিয়ে অনির আরো চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হল। মহীতোষ রাতে মদ্যপান করে বাড়ি ফেরেন। নতুন বউকে প্রহার করেন। তার সঙ্গে মহীতোষের ব্যবহারও বদলে গেছে। কীরকম রাগ রাগ গলায় মহীতোষ কথা বলেন অনি আর নতুন বউয়ের সঙ্গে। স্বর্গছেঁড়ায় পুরনো খেলার সাথীদের সবাইকে খুঁজে পায় না। দুচার জনের দেখা

হল। অনির মনে হল সে স্বর্গছেঁড়া থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। স্বর্গছেঁড়াও বদলাচ্ছে। আগে ছিল দু-একটা দোকান, এখন অনেক দোকান। স্বর্গছেঁড়া যেন রাতারাতি শহর হয়ে গেছে। (পৃ. ১১৯)। ঝাড়িকাকু, নতুন মা, পুরনো সব বন্ধু—এদের সঙ্গে আলাপ করে কতো নতুন নতুন খবর পায়। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় নতুন নতুন বিচিত্র সংবাদ শুনে অনি বিস্মিত হয়। তার বন্ধুরা এখন পাড়ার মেয়ে বউদের নিয়ে রসালো কথা বলে। অনির এসব ভাল লাগে না। তবে একটা ব্যাপার হল—বাবাকে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে সে অবাক হল। তার জন্য অল্পবয়সী নতুন মাকে দোষ দেওয়াটা ঠিক নয়, তাও বুঝল। (পৃ. ১২৭-১৩২)। বালিচর ভর্তি তিস্তা নদীতে আটদশজন মেয়ে প্রায় উদোম অবস্থায় ছোট ছোট কাঠ জল থেকে তুলছে। মন্টু, তপন তা দেখে উল্লাস করে, অনিমেষ লজ্জা পায়। কোনো কোনো বাড়ির বউ, মেয়েকে দেখে তারা অশ্লীল রসিকতা করে, অনিমেষ চিন্তিত হয়। (পৃ ১৩০-১৩৭)

জলপাইগুড়ি শহরে অনির জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিস্ময়—বহুদিন বাদে তার ছোটকাকা প্রিয়তোষ এল। তার বেশবাস চালচলন বদলে গেছে, বোঝা যায় তার হাতে এখন অনেক টাকা। সরিৎশেখরের প্রশ্নের জবাবে প্রিয়তোষ বলল, সে এখন আর কমিউনিস্ট পার্টি করে না। কী করে তা বলল। প্রিয়তোষের পূর্ব প্রণয়িনী তপুপিসি এখন স্বর্গছেঁড়ায় থাকে না—জলপাইগুড়িতেই থাকে—এ সংবাদে প্রিয়তোষের বিশেষ ভাবান্তর হয় না। অনেকদিন বাদে দু'জনের দেখা, কিন্তু এখন আর তপু চায় না প্রিয়তোষকে এবং প্রিয়তোষ চায় না তপুকে। (পৃ. ১৬০)

প্রিয়তোষের সঙ্গে অনি গেল এক বাড়িতে। সেখানে থাকেন হাতকাটা এক প্রবীণ আর একজন মধ্যবয়সী মহিলা। তেজেনদা আর রমলাদি। তারা প্রিয়তোষকে বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিলেন। প্রিয়তোষ গতকাল এসেছিল প্লেনে এক মন্ত্রীর সঙ্গে। তেজেনদা জানালেন, তারা আর প্রিয়তোষকে চান না। সময়টা ১৯৫২-র নির্বাচন-পরবর্তী সময়। প্রাক্তন কমিউনিস্ট প্রিয়তোষ আর এখন তেজেনদার সহযাত্রী নয়। (পৃ. ১৬৪)। পরদিন দুপুরের প্লেনে প্রিয়তোষ চলে গেল।

এইসব রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপ অনিমেষকে বিস্মিত ও আহত করছিল। সে বদলে যাচ্ছিল। জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম আকর্ষণ মেনকাদির বাড়ি। নতুন স্যার নিশীথবাবু সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ হল। মেনকা, উর্বশী, রম্ভা—তিন মেয়েকে দেখে অনিমেষ অবাক হয়। জ্বরতপ্ত রম্ভা সমস্ত শরীর দিয়ে অনিমেষকে চুমু খায়। (পৃ. ১৭৮) এই অভিজ্ঞতা অনির ছিল না। সে হতভম্ব হয়ে যায়। বিরাম করের বাড়ির এইসব অভিজ্ঞতা অনিকে অবাক করে দেয়। (পৃ. ১৭৫-১৮০)

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র অনিমেষকে পরিবেশ ও মানুষ অনেক দিক থেকেই বদলে দিচ্ছিল। অনিমেষ রাজনীতি, রাজনীতিক, ফ্যাশনসুন্দরী, নানা ধরনের যুবতী ও যুবক—অনেক কিছুই দেখছিল, ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল। তার ছোটকাকা প্রিয়তোষের ভোলবদল (কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করে মন্ত্রীর সঙ্গে প্লেনে আসা-যাওয়া), নতুন স্যার নিশীথবাবুর ভোলবদল (কংগ্রেসি রাজনীতি ছেড়ে বিরাম করের বাড়িতে নারীসঙ্গ)—এ

দুটি ঘটনা অনিমেষকে ধাক্কা দিয়েছিল মনের মধ্যে। উত্তরবঙ্গে আসন্ন হরতাল বানচাল করে দেওয়ার উপক্রমে পথের কাঁটা কমিউনিস্ট সুনীলদাকে হত্যা করে তারা যারা হরতাল চায়নি। সুনীলদার শোকার্ত বাবা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। অনিমেষ শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে গেল শ্মশানে। শোকযাত্রীদের স্লোগান—'সুনীল রায় তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলবো না।' 'স্বপ্নের মতো জ্যোৎস্নায় চুবানো শহরের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে অনিমেষের বুকের মধ্যে অদ্ভুত শিহরন জাগলো।' (পৃ. ১৯৯)। এইসব ঘটনা অনিমেষকে বদলে দিচ্ছিল।

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে অনিমেষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনিমেষ ছাড়া আর কেউ প্রথম বিভাগ পায় নি। দাদু সরিৎশেখর অনিকে কলকাতার কলেজে পড়াতে পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন। পিসি হেমলতা ও দাদু সরিৎশেখর অনিমেষের প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার কৃতিত্বে খুশিতে আপ্লুত হলেন। (পৃ. ২২৫)। এ খবর নিয়ে স্বর্গছেঁড়ার বাড়ি গেল অনি। খবর শুনে মহীতোষও আনন্দে আপ্লুত হলেন। (পৃ. ২৩৩)। এই প্রথম স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে শ্রমিকদের হরতাল দেখল অনিমেষ। লেবার স্ট্রাইকে অংশ না নেওয়ায় বাবুদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল চা-শ্রমিকেরা। তাদের নেতৃত্বে আছে জুলিয়েন, যে কুলির ছেলে হয়েও মিশনারিদের সাহায্যে স্কুলে পড়েছে। বাবা, ছোটমার সঙ্গে শ্রমিকদের ভয়ে অনিরা চলে এল আঙরাভাসা নদীর ধারে। ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত তিনজনে ফিরে গেল তাদের কোয়ার্টাস-এর দিকেই। পথে শ্রমিকদের নেতা জুলিয়েনের সঙ্গে দেখা হল। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি কেটে গেল। অনিমেষরা ফিরে এল তাদের কোয়ার্টার্সে। (পৃ. ২৪৬)। জুলিয়েন জানাল, সুনীলদাই তাদের মনে লড়াই-এর প্রেরণা দিয়ে গেছেন। জুলিয়েন তাকে দেখাল সুনীলদা-প্রদত্ত একটি মানুষের ছবি—নিচে লেখা 'কার্ল মার্ক্স': তার নিচে সুনীলদার নিজের হাতে লেখা—'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেলাম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।' বাড়ি ফিরে আসার জন্য নদী পেরিয়ে হাঁটছে অনিমেষ। চারদিকে শ্রমিকরা মাদল বাজিয়ে গান গাইছে। চা-বাগানে তাদের প্রথম লড়াই-এ জয় হয়েছে। 'মহাত্মা গান্ধি, সুভাষচন্দ্র ও কার্ল মার্ক্স—অনিমেষ যেন দুটো হাত দিয়ে এই তিনজনকে ছুঁয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিল। দেশ বড়, না দেশের মানুষ বড়।' (পৃ. ২৪৭)

অনিমেষ স্বর্গছেঁড়া থেকে জলপাইগুড়ি ফিরে যাচ্ছে বাসে চড়ে। কষ্ট হল বাবার জন্য, ছোটমার জন্য, স্বর্গছেঁড়ার প্রকৃতির জন্য। আঙরাভাসা নদীর জন্য। অনিমেষ চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। জলপাইগুড়ি শহরটা যেন স্বর্গছেঁড়াকে গ্রাস করে নিচ্ছে। (পৃ. ২৫২) বিকেল থেকেই জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল। আগামীকাল সারা বাংলা জুড়ে যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে, তাকে সফল করার জন্যই এইসব মিছিল। অনি মিছিলে দেখল বৃদ্ধ হরবিলাসবাবুকে, যিনি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বর্গছেঁড়ার প্রাইমারি স্কুলে শিশু অনিকে পতাকা তোলার জন্য আহ্বান করেছিলেন। আগামী কাল অনি কলকাতা যাবে। তাই তার পিসি পায়েস বানাতে ব্যস্ত। পথে নিশীথ স্যারের সঙ্গে দেখা। কংগ্রেস, না কমিউনিস্ট পার্টি — কারা ঠিক কথা বলছে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনি কথা বলল। দাদু

আর পিসিকে ছেড়ে কাল অনি কলকাতা রওনা হচ্ছে। দাদু তার এক বন্ধুকে চিঠি দিয়েছেন। তিনিই শিয়ালদা এসে তাকে নিয়ে যাবেন। ট্রেনে উঠে রওনা হল। ফাঁকা ট্রেন, ফাঁকা শিয়ালদা স্টেশন। অনিমেষের জীবনে শুরু হল নতুন পর্ব।

তিন

'কালবেলা' উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় পর্ব। অনিমেষ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে জনহীন শিয়ালদা স্টেশনে নেমেছিল। বাইরে উপদ্রুত কার্ফু-কবলিত কলকাতা নগর। সময়টা ১৯৬০ সাল। এবার অনিমেষ কোথায় যাবে? কী করে দাদুর পরিচিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাবে? পুলিশ-কবলিত আপার সার্কুলার রোডে সুটকেস বিছানা হাতে নেমে অনিমেষ ভুল করেছিল। তার পিছনে ধাওয়া করে আসছে পুলিশ। তা দেখে অনিমেষ দৌড়েছিল। পুলিশ গুলি ছুঁড়েছিল। অনির উরুতে গুলি লেগেছিল। সে পড়ে যায়। তারপর আর কিছু মনে ছিল না। সুবাসদা (তখন অপরিচিত) তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন এবং দাদুর পরিচিত দেবব্রতবাবুকে খবর দিয়ে দেন। তিন মাস হাসপাতালে ছিল অনিমেষ। তারপর থেকে দেবব্রতবাবুর বাড়িতে। তাঁর মেয়ে নীলা অনিকে বন্ধু করে নেয়, 'তুমি' থেকে 'তুই'- তে নেমে আসে। সুস্থ হয়ে সে চলে আসে দেবব্রতবাবুর বাড়িতে। তিনি মহীতোষকে খবর দেন। মহীতোষ কলকাতায় এসে ছেলেকে দেখে যান। খাদ্য-আন্দোলনের সময়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিল কলকাতায় সদ্য পা-রাখা অনিমেষ। দেবব্রতবাবুর বাড়ি ছেড়ে কলেজে ভর্তি হওয়া ও হোস্টেলে থাকার পর হঠাৎ রটে গেল, অনিমেষ খুব অ্যাকটিভ কমিউনিস্ট—খাদ্য-আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। অনিমেষের আপত্তি সত্ত্বেও বাম-রাজনীতি-করা ছাত্ররা তাকে 'হিরো' বানিয়ে দিল। হস্টেলে আফ্রিকান ছেলের কটূক্তিতে অনিমেষ তাকে মারতে গেছিল, একথাও রটে যায়। অনিমেষ বলে, 'তোমরা ভুল শুনেছ। আমার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কোন সম্পর্ক নেই।' ছেলেরা তা শোনে না। উল্টে বলে 'আপনি কলেজের ছাত্র-রাজনীতিতে আসছেন না কেন? এস. এফ. আই. সংগঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না কেন?' (পৃ. ৩৪)।

স্কটিশ চার্চ কলেজে এভাবেই অনিমেষ ছাত্রদের 'হিরো' হয়ে গেল। আপার সার্কুলার রোডে ট্রাম জ্বলছিল দাউ-দাউ করে। তাই রাস্তায় একা অনিমেষকে দেখে পুলিশ গুলি করে। হাসপাতালে আই. বি.-র লোক এসে তাকে সে-কথা বলে জেরা করছিল। তারা অনিমেষের কথায় বিশ্বাস করেনি, স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্ররাও তার কথা বিশ্বাস করে নি।

"জলপাইগুড়িতে যে সব চিন্তা-ভাবনা ওর মাথায় ছটফট করত সেগুলো এই (কলেজে পড়ার) চার বছরে অন্য চেহারা নিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিন পুলিশের ছোঁড়া বুলেটটা তার একদিক দিয়ে উপকারই করেছে। এই যে অতদিন বিছানায় শুয়ে থাকা, শরীর কাহিল হওয়ায় সতর্ক হয়ে চলাফেরা—এগুলো অনেক উদ্দামতাকে সংযত করতে সাহায্য করেছে। না হলে যে উদ্দীপনা প্রথমবার কলকাতায় আসবার সময় বুকে

আঁচড় কাটত সেটা তাকে এতদিনে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে। খোলা চোখেও যে অনেক সময় দৃষ্টি থাকে না—সেটা সেরকম সময় ছিল।" (পৃ. ৩৬)

এই উপন্যাসের লেখক জলপাইগুড়ি থেকে এসে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পড়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনের প্রক্ষেপ পড়েছে প্রথম দুটি পর্বে ('উত্তরাধিকার', 'কালবেলা')।

যে সুবাস সেন আহত অনিমেষকে রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল এবং তার সুটকেস-বেডিং হাসপাতালে দেখা করে দিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা হল পাঁচ বছর পরে। এখন অনিমেষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়ছে। হঠাৎ তার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট মোড়ে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার আনন্দ হল। 'সেই গেরুয়া পাঞ্জাবি আর পাজামা কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, মাথার চুল উস্কোখুস্কো।' (পৃ. ৩৯)। এই সুবাসদা অনিমেষের রাজনৈতিক জীবনে বড় ভূমিকা নেবেন, তখন সে কথা অনিমেষের মনে হয়নি।

সুবাসদা এবার অনিমেষকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্র-সংগঠনের (এস. এফ. আই) কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং অনিমেষের ইচ্ছে না থাকলেও তাদের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে সুবাসদা চা খেতে খেতে তাদের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে অনিমেষ বুঝতে পারল এইসব ছাত্র-কর্মী (ওরফে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা) জলপাইগুড়ির ছাত্রদের মতো নয়। এদের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা অনেক পরিণত, দল-চালানো-প্রক্রিয়া অনেক জটিল এবং কমরেডশিপের মধ্যে অনেক বিবেচনা লুকিয়ে আছে। সুবাসদা তাকে বোঝাল—'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' (পৃ. ৪২)। আলাপ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বিমানের সঙ্গে। সময়টা ১৯৬৪। এসময়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। উপলক্ষ চিন-ভারত সামরিক সংঘর্ষ। সি. পি. আই আর সি. পি. আই (এম)—এখানে দুটি আলাদা পার্টি। অনিমেষ বুঝল দুই দলের সম্পর্ক খুব মধুর নয়। আরো বুঝল, সুবাসদা, বিমান ও আরো অনেকে সি.পি.আই.এম-এর সদস্য। সুবাসদা জানালেন, 'আসলে পলিটিক্যাল কনশাসনেস ওর মধ্যে আসে নি বলে ও এখনও মনস্থির করতে পারেনি।' বিমানের অনুরোধে—'আপনি ভাবুন অনিমেষ। যদি কোনও ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকে তাহলে সরাসরি আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।' (পৃ. ৪৩)।সেখানে বসেই অনিমেষ জানল, সুবাসদা বীরভূমের গ্রামে গ্রামে কাজ করছেন। সে আরো শুনল—বাম এস. এফ. আই.-এর ছেলেরা কংগ্রেসী সংগঠন ছাত্র পরিষদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। বিমান আর মুকুলেশের মধ্যে এইসব কথাবার্তায় অনিমেষ চমকে গেল। বিমান সি. ইউ. ছাত্র ইউনিয়নের জি. এস.—সে সংবাদও শুনল। পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে তীব্র মন কষাকষি চলছে, এটাও অনিমেষ টের পেল।

তার এসব কথা ভাল লাগছিল না। কিন্তু যতই শুনছিল, দেখছিল, সে অবাক হচ্ছিল। বিকেল তিনটেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লনে' বাম এস. এফ. আই. সভা ডাকল। ইচ্ছে না

থাকলেও তাকে সে সভায় যেতেই হল। এবং সভার বক্তা বিমান তাকে হতচকিত করে শ্রোতাদের জানাল—'বন্ধুগণ, বর্তমান কংগ্রেস সরকার দেশের অর্থনীতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা, সব জায়গায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে চান যাতে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ছাত্র পরিষদের বন্ধুরা সেই কাজই করছে। আমি আপনাদের সামনে এরকম একটি জঘন্য কাজের নমুনা উপস্থিত করতে পারি। এই সরকারের পুলিশ, ছাত্র পরিষদের পুলিশ যে কত নির্মম তার শিকার আমাদের এক ছাত্রবন্ধু, যিনি তার জীবনের অমূল্য একটি বছর হারিয়েছেন। কমরেড অনিমেষ, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে এগিয়ে আসুন।' (পৃ. ৫৩)

সুদীপ এসে হতবাক অনিমেষকে টেনে নিয়ে গেল সামনে। অনিমেষের সব প্রতিবাদ বিফল হল। সে বাধ্য হল, প্যান্টের ভাঁজ ফেলতে ফেলতে হাঁটুর ওপরে উঠে এল তার প্যান্ট। তেলতেলে বীভৎস চামড়াটা (গুলিবর্ষণের ফল) সবাই দেখল। পর মুহূর্তে অনিমেষ প্যান্টের ভাঁজগুলি নামিয়ে দিল। বিমানের ভাষণ চলল—'যারা গুলি করেছিল তারা জানে না বীভৎস চিহ্নটা আগামীকালের একজন সৈনিক তৈরি করে দিয়েছে।' (পৃ. ৫৪)

সুদীপ সভাশেষে অনিমেষকে বলল—একদিনেই তুমি হিরো হয়ে গেলে। এবং পাকেচক্রে সে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হয়ে গেল।

'কালবেলা' উপন্যাসের এধরনের নানা বক্তব্য নিয়ে আপত্তি উঠবেই। তাই ভূমিকায় লেখক লিখেছেন—''উত্তরাধিকার'-এর পর 'কালবেলা' লিখতে গিয়ে আমাকে এই সময়টাকেই (ষাটের দশক) বাছতে হয়েছে। আমি যেভাবে দেখতে চেয়েছি তার সঙ্গে অনেকেরই মতে মিলবে না, মিলতে পারে না। ওই সময়টাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম এই দাবি করি না, কিন্তু আঁচ গায়ে না লাগুক, মনে লেগেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার সময়ে আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেউ কাউকে স্বীকার করতে চায় না। অতএব আমার বিশ্বাসটাই আমার কাছে সত্য।'

আরো লিখেছেন, 'কালবেলা' কি রাজনৈতিক উপন্যাস? আমি জানি না। আরো জানিয়েছেন " 'কালবেলা' ভালবাসার উপন্যাস। দেশ, মানুষ এবং নিজেকে।"

লেখকের এই কৈফিয়তের পর পাঠককে ভাবতে হয়—যে যার বিশ্বাস মতো দেশ, কাল, পরিবেশকে দেখতে পারে।

এই ঘটনাটার পর একদিনেই অনিমেষ সকলের পরিচিত হয়ে গেল। আলাপ হল অনেকের সঙ্গে। বেশকিছু ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করল। অনিমেষ ক্রমশ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে গেল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আন্দোলন, বিক্ষোভ, পুলিশের কাঁদানে-গ্যাস ছোঁড়া, লাঠি দিয়ে মারা—এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে চলে ঘটনাপ্রবাহ আর ছাত্র-আন্দোলন তাল রেখে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের হাত ধরে এগিয়ে চলে।

এরই মধ্যে অনিমেষের জীবনে এল নতুন অধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. এফ. আই-এর ডাকা ক্লাস বয়কট ও ধর্মঘটের আহ্বানে সব

ছাত্রছাত্রী সাড়া দেয় নি। কলেজ স্ট্রিটে ট্রাম পুড়ছে, পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে। হঠাৎই একটা রণাঙ্গন হয়ে উঠছে কলেজ স্ট্রিট আর আশুতোষ ভবনের চত্বর। এরই মধ্যে এখনকার ছাত্রনেতা অনিমেষকে তাদেরই ক্লাসেরই এক ছাত্রী ডাকল। তার তীক্ষ্ণ চোখাচোখা প্রশ্নে অনিমেষ প্রায় নাজেহাল। মেয়েটিকে এতদিন দূর থেকেই দেখেছে। আজ কথা বলতে গিয়ে যে টের পেল মেয়েটির কত সিরিয়াস, বুদ্ধিমতী। পুলিশের সঙ্গে ভিয়েতনাম সমর্থনকারী ছাত্রদের সংঘর্ষ লেগে যায়। একদিক থেকে টিয়ার গ্যাস, অপর দিক থেকে ইট আর বোমা। ট্রাম জ্বলছে, টিয়ার গ্যাসে চোখ জ্বলছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ গিজগিজ করছে। ছাত্র-সংগঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। এবার তারা সরে গেল। শেষ বিকেলে অনিমেষ আবার সেই বুদ্ধিমতী ছাত্রীটির মুখোমুখি। সে তাকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল। মেয়েটির শাণিত বুদ্ধি, উজ্জ্বল দুটি চোখ আর তীক্ষ্ণ কথায় সে চমকে যায়। কথা কাটাকাটি হয়। শেষপর্যন্ত ছাত্রীটিকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছতে যায়। মেয়েটি একটু হাসে, তারপরই তীক্ষ্ম বাক্যে খোঁচা দেয়। মেয়েটি যাবে বেলঘরিয়া। তাকে ট্রেনে তুলে দেয় অনিমেষ। 'আমি মেয়ে এটাই কি আপনার কাছে সব? একবারও আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না।' অনিমেষ উত্তর দিতে পারল না। মেয়েটি নিজেই জানাল, 'আমার নাম মাধবীলতা মুখার্জি'। 'মাধবী'? 'উঁহু ফুল নয়, আমি শুধুই লতা, মাধবীলতা।' ট্রেন ছেড়ে দিল। অনিমেষ এতই মুগ্ধ ও চমকিত যে ট্রেনটার চলে যাওয়া যেন দেখতে পেল না।' (পৃ ১৩৩)

এই শুরু। হাতিবাগানের নতুন হোস্টেলে অনিমেষ সেই রাত কাটায় বিনা ঘুমে। চোখ বন্ধ করলেই আগুনের ফুলকি নেচে যায়। আর চোখ খুলতেই যার মুখ—সে মাধবীলতা। তাকে অনিমেষ চেনে না, জানে না। তবে সে যে নরম আর বোকা নয়, তা অনুধাবন করেছে অনিমেষ। তার মনে হল এ মেয়ে একেবারে আলাদা, সে দ্যুতি ছড়ায়।

পরদিন সকালে আর এক চমক। তার দাদু সরিৎশেখর তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অনিমেষ সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়। যে-কথা শুনল, তাও কম বিস্ময়কর নয়। অসুস্থ জ্বরতপ্ত হাতে দুটি ঝোলা। মাথা কামানো। তাকে সে তেতালার ছাদে নিজের ঘরে নিয়ে এল। সে শুনল, তার দাদু গয়া থেকে আসছেন। নিজের শ্রাদ্ধ করে এলেন গয়াতে। ডাক্তার দেখে গেলেন, 'মনে হচ্ছে তিনচার দিন কিছু খান নি। এঁকে বিশ্রামে রাখুন। হরলিকস বিস্কিট মিষ্টি ফল খেতে দিন।' তারপর ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে গেলেন। দুপুর ঘন হলে আচ্ছন্ন সরিৎশেখর চোখ খুললেন। এখন তাঁর কথা শুনে অনিমেষ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল (পৃ ১৪২)। দাদু যে তার বিশাল আশ্রয়, একথা ভেবে সে মনে মনে আন্দোলিত হল। দুনিয়াতে যদি কেউ তার সবচেয়ে আপনজন থাকে, তাহলে তিনি তার দাদু সরিৎশেখর। সন্ধ্যের পর দাদু উঠে গেলেন। সেই সন্ধ্যাতেই হাতিবাগানের মোড়ে দেখা হল অনেকদিন বাদে সুবাসদার সঙ্গে। পরের ঘটনাবলী দেখাবে সুবাসদার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা হল এবং আশ্চর্যের কথা, ঘনিষ্ঠতা হল মাধবীলতার সঙ্গে।

সুবাসদার সঙ্গে আলাপে সে জানল, সুবাসদা এখন দল থেকে বিতাড়িত, কারণ অন্যপথের পথিক হয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি কেন ভাগ হল?—চিনা সমস্যা? মোটেই

না। সুবাসদারা এখন নতুন পথে যাচ্ছেন। এদেশের কমিউনিস্টরা আইনসম্মত গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী। সুবাসদারা এখন এই মত মানেন না। হোস্টেলে ছাদের ঘরে ফিরতেই দাদু জানালেন তিনি আগামী কালই নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে ফিরে যাবেন। এবং তা'ই করলেন। সরিৎশেখরের কথায় অনিমেষের মনে হল, দাদু এখন অনেক দূরের মানুষ। সেই সাত বছর বয়সে স্বর্গছেঁড়া থেকে জলপাইগুড়িতে দাদুর কাছে এসেছিল। দশ বছর ছিল তাঁর কাছে। এখন সে দাদুকে চেনে না। পরদিনই দাদু চলে গেলেন। (পৃ ১৫৭)।

সরিৎশেখর চলে যাবার পূর্বে জানিয়ে গেলেন, তিনি নাতির সব খবরই রাখেন, সে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে, লেখাপড়া করছে না। কোষ্ঠীর লেখা অনুযায়ী সে রাজনীতি করবেই। সরিৎশেখরের প্রশ্ন—'কী জন্যে তুমি রাজনীতি করবে? কেন করবে? কার জন্য করবে। এ দেশে কেউ দেশের কথা ভাবে না। তোমরা নানান জিনিস দিয়ে প্রতিমা বানাও শুধু প্রতিমার জন্যে, ভক্তিটুকুই তোমাদের নেই।' (পৃ ১৫৭)

পাঠকের মনে পড়ে যাবে উপন্যাসলেখকের দুর্গাপুজো নিয়ে লেখাটির কথা, যা এই নিবন্ধ-সূচনায় উদ্ধার করেছি। অনিমেষ আর তার সৃষ্টিকর্তা লেখক, দুজনে তো কাছাকাছি এসেছে।

এখন একদিকে সুবাসদার টান, অপরদিকে মাধবীলতার টান। দুই টানে অনিমেষ সাড়া দেয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-রাজনীতি-করা নেতা ও কর্মীদের জানায়, তাদের কাজকর্মে তার আর সম্মতি নেই। সে ইচ্ছে করেই সরে যেতে চায়। পরদিন আবার কলেজ স্ট্রিটে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ। পুলিশ ধরল কেবল তাকেই। বাকিরা পালিয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সে থানায় এলো। পুলিশ সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তার একটা জবানবন্দী নিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেই তাকে ছাত্রনেতা সুদীপ জানাল, সুবাসদা থেকে দূরে থেকো। তার সেদিনই বসন্ত কেবিনের দোতলায় দেখা হল মাধবীলতার সঙ্গে। জানল, মাধবীলতা তার অপেক্ষায় বসে আছে, তারই ইচ্ছেয় এক ছাত্র-বন্ধু তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। মাধবীলতা জানাল, সে নিজের জন্য এই প্রথম কিছু চেয়ে প্রার্থনা করেছে এবং তা সফল হয়েছে। একথা শুনে অনিমেষ বুক ভরে নিশ্বাস নিল। 'ওর কষ্ট এখন পরম পাওয়ায় নতজানু—'আমি কিন্তু ভরসা করতে শিখলাম'। (পৃ ১৭২) এই প্রথম অনিমেষ তাকে 'লতা' বলে ডাকল। লতার চোখে জল এল। পেটভরা খাবারের অর্ডার দিল অনিমেষের জন্যে, আর বলল—'লতা বড় জড়িয়ে যায়, বিরক্তি আসবে না তো কখনও?' (পৃ ১৭৩)।

জলপাইগুড়ি থেকে সরিৎশেখরের চিঠি এল। বোঝা গেল, হোস্টেলে সহবাসীদের থেকে দাদু তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে গেছেন। চিঠিতে শীতলতা ছড়ানো। অনিমেষ আবার বুঝল, তার কাছ থেকে দাদু সরে যাচ্ছেন।

"এখন প্রতিটি দিন শুরু হয় বুকজোড়া এক ধরনের চাপ নিয়ে। সে চাপ বুক থেকে সরে না যতক্ষণ মাধবীলতাকে সে না দেখছে। একটু একটু করে মাধবীলতা তার রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।..... মাধবীলতাকে সে তার সব কথা বলেছে। মা যে-রাতে মারা গেলেন সেই বর্ণনা শোনার সময় মাধবীলতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।" (পৃ. ১৭৫)

কফি হাউসের দোতলায় মাধবীলতার সঙ্গে অনিমেষের কথা হয়। পরস্পরকে নিঃশেষে জানা, চেনা ও গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হয়ে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। মাধবীলতাকে অনিমেষ তার জীবনের সব কথাই বলেছে। মাধবীলতাও তাকে সম্পূর্ণ ভালবাসে, আর সে জন্যই অনির রাজনীতিতে এতো জড়িয়ে যাওয়ায় ভয় পায়। যদিচ কখনো তাকে নিষেধ করে না। 'অনিমেষ যখন ছায়া চায় তখন সে ছায়া দেয়; কিন্তু যেই কুঁড়েমি করে তখনই রোদে পুড়িয়ে মারে।' (পৃ ১৭৬)। মাধবীলতাকে দেখার পর অনিমেষের জীবনের গড়ে ওঠা একাকিত্বের দুর্গ ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

এর পর উপনির্বাচনের কাজ নিয়ে অনিমেষ এল উত্তরবাংলায়। কংগ্রেসের সঙ্গে সি. পি. এম প্রার্থীর নির্বাচনী লড়াই। অনিমেষের নতুন অভিজ্ঞতা হল। কলকাতা থেকে আসা এক প্রৌঢ় নেতা সৌমেন সেন এসেছেন নির্বাচন-পরিচালনা করতে। নির্বাচনক্ষেত্রটি পশ্চিম দিনাজপুরে। মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু ভোটার। তাই দু পক্ষই মুসলমান প্রার্থী দিয়েছেন। এ ব্যাপারটায় অনিমেষ চিন্তিত হল। উত্তরবঙ্গে গ্রামে গ্রামে মুসলমান ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়াটা অনিমেষের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। বাস্তব অভিজ্ঞতা আর আদর্শের ভিত্তিতে গড়া চিন্তালোক যে এক নয়, তা অনিমেষ বুঝল।

অনিমেষ একদিন নির্বাচনক্ষেত্র দাসপাড়া থেকে হঠাৎ বাসে উঠে রওনা হল জলপাইগুড়ি। শহরের দোকানে রামবাবুর কাছে শুনল তার দাদুর কানের লতিতে কুষ্ঠ হয়েছে। সত্যি? সে দাদুর বাড়ি পৌঁছল। দাদু স্বীকার করলেন তার কুষ্ঠ হয়নি। পিসি হেমলতা তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

অনিমেষ চলে গেল স্বর্গছেঁড়া। দেখা হল বাবা আর ছোট-মার সঙ্গে।

অনিমেষ ফিরে এল কলকাতায়। দেখা হল বিমান আর সুদীপের সঙ্গে। এবার কলকাতায় ফিরে তার মনে হয়েছিল তাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি যে রাজনীতি করতে হবে। (পৃ ২১৫)। আস্তে আস্তে অনির মনে হতে লাগল, এদেশে রাজনীতিটা ফাঁকিবাজি ফক্কিকারি। দেশের মঙ্গলের কথা কেউ ভাবে না, কেবল পার্টির কথা। কংগ্রেস ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে সরাতে চাইছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার করে ছাত্ররা ভিয়েতনামের জন্যে টাকা তোলার প্রোগ্রাম নিল। দলের সমর্থক প্রগতিবাদী নট-নাট্যকার-পরিচালকের কাছে তারা গেল এবং তাঁর দ্বিচারিতা সহজেই বুঝতে পারল অনিমেষ (পৃ ২১৯-২২১)।

লেখক এখানে সরাসরি সি.পি.এম-এর আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতাদের আক্রমণ করেছেন। আশ্চর্যের কথা, ৪০ বছর ধরে যিনি গানের ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটালেন সেই সলিল চৌধুরীর কথা একবারও বললেন না। তাঁর গানে সমানে পালাবদলের, প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের সাঙ্গীতিক আলেখ্য পাওয়া যেত। প্রগতিশীল নাট্যব্যক্তিত্বর দ্বৈতসত্তার পরিচয় পেয়ে অনিমেষ পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। (পৃ ২২১)। অনিমেষ এখন বিশ্বাস করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করার ক্ষমতা কমিউনিষ্ট পার্টির নেই (পৃ ২২২)। মাধবীলতাও সে-কথা বুঝতে তাকে বলে। (পৃ ২২৪)

মাধবীলতার পারিবারিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। এম. এ. পরীক্ষা না দিয়ে বাপের

পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করার প্রস্তাবে সে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়ে। কলকাতায় একটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে ওঠে।

দেশ গড়ার জন্য বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করে 'বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা।' সে অনিমেষকে ছায়া দেয়, ভরসা দেয়, প্রেরণা দেয়। হঠাৎ মস্কো-ফেরত ছোটকাকা প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে হতভম্ব হয়ে যায়। তাঁর কাছে অনিমেষ স্বীকার করে সি. পি. এম দলের কাজকর্ম তার ভাল লাগে না, অথচ উপায় নেই (পৃ ২৩২)। ছোটকাকা এখন মস্কোবাসী। তার কথায় অনিমেষ অবাক হয়, আবার ছোটকাকা সম্পর্কে মোহভঙ্গও হয়।

শেষ পর্যন্ত অনিমেষ সুবাসদার সঙ্গে বীরভূম চলে গেল। সুবাসদা এখন নকশালবাদী বা সি. পি. এম. (এম. এল)। আশ্চর্যের কথা, এই উপন্যাসে একবারও চারু মজুমদারের নাম নেই। সুবাসদা তাকে দিয়ে গেল একটি প্রচারপত্র। তা থেকে জানল চীনের পথই মুক্তির পথ। তারপর অনিমেষ পড়ল, জানল মাও-জে দং-এর 'লংমার্চ'-এর কথা (পৃ ২৪২)। এই বর্ণনাটি চমৎকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিমেষ সোজাসুজি সুদীপকে জানাল—'আমার মনের সঙ্গে আপনাদের কাজকর্ম মিলছে না।' (পৃ ২৪৩)।

সি. পি. আই (এম. এল) বা জনবাদী শক্তির কাজকর্ম দ্রুত ভারতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল (পৃ ২৭৩)। তাদের নেতা মহাদেবদা। সুবাসদা যাচ্ছে বীরভূমে, অনিমেষ যাবে শিলিগুড়িতে। এবার সোজাসুজি শ্রেণীশত্রু খতম করার মুহূর্ত এসেছে। মাওবাদ-এর কথা প্রচার করে সি.পি. এম. এল (পৃ ২৯৪)। শুরু হয়ে গেল নকশালবাড়ি আন্দোলন (পৃ ২৭৯)। জোতদার খতম করো, শ্রেণীশত্রু খতম করো। এই কাজেই অনিমেষ গেল বীরভূমের গ্রামে। তার পূর্বে বোলপুরে শ্রীনিকেতনে একটি খালি বাড়িতে এক রাত রইল মাধবীলতা আর অনিমেষ, এবং খুব আবেগ কামনা ভালবাসার সঙ্গে দু'জনে যৌন মিলনে পরস্পরকে গ্রহণ করল (পৃ ৩৩১)। তারপর অনিমেষ চলে গেল শ্রেণীশত্রু খতম করার কাজে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে পড়ল। বিচারহীন দীর্ঘ বন্দিজীবন কাটাল। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে অনিমেষরা মুক্তি পেল—১৯৬৭ সালে (পৃ ৩৪২)। উত্তরবঙ্গেই অনিমেষরা শ্রেণীশত্রু খতম করার কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এতদিন বাদে মুক্তি পেল। পুলিশের অত্যাচারে অনিমেষ প্রায় খোঁড়া। ক্রাচ বগলে তাকে হাঁটতে হয়। অনিমেষ কলকাতায় এলো মাধবীলতার সঙ্গে। বেলগাছিয়ায় তিন নম্বর বস্তিতে একটা ঘর নিয়ে থাকে স্কুল-মাস্টারনী মাধবীলতা। সেখানে পৌঁছবার আগে অনিমেষ তাদের পুত্রসন্তানের কথা জানল। বস্তির ঘরে এলো একটি শিশু—অবিকল শিশু অনিমেষ। অনিমেষকে তাদের ছেলেকে জড়িয়ে ধরল (পৃ ৪১২)। 'কালবেলা' এখানেই শেষ।

চার

'উত্তরাধিকার' (১ম পর্ব) ও 'কালবেলা'-র (২য় পর্ব) পর 'কালপুরুষ' (৩য় পর্ব)। যে ঘটনাস্রোতের সূচনা হয়েছিল আঙরাভাসা নদীর তীরে স্বর্গছেঁড়া গ্রামে নায়ক অনিমেষের জন্মলগ্নে (১৯৪০), তা পরিণতিতে উপনীত হ'ল পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তির ক্ষমতা দখলের পরে পরেই। প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ প্রবাহিত জীবনধারার সামগ্রিক পরিচয় তিনটি পর্বে বিধৃত। "সত্তর দশকের অগ্নিস্রাবী রাজনৈতিক পথ পরিক্রমার শেষ পর্বে 'কালবেলা'র নায়ক অনিমেষ আশা করেছিল তার পুত্র অর্ক তার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিশানটি শক্ত হাতে বহন করে নিয়ে চলবে। কিন্তু সমকালীন অন্তঃসারহীন কুটিল রাজনীতি এবং পঙ্কিল সমাজব্যবস্থা অর্ককে করে তুলেছিল অন্ধকার অসামাজিক রাজত্বের প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু তার রক্তের মধ্যে ছিল অনিমেষের সুস্থ আদর্শবাদ এবং তার মা মাধবীলতার দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সংমিশ্রিত উপাদান সেই হেতু তার বোধোদয় ঘটতে বিলম্ব হয়নি।"

গ্রন্থ-পরিচায়িকার এই বক্তব্য কীভাবে 'কালপুরুষ' উপন্যাসের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার বাঁকে বাঁকে রূপায়িত হয়েছে তা জানতে পাঠকমন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে। আলোচ্যমান তিন পর্বের মধ্যে এই শেষ পর্ব-ই লেখকের পরিণত জীবনভাবনা ও শিল্প-সচেতনতার স্বাক্ষর বহন করে। লেখক এই পর্বের সূচনায় কবুল করেছেন এটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, ভালবাসার উপন্যাস। নিজেকে, মাকে ও দেশমাতৃকাকে ভালবাসার উপন্যাস। এই মন্তব্য অর্থবহ, লেখক শেষপর্যন্ত জীবনকে রাজনীতির উর্ধ্বে স্থাপনা করেছেন, মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়েছেন।

'কালপুরুষ' উপন্যাসে উঠে এসেছে নানা সম্পর্কের বিচার—স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক, পুত্র ও পিতার সম্পর্ক, পুত্র ও জননীর সম্পর্ক। এখানেই শেষ নয়—পরিচিত পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, এবং সর্বক্ষেত্রেই সম্পর্কের বিচিত্র রূপায়ণে যুক্ত হয়েছে সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র-পিতা-মাতার অন্তঃকরণে রক্তক্ষরণ হয়েছে। প্রাত্যহিক মলিনতা ও একঘেয়েমির মধ্যে যখন সম্পর্ক-স্রোতে ভাঁটার টান ধরেছে, তখনই এক একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দূর হয়েছে মলিনতা, ভাস্বর হয়ে উঠেছে মানবিক সম্পর্কের চাপা-পড়া মহিমা, যা পরস্পরকে কাছে টানে।

আলোচ্যমান তৃতীয় পর্বে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কলকাতার যে অস্থির বল্‌গাহীন উদ্দাম জীবন রূপায়িত হয়েছে, তা আমাদের চেনাকালের ছবি। এবং সে ছবি এত জীবন্ত, প্রত্যক্ষ ও এই মুহূর্তে সজীব যে তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আদর্শভ্রষ্টতা, নীতিভ্রষ্টতা, ক্ষমতার অলিন্দের পিচ্ছিল পথে হাঁটা জীবনে অবনমন আর ইতরতার মেল-বন্ধন—তা আমাদের এতই চেনা যে আমরা কিছুতেই তাকে অস্বীকার করতে পারি না। লেখকের কুশলতা এইখানে যে তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন—ব্যক্তি ও পরিবেশকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আমাদের চেনা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে ঈর্ষা, হিংসা, ইতরতা ও স্থূলতায় বিপর্যস্ত হতে দেখেছেন। ক্ষমতালোভী রাজনীতিক ও

হিংসাশ্রয়ী মাস্তানবাহিনী—উভয়কেই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

উপন্যাসের শেষভাগে উঠে এসেছে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন। এই ট্রিলজির প্রথমটির নাম 'উত্তরাধিকার'। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কিসের উত্তরাধিকার, কার উত্তরাধিকার। তার পরিচয় কী।

'কালপুরুষ' উপন্যাসের শেষাংশে অনিমেষ এই 'উত্তরাধিকার' শব্দটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। জলপাইগুড়িতে সরিৎশেখর-নির্মিত বাড়িতে বসে অনিমেষ নিঝুম সন্ধ্যায় তাই ভাবছিল—

"ঘরে বসে অনিমেষ উত্তরাধিকার শব্দটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কিছু রেখে গেলে তবেই পরের পুরুষ সেটি পায়। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তি, স্থাবর কিংবা অস্থাবর, রক্ষা করাই কর্তব্য। কিন্তু আগের পুরুষ যদি কিছুই না রেখে যায়? যদি একটা বিরাট শূন্য ছাড়া অতীতের কাছ থেকে কিছুই না পাওয়া যায় তবে? এই বাড়ি-ঘর হয়তো খুব সাধারণ জিনিস। কিন্তু সরিৎশেখরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, একটা গোপন অনুচ্চার ভালবাসা, মহীতোষের নীরব আত্মোৎসর্গ যা তিনি তাঁর বাবার জন্যে অকাতরে করে গেছেন, ছেলের জন্যে প্রতিদান না চেয়ে নিঃশেষ হয়েছেন, সেগুলোর মূল্য এর পরের পুরুষরা জানবে না। কারণ অনিমেষরা এগুলোর কিছুই ওদের দিয়ে যেতে পারবে না। অতএব অর্ক কোন অর্থেই কারো উত্তরাধিকারী নয়। এই শব্দটাই তাই স্থবির হয়ে যাবে একসময়।" (পৃ. ৩৬৯)

জুলিয়েনের সঙ্গে অনিমেষ হাত মিলিয়েছিল। উত্তর বাংলার গ্রামের গরিব মানুষদের নিজস্ব সমস্যা আছে। সেগুলি নিয়েই প্রথম কাজ শুরু করতে হবে। উত্তরবাংলার চা-বাগানগুলোর অধিকাংশ মানুষ বাঙালি নয়। এই দেশের মাটিতে তাদের একশ বছর আগে রাঁচি-হাজারিবাগ থেকে ধরে আনা হয়েছিল। এরা নিজেদের পশ্চিমবঙ্গীয় বলে মনে করে না। এরা আর পুরনো বাসস্থানে ফিরে যেতে পারে না। এদের মধ্যে তেমনভাবে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয় নি। এই মানুষগুলো চা-বাগানের মালিকদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত। তাই এদেরও সংগঠিত করতে হবে।

শীতের রাতে অনিমেষ-জুলিয়েনরা গোপন বৈঠকে বসেছিল তিস্তার বাঁধ পেরিয়ে জঙ্গলে। জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলা নিয়ে তাদের আলোচনা হয়।

অপরদিকে বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনের তিন নম্বর বস্তির একটি ঘরে মানুষ-হওয়া অর্কের সামনে নেই কোনো উজ্জ্বল আদর্শ। তার মা মাধবী স্কুলে পড়ান। খুব কষ্ট করেই তিনি ছেলেকে মানুষ করেছেন। অথচ সেই ছেলে স্থানীয় মাস্তান-বাহিনীর একজন হয়েই দিন কাটায়। লেখাপড়া থেকে দূরেই থাকে। পাড়ার মাস্তানদের সঙ্গে তার যেমন ভাব-ভালবাসা তেমনই ঘৃণা। এবং মাঝে মাঝে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে অনিমেষের বন্দিদশা শেষ হয়েছিল। এই বন্দিদশায় অনিমেষ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তার কারণ জলপাইগুড়িতে এক ধনী মাড়োয়ারি বাড়িতে সশস্ত্র হামলা। তার নেতা ট্রেনে উঠে পালাতে পেরেছিলেন, অনিমেষ পারেনি, এবং তারই ফলে কারাগারে টানা অত্যাচারে সে খঞ্জ। আজ সে দু বগলে ক্রাচ ছাড়া চলতে পারে না। জেল থেকে

মুক্তি পাবার পর মাধবী তাকে এই তিন নম্বর বস্তিতেই নিয়ে এসেছিল। স্কুলে পড়ানো ও টিউশন করে নিজেকে যতটা পরিমাণে সম্ভব বঞ্চিত করে মাধবী স্বামী পুত্রের মুখে অন্ন জোগাত। তারপর কলকাতা থেকে মাঝরাতে একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সে সরিৎশেখরের বাড়িতে তার বাবা, ছোট-মা ও পিসিকে রেখে কলকাতায় এসেছিল।

'কালপুরুষ' উপন্যাসে মাধবীলতার একক সংগ্রামের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। খঞ্জ স্বামী আর মাস্তান পুত্রের মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে সে নিজেকে বঞ্চিত করছিল। স্কুলের এক সহকর্মিণীর কাছ থেকে মোটা টাকা ধার করে খঞ্জ স্বামীর চিকিৎসা করিয়েছিল। মাসে মাসে একটা অঙ্ক ঋণশোধ হিসেবে তাকে দিতে হত। তার ফলে সে কিছুতেই তিন জনের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে পারছিল না। কর্মহীন স্বামী অনিমেষ আর লেখাপড়া থেকে দূরে চলে যাওয়া মাস্তান পুত্রকে (অর্ককে) একটা সুস্থ সচ্ছল স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে যেতে পারছিল না। মাধবীর স্বেচ্ছা-বঞ্চনা, আধপেটা খাওয়া, স্কুলে পড়ানো, টিউশন—এই সংগ্রাম সম্পর্কে অনিমেষ অর্ক সচেতন হয়নি। সচেতন হল তখন যখন মাধবী অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল এবং ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে অর্ককে বাধ্য করলেন। জানা গেল তার পেপটিক আলসার হয়েছে এবং বাঁচার আশা ক্ষীণ।

সারা উপন্যাস জুড়ে এই ছোট পরিবারটির (অনিমেষ-মাধবী-অর্ক) সংকট ও সংগ্রাম উপস্থাপিত হয়েছে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে। সেই প্রেক্ষিতে নেই কোনো শান্তি, আছে পদে পদে লড়াই, অশান্তি, হত্যা, হিংসা, প্রতিহিংসা। এই রক্তক্ষয়ী স্পন্দিত উত্তাল পটভূমিকে লেখক চমৎকারভাবে এঁকেছেন। এই সময়টা এত অস্থির ও ক্ষতবিক্ষত যে ব্যক্তিমানুষ শান্তিতে বাঁচতে পারে না।

এলাকা দখলের লড়াই যেমন রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচিতে আছে, তেমনি এইসব দলের পক্ষপুষ্ট থাকা অথবা না থাকা মাস্তানবাহিনীর তেমনি পারস্পরিক তীব্র হিংস্র লড়াই আছে। যা আজও এই মুহূর্তের কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে আছে। মাধবী শত প্রয়াস সত্ত্বেও তার পুত্র অর্ককে এই মাস্তান-চক্রের আওতার বাইরে আনতে পারে না। বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনের তিন নম্বর বস্তির কোনো ছেলে এই মাস্তানি-আঙিনার বাইরে যেতে পারে না। এবং বস্তির মেয়েগুলিও পারে না। ছেলেগুলি হয়ে ওঠে মাস্তান—তোলাবাজ। দোকানে ও ধনীর বাড়িতে হামলা, পারস্পরিক ছুরি, বোমা ও পিস্তলের অবাধ ব্যবহার কলকাতার পাড়াগুলিকে সদা সন্ত্রস্ত রাখে। এবং তা বেড়ে যায় শতগুণ যখন কোনো কোনো এলাকায় ভদ্র আবাসন ও বস্তি পাশাপাশি থাকে। নিজ পাড়ায় এলাকায় এই মাস্তানদের দৌরাত্ম্য, পুলিশের অনৈতিক সমর্থন, যা টাকা আদায়ের ফন্দি মাত্র—দুয়ে মিলে একাকার হয়ে যায়।

অর্ককে নিয়ে অনিমেষ-মাধবীর মধ্যে তর্ক, মনোমালিন্য ঘটে। কর্মহীন বোঝামাত্র—এছাড়া অনিমেষ আর কিছু নয়, একথা অনিমেষকে মাধবী বলতে পারে বড় জ্বালায় (পৃ. ৬৪)। অনিমেষের স্বগতচিন্তা; 'আমি শালগ্রামশিলা! কি আশ্চর্য! আমি সেই অনিমেষ মিত্র যে উত্তাল আন্দোলনে এক সময় শামিল হয়েছিল, সে নেহাতই

জড়ভরত। ......এখন সে প্রকৃত অর্থেই দায় ছাড়া কিছু নয়।' (পৃ. ৬৬)। অনিমেষের স্বগত-চিন্তা তার পারিবারিক সংকটের চেহারাটা বার করে আনে—'এই বস্তির ঘরে অনেকদিন কেটে গেল। কত বছর? হিসেবের দরকার নেই, অর্ককে দেখলেই তো বোঝা যায়। চুপচাপ নিঃসঙ্গে কাটিয়ে যাওয়া! নিঃসঙ্গ?... অনিমেষের নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে কেন?........এই শরীরের এই অবস্থায় কাউকেই নিজের অস্তিত্ব জানাতে চায় না সে। বাবার সঙ্গে তার আবাল্য যে ফাঁক ছিল সেটা তখন আরও বড় হয়ে গিয়েছে। ছোট মায়ের কথা মনে পড়ত কিন্তু নিজের শরীর নিয়ে কারো দ্বারস্থ হওয়া মানে তাকে বিব্রত করা, মাধবীলতা যেচে যা কাঁধে নিয়েছে, অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোনো যুক্তি ছিল না। তাই এই বস্তির ঘরে এক ধরনের স্বেচ্ছা নির্বাসনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ল সে।' (পৃ. ৬৬)

আর অর্ক? 'বাবা, তুমি মানুষ মারতে?' 'মানুষ মারতাম?' অনিমেষ অবাক। 'কে বলল?' 'শুনেছি।' 'কে বলেছে তোকে এসব কথা?' 'আমার ক্লাসের একটা ছেলে। নকশালরা নাকি দুমদাম মানুষ মারতো। তাই নকশালদের পুলিশ মেরেছে। তাই?' অনিমেষের খুব রাগ হয়ে যেত। ও তখন অর্ককে নিয়ে পড়তো। খুব বিশালভাবে ওকে নকশাল আন্দোলনের লক্ষ্য বোঝাতো। কিন্তু সেটা শুরু করলেই ছটফটানি আরম্ভ হত অর্কর। কিছুতেই কোন গভীর কথাবার্তা পছন্দ হত না তার।' (পৃ. ৬৭)

আর মাধবী? 'তাদের দুজনের আশা ভরসা অর্ক। ওর জন্যেই বেঁচে থাকা যায়। বাইরের হৈ-চৈ থেকে মন সরিয়ে এনে অর্ক পড়াশুনা করুক। মাধবীলতা কিছুদিন বাদেই এখান থেকে উঠে একটু ভদ্র পাড়ায় চলে যাবে। তখন আর অসুবিধা হবে না অর্কর।' (পৃ. ৬৯)

কিন্তু অর্ক মা'র কথা শুনছিল না। 'মায়ের কথা তাকে শুনতে হচ্ছে কিন্তু বিলাসবাবুর কারখানা ছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতে পারছে না।' (পৃ. ৬৯)

'আমার পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না।' অর্ক মুখ ফেরাল। যেন দম বন্ধ হয়ে গেল মাধবীলতার।....... 'কি ভাল লাগে?' 'জানি না।' (পৃ. ৬৯)

এইসব সংলাপ পাঠককে বুঝিয়ে দেয় বাবা মা পুত্র—তিনজনের মধ্যে রয়েছে দূরত্ব, মনে হয় তা লঙ্ঘন করা যাবে না। মাস্তানদের সঙ্গে মিশে কলকাতার অপরাধ-জগতের যেসব ঘটনা জেনেছে অর্ক, তা লেখক নিপুণভাবে দেখিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। মাধবী কী করে অর্ককে এই অপরাধ-জগৎ থেকে ফেরাবে?

বস্তির মেয়ে ঝুমকির পিছু নিয়ে অর্ক জানল ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে নাচের স্কুলে ঝুমকি হয়েছে মিস ডি। হারটা উদ্ধার করতে গিয়ে অর্ক আরেক জগতের সন্ধান পেল। সে অবাক হয়ে গেল। চিনল আরেকজনকে—মিস টি। কলকাতায় অভাবী মেয়েরা কীভাবে নাচিয়ে হয়, দেহ-ব্যবসা করে তা জেনে অর্কের সঙ্গে পাঠকও অবাক হয়ে যায়।

তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে তার বাবার কাছে এসেছে বাবার ছোটকাকা—এ ব্যাপারটা দেখে অর্ক অবাক হয়ে যায়। প্রিয়তোষ মিত্রকে দেখে মাধবী ও অনিমেষ—দুজনেই বিস্মিত হয়ে যায়। এবার প্রিয়তোষ এসেছেন ন্যু-ইয়র্ক থেকে, মস্কো থেকে নয়। অনিমেষের

অবাক হতে আরও বাকি ছিল। তাঁর কাছেই জানল স্বর্গছেঁড়ায় তার বাবা প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছে। অনিমেষের পনের বছরের ছেলে অর্ককে দেখে প্রিয়তোষ অবাক হলেন। পার্ক হোটেলে গিয়ে প্রিয়তোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর মিস টি (তৃষ্ণার) খোঁজে মিস্ ডি (ঝুমকি)র সঙ্গে দেখা করে অর্ক বুঝল কলকাতার অপরাধ-জগৎ, ব্যবসার জগৎ অনেক বড় ও বিচিত্র।

"এই ক'দিনে অর্ক অনেক কিছু জেনে ফেলল। রকের আড্ডায় অথবা স্কুলের বন্ধুদের মুখে এ সব ব্যাপারে অনেক গল্প শুনলেও সেগুলো ছিল ভাসা ভাসা। নিজের চোখে দেখার পর মনে হচ্ছিল ওর বয়স এখন অনেক বেশি।" (পৃ. ১০৭)

তারপরই পট পরিবর্তন। জলপাইগুড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল, 'অনিমেষের বাবা মহীতোষ খুব অসুস্থ। শীঘ্র এসো।' যাব না যাব না করেও শেষ পর্যন্ত অনেক বছর বাদে অনিমেষ স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে জলপাইগুড়ি গেল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মহীতোষ, তার দ্বিতীয় বউ 'ছোট মা' আর পিসি হেমলতাকে দেখল তিনজনেই স্বর্গত সরিৎশেখরের বাড়িতে পৌঁছে। মাধবী এই প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এল। অর্ক এই প্রথম পিতামহের বাড়িতে এল। নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হল তিনজনেই। মহীতোষের মৃত্যু ঘটল কিছুদিন পরেই। এখন অনিমেষের সামনে দুই মহিলা—দুই বিধবা—পিসি আর ছোট মা।

'কালপুরুষ' উপন্যাসের শেষাংশে প্রাধান্য পেয়েছে দুটি বিষয়—এক, অনিমেষ আর মাধবীলতার সম্পর্কের ভাঙন ও তার মেরামতি ; দুই, বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনে তিন নম্বর বস্তিবাসীদের দ্বারা মাস্তানদের দৌরাত্ম্যর প্রতিরোধ ও যৌথজীবন যাত্রার মাধ্যমে শুভ মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা-সংগ্রাম।

অনিমেষ আর মাধবীলতার মধ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মানসিক ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠল জলপাইগুড়িতে তাদের আসার পরে। অনির বাবা মহীতোষের মৃত্যুর পরে দুটি অসহায় বিধবা—পিসি হেমলতা আর ছোট মা'-র জন্যে অনির জলপাইগুড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ও অনির গোপন জঙ্গি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে মাধবীর আপত্তি। ২৯ থেকে ৪২—চোদ্দটি অধ্যায়ে মাধবীলতার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান এবং তারপর কলকাতায় প্রস্থান। তার স্কুলের চাকুরিতে আর ছুটি মিলবে না—এই অজুহাতে মাধবী ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়—এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল ছোট মা ও পিসির জন্য অনিমেষের থেকে যাবার সিদ্ধান্তে মাধবীলতার প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ এবং সেই সূত্রে তাদের আদৌ আইনসম্মত বা শাস্ত্রসম্মত বিবাহ আদৌ না ঘটার ফলে সমাজের চোখে অর্কর বেজন্মায় পরিণতি। অনি মাধবীলতার এতদিনের ভালবাসার প্রশ্নে উঠেছে এক তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, যা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। অর্ক সোজাসুজি তার মাকে শুধিয়েছে — 'তোমরা বিয়ে কর নি কেন?' মাধবীর উত্তর, 'তখন ওর রাজনীতি আমাদের বিয়ে করার সময় দেয় নি। যখন সময় হল তখন তুই এসে গেছিস। 'মা' হওয়ার পর, তোকে নিয়ে অত কষ্ট করার পর নতুন করে বিয়ে করতে চাইনি।' (পৃ. ৩০২)। এই কৈফিয়তে অর্ক সন্তুষ্ট হয়নি, জানতে চেয়েছে—'তাহলে সে কি বেজন্মা?' মাধবী একথার উত্তর দিতে পারে নি।

মায়ের সঙ্গে যে অর্ক কলকাতায় ফিরে এল সে চিন্তায় অনেক পরিণত, অনেক পরিবর্তিত। এদিকে জলপাইগুড়িতে জুলিয়েনদের সঙ্গে গোপন জঙ্গি কাজে অনিমেষের যোগদান আর বাড়িতে দুই শোকার্ত বিধবার নিরানন্দ জীবনযাপন। ছোট মা আর পিসি—এদের রক্ষণাবেক্ষণেই কি অনির জীবন শেষ হয়ে যাবে?

এদিকে কলকাতায় ঈশ্বরপুকুর লেনের জীবনযাত্রা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গুণ্ডা মাস্তানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ অর্কদের পাড়া। আর কংগ্রেস, সি. পি. এম. প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনে গুণ্ডা মাস্তানদের আশ্রয়দান ও তাদের দ্বারাই প্রতিপক্ষকে দমিয়ে দেবার প্রয়াস। এই ব্যাপারটা এই মুহূর্তেও চলছে, কেবল কলকাতার নয়, ভারতের সব মেট্রোপলিসে। এই দুই পক্ষ—গুণ্ডা মাস্তান ও রাজনৈতিক দলের যৌথ চাপে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এককাট্টা হয়ে ঈশ্বরপুকুর লেন থেকে মাস্তান ও রাজনৈতিক নেতাদের হটিয়ে দিতে চাইল। সেই আন্দোলনে ঈশ্বরপুকুর লেনের তিন নম্বর বস্তির সব নরনারী যুবক-যুবতী হাতে হাত মিলাল আর ঘটনাচক্রে অর্ক হয়ে উঠল তাদের নেতা। তারাই সমবেতভাবে মাস্তানদের বিতাড়িত করল, ধনী ধূর্ত মানুষদের শিক্ষা দিতে চাইল এবং সবাই মিলে একটি যৌথ পরিবার এবং যৌথভাবে রন্ধন ও আহারের বন্দোবস্ত করে সমাজে একটা নতুন শৃঙ্খলা, নতুন অর্ডার আনতে চাইল। শান্তি কমিটি গঠিত হল।

আর তখনি অসুস্থ হয়ে পড়ল মাধবীলতা, তাকে হাসপাতালে দিতে হল এবং পেপটিক আলসারে মাধবী মরণাপন্ন হল। তখন তার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ও পাড়ার সব লোক মিলে তাদের ইস্কুল-দিদিমণিকে বাঁচাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হল। কীভাবে মাধবী বেঁচে ফিরে এল, তা পূর্বেই এই সেকশনের সূচনায় লিখেছি। 'তিন নম্বরে বারোয়ারি খাওয়া হচ্ছে।' (পৃ. ৪১৬)। একথা শুনে রাজনীতিক দাদা সতীশ দেখতে এলেন, অর্কর নেতৃত্বেও তা হচ্ছে জানলেন। শান্তি কমিটি, পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, পাড়ার সামাজিক সমস্যা এক নয়—সতীশদার মুখে একথা শুনে অর্ক বিভ্রান্ত হল। (পৃ. ৪১৬)

এদিকে বন্ধুর টেলিগ্রাম পেয়ে অনিমেষ কলকাতায় এল, মাধবীলতার মরণাপন্ন অবস্থা ও শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাওয়ায় সে স্বস্তি পেল। এবং শেষপর্যন্ত অনিমেষ ও মাধবীলতার মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল তা দূর হল। তাদের মধ্যে যোগসূত্র তাদের ছেলে অর্ক। (পৃ. ৪১৮)। কিন্তু মাস্তানরা শেষ হয়ে যায় নি। পাড়া দখলের জন্য গুণ্ডামি খুন শেষ হয় না, তার সবচেয়ে বড় কারণ তাদের পিছনে অশুভ শক্তি, যা আসে রাজনৈতিক দাদাদের মাধ্যমে। তাই অর্ক ফের গুণ্ডাদের শিকার হয়। তাকে পুলিশ-হাজতে যেতে হয়। মাধবীলতা ছেলের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'অর্ক মানে সূর্য, তাকে কেউ বন্দি করতে পারে না।' (পৃ. ৪৩২)। মাধবীর এই বিশ্বাসে উপন্যাসের সমাপ্তি॥
